ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী
এসো অবদান রাখি
PUT
YOUR
IMPRINT

এসো অবদান রাখি

মূল
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী
প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর
মাওলানা মাহমুদুল হাসান

প্রকাশনা
২৯ (উনত্রিশ)

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৬

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩৬৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ৩৬০ টাকা মাত্র

আল্লাহর নামে শুরু করছি; যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান

সূচি

বই সম্পর্কে দুটি কথা

ডক্টর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী আমাদের থেকে অনেক দূরে বসবাস করেন; কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর সাথে গাঢ় ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। এখন তাঁকে খুব আপন ভাবতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। এর কারণ, অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কয়েকটি বইয়ের বাংলা তরজমা আমরা হাতে পেয়েছি। বইগুলো তাঁর চিন্তাচেতনা সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা প্রদান করে। বইগুলো আমাদেরকে অবগত করছে যে, তিনি সবসময় আমাদের কথা ভাবেন। আর যিনি আমাদের কথা ভাবেন, তাঁকে পর মনে করি কীভাবে?

তিনি আমাদেরকে নিয়ে কতটা ভাবেন, সে কথা আরও স্পষ্ট হয় হাতের এই বইটি পড়লে। আপনি অবাক হবেন, দীনের খেদমত করার কত পথ ও পন্থা আমাদের জন্য অবারিত; কিন্তু অন্ধ হয়ে বসি আছি। অনেককেই বলতে শোনা যায়, কী করব? করার মত কোন কাজ তো হাতে নেই।

ডক্টর আরিফী এদেরকেই করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, তুমি এটা করতে পারো, ওটা করতে পারো...। শুধু তোমার একটু হিম্মত, একটু আড়মোড় ভেঙে এগিয়ে আসা দরকার। হাতের নাগালেই তোমার অনেক কিছু।

এ যুগের যুবসমাজ যেসব ক্ষেত্রে জীবন ক্ষয় করে দিচ্ছে, সেসব ক্ষেত্রের সুস্থ ব্যবহারই তাদের জীবনের সাফল্য এনে দিতে পারে।

ডক্টর আরিফী এই ক্ষেত্রগুলোই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন

এই বইয়ে। প্রতিটি কথার সাথে প্রত্যক্ষ করা যায় তাঁর অনন্য এখলাস। উম্মতের জন্য এক অব্যক্ত দরদ।

বইটির অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা যারপরনাই আনন্দিত। আল্লাহ তাআলার দরবারে আদায় করছি কালিমাতুশ শুক্‌র– আল-হামদু লিল্লাহ। যিনি অনুবাদ করেছেন, তাঁর জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ থাকল। আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করছি, তাঁর পড়াশোনার দিগন্ত আরও বিস্তৃত হোক। আরও প্রশস্ত হোক তাঁর লেখালেখির দুয়ার।

বইটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর করার পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন হুদহুদ প্রকাশনের মাঠপর্যায়ের যোদ্ধা মাওলানা দিলাওয়ার হুসাইন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ডক্টর আরিফীর অন্যান্য বইয়ের মত এই বইটিও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এটি বরং একটু বেশিই ভালোবাসা পাওয়ার কথা। কেননা, এতে কথা বলা হয়েছে তরুণ প্রজন্মকে সম্বোধন করে, যারা যুগের প্রাণ এবং ইতিহাসের রূপকার। আল্লাহ তাআলা আমাদের মেহনত কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা

২৫ সফর, ১৪৩৮ হিজরী (২৫/১১/২০১৬)

(১)
ইন্টারনেট
ইসলাম প্রচারের সুবর্ণ মাধ্যম

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন। আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়।

আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم* فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

অর্থ : তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে ক্রন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

ইতিপূর্বে আমি যিকির আযকারের মাধ্যমে কল্যাণ প্রচার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আজকেও তার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। বরং এটা আরো ব্যাপক জিনিস। কেননা, বিভিন্ন কারণে অনেকেই বাজারে যেতে পারে না যে সেখানে যিকির-আযকার সম্বলিত ফেস্টুন, পেকার্ড বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগিয়ে দিবে। তন্মধ্যে প্রধান বাধা হচ্ছে অনেকেই এইসব জিনিস ক্রয় করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের মালিক নন।

কিন্তু (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বর্তমান কালে এমন কিছু মাধ্যম আছে যা মানুষ আল্লাহর পথে দাওয়াতি কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারবে কোনপ্রকার অর্থকষ্ট ব্যতীত। ধর্মসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

আজকে আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ প্রচার-প্রসার নিয়ে কথা বলবো। বর্তমান কালে যোগাযোগ মাধ্যম অনেক উন্নত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে যোগাযোগ ও সংবাদ প্রচার প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা ব্যাপক হয়েছে। মানুষ এখন এগুলো ব্যবহার করে।
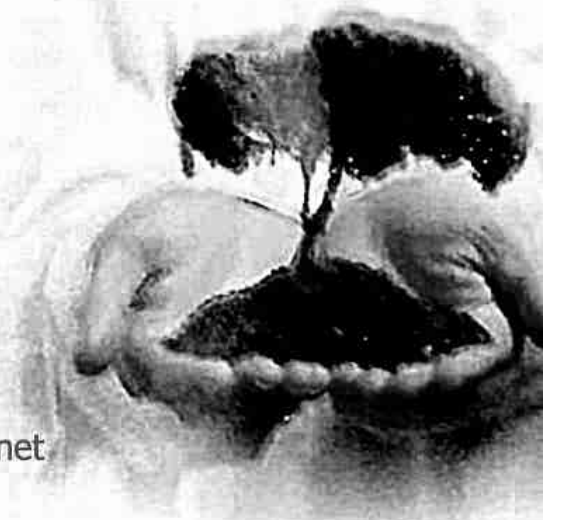
এসব যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী হচ্ছে ইন্টারনেট যাকে আমরা شَبَكَةُ الْعَنْكَبُوْتِ বা মাকড়সার জাল বলি। (যেহেতু ইন্টারনেট সমগ্র পৃথিবীকে জালের মতো বেষ্টন করে আছে)

লোকজন ইন্টারনেট ব্যবহারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা শত শত মিলিয়নে পৌঁছে গেছে। ইন্টারনেট দূরের জিনিসকে অতি নিকটে নিয়ে এসেছে।

সুতরাং যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহর উচিত এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে দাওয়াতি কার্যক্রম প্রচারে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা। অনেক অমুসলিম যুবক-যুবতীর নাম শুনি যারা এটাকে তাদের ধর্মপ্রচারের মাধ্যম বানিয়েছে। তারা বিভিন্ন ওয়েব সাইট খুলেছে। বিশ্বব্যাপী বক্তৃতা, লেকচার, অনুষ্ঠান প্রচার করছে। ফলে অনেকে তাদের ধর্ম অনুসরণ করছে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেকের সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই ছোট জানালা দিয়ে কত ভাল বিষয়াদি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গেছে তার হিসাব নেই। অপর দিকে অনেকে ইন্টারনেটে ঘন্টার পর ঘন্টা অনর্থক সময় নষ্ট করছে। এর মাধ্যমে কিভাবে ভাল কাজ করবে তা জানে না।

আমি এই মাধ্যমে দাওয়াতি কার্যক্রম প্রচার নিয়ে আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।
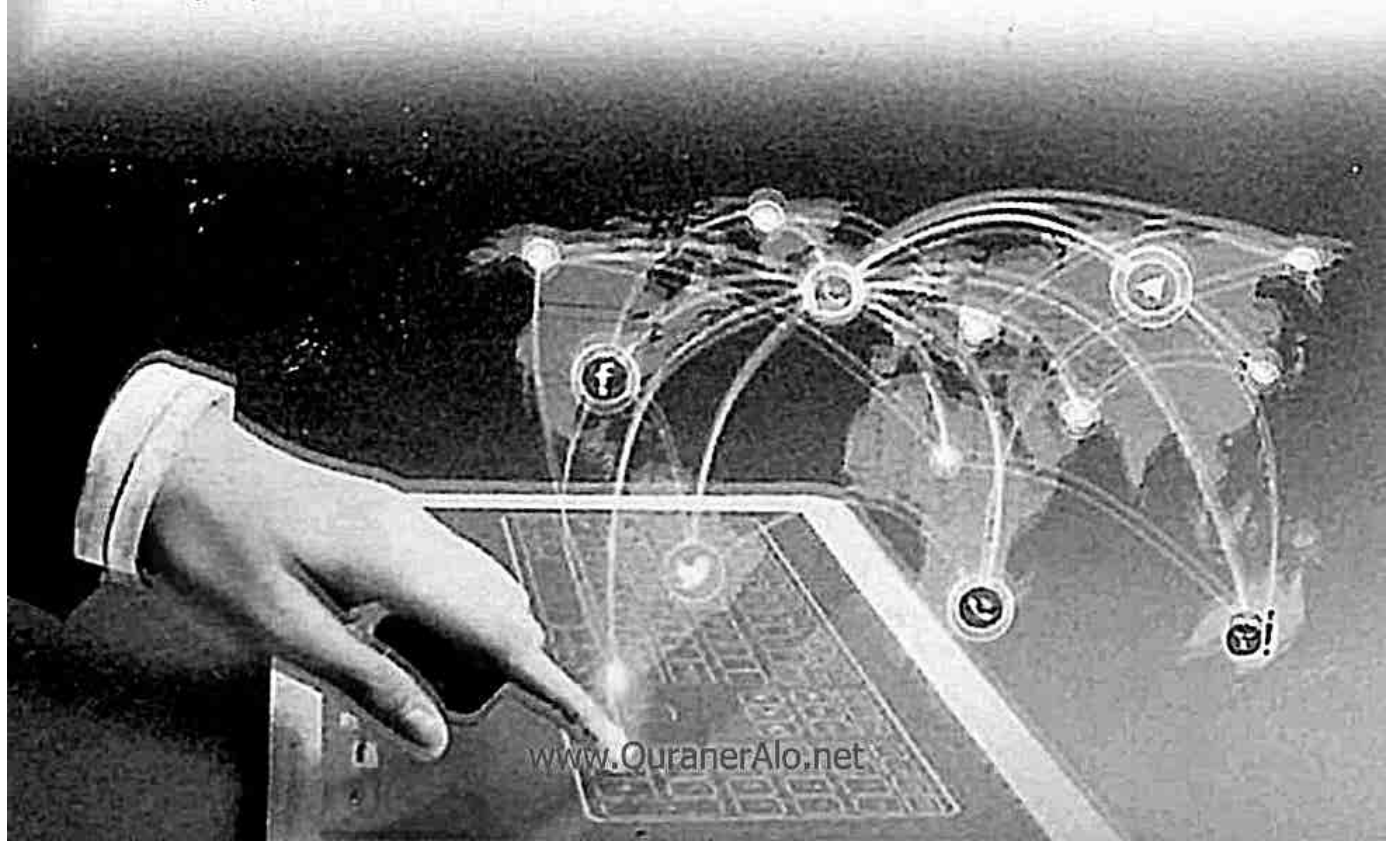
আমি মনে করি, ইন্টারনেট প্রসঙ্গে কথা বললে দীর্ঘ সময় কথা বলতে হবে। ইন্টারনেটে ধর্মীয় প্রচারণা ও কার্যকারিতার সম্ভাব্য বিষয়ক আলোচনা বিস্তারিত সময়সাপেক্ষ্য। তবে আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবো।

আপনারা জানেন যে, যোগাযোগ মাধ্যম দিন দিন উন্নত হচ্ছে। নবী করীম সা. এর সামনে অনেক প্রচার মাধ্যম উন্মোচিত ছিল। তিনি সেসব মাধ্যমকে সরাসরি তাবলীগে দ্বীনে ব্যবহার করেছেন। ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এমন স্থানে যেতে তৎপর ছিলেন, যেখানে গেলে অনেক মানুষকে এক সাথে আল্লাহর দিকে ডাকা যায়। যার ফলে তিনি জনসাধারণের একত্র হওয়ার স্থান হাট-বাজারে যেতেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে—

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে যত রাসূল পাঠিয়েছি তারা খাবার আহার করতো (যেহেতু তারা মানুষ ছিল) এবং বাজারে যেত। *[সূরা ফুরকান-২০]*

তবে তারা গোনাহের কাজে বাজারে গমন করতেন না বরং মানুষকে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য যেতেন।

হজের মৌসুমে তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হাজীদের কাছে গিয়ে ধর্ম প্রচার করতেন। মুযাইনা, সাকীফ গোত্রের কাছে গিয়ে বলতেন, কে আমাকে আমার রবের বাণী পৌছাতে আশ্রয় দিবে? কুরাইশ তো আমাকে বাধা দেয়। তোমরা কি এক ইলাহর উপসনা করবে না?

মোটকথা, প্রিয় নবী সা. হজের মৌসুমে মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সাথে কথা বলতে খুব

ইন্টারনেট ধীরে ধীরে আরব দেশসমূহেও পৌঁছে যায়। সর্বপ্রথম ১৯৯১ সালে তিউনিশিয়ায় প্রবেশ করে। কুয়েতে ১৯৯২ সালে, আরব আমিরাত ও মিসরে ১৯৯৩ সালে, বাহরাইনে ১৯৯৪ সালে, সৌদির জনসাধারণের হাতে ১৯৯৯ সালে।

প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। ইসলামও এর থেকে উপকৃত হতে থাকল। যে তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা বাস করছি তাতে ইন্টারনেট মহান আল্লাহর একটি বিশেষ নিয়ামত। কাজেই এই নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করতে হবে। মানুষকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দিতে হবে।

প্রিয় দর্শক! এমন অনেকে আছেন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাকে কেউ দাওয়াত দেয়নি। শুধুমাত্র ইন্টারনেটে ইসলাম সম্পর্কে জেনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ইন্টারনেট ধারালো অস্ত্রের ন্যায়। সেটা এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে আপনি আজ বপন করবেন। আগামী কাল ফসল আহরণ করবেন।

স্মর্তব্য যে, অনেকেই ইন্টারনেট খারাপ কাজে ব্যবহার করে। কিছুদিন আগে এক জরিপে পড়লাম, ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোডকৃত ছবির ৮৪% অশ্লীলতাপূর্ণ। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ছবি প্রকাশ করা হয়। গাড়ি, সমুদ্র, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি আপলোড করা হয়।

নিঃসন্দেহে এটি একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান। মানুষ যৌন বিষয় চিন্তায় বিভোর থাকে। দুই রানের মাঝে যা আছে তা নিয়েই চিন্তা করে।
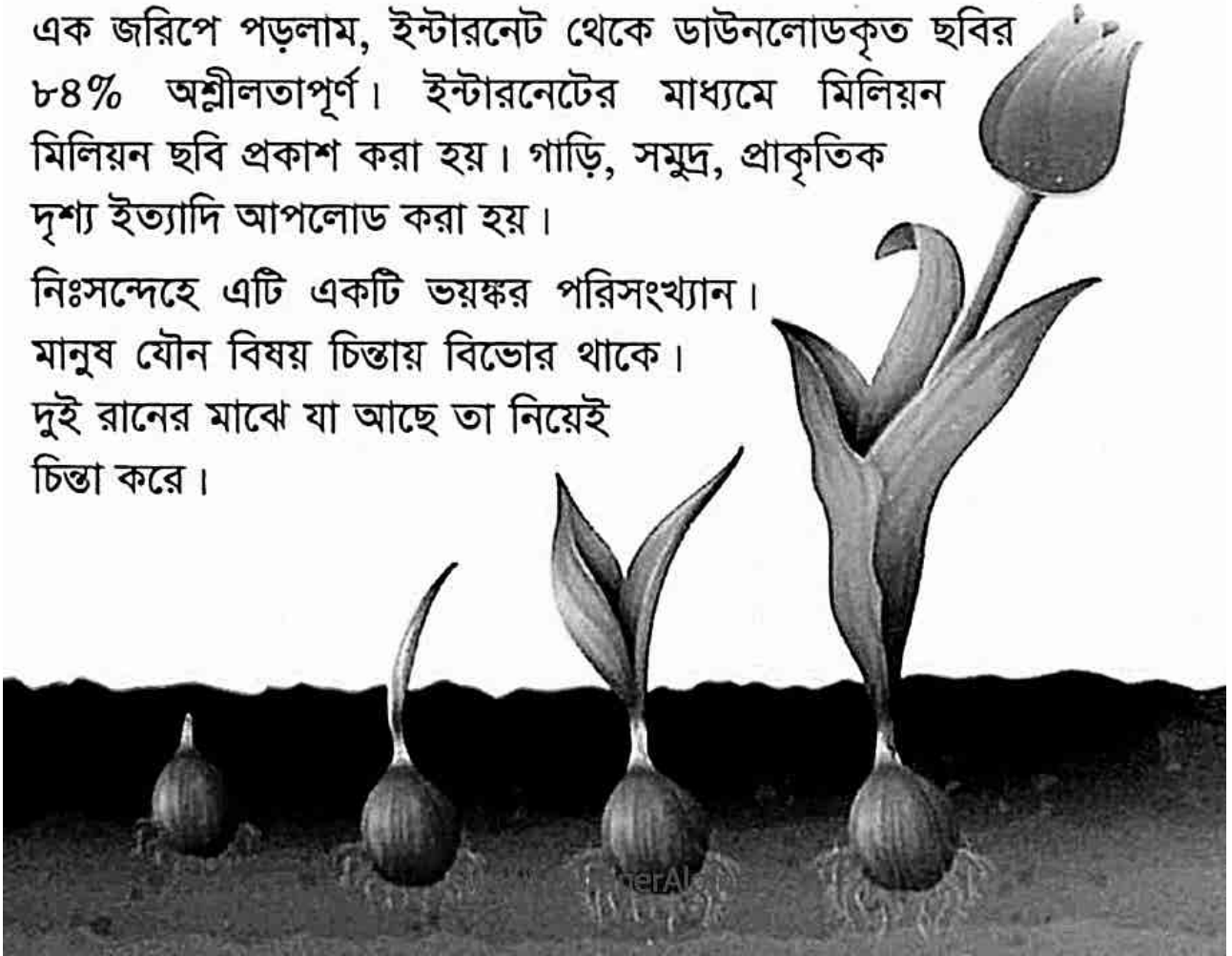
আমরা মুসলিম জাতি। আমাদের আলোচনা নাভির নীচে যা আছে তা নিয়ে নয়। বরং নাভির উপরে অবস্থিত কলব দেমাগ মন মানসিকতা নিয়ে।

এজন্য প্রিয় নবী সা. বলেছেন, 'নিশ্চয় দেহে একটি মাংশপিন্ড রয়েছে। সেটা সংশোধন হলে সব কিছুই সংশোধন হয়ে যাবে। সেটা নষ্ট হলে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কলব।' আমাদের সেই হাদীসও স্বরণ করতে হবে যেখানে প্রিয় নবী সা. বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা যদি একজন মানুষও আল্লাহর হেদায়াত পেয়ে যায় তা হলে তা লাল উট থেকেও উত্তম হবে।'

যেভাবে ইন্টারনেটে ধর্মপ্রচার করতে পারি

ইন্টারনেটে ইংরেজি ভাষায় লিখিত অনেক মেসেজ, প্রবন্ধ আছে, যার বর্ণনাভঙ্গি খুব সুন্দর। সেটা আপনি যেকোন ব্যক্তিকে পাঠাতে পারবেন। বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে জানতে পারবেন কে মুসলিম আর কে মুসলিম নয়।

অমুসলিমদের জন্য অনেক মুনতাদা (সাহিত্য আসর বা ব্লগ) রয়েছে। আপনি ইসলাম সম্পর্কে ইংরেজিতে সুন্দরভাবে বিস্তারিত লিখে এদের কাছে পাঠাতে পারেন। রিয়াদের জনৈক ভাই আমাকে জানালেন যে, তারা খ্রিস্টানদের কফিখানায় গেলেন। তাদের সাথে ক্যাসেট, সিডি, বইপত্র ছিল। সেই ভাই বললেন, যখন আমি কথা বললাম, লোকেরা খুব প্রভাবিত হল এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তাদেরকে আমি নামাযের গুরুত্ব, পিতা-মাতার সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বইপত্র ও সিডি দিলাম।

তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসলে এক যুবক তার পিছু নিল।

সে বলল, এই সব বইপত্র আমার জন্য উপকারী নয়। আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম। আমরা তো আরবি ভাষায় লিখিত বইপত্রই আরবিভাষীদের দিয়েছি। আমি কৌতুহল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কেন? সে তখন উত্তর দিল, আমি খ্রিস্টান।

তার দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম সে সৌদির নাগরিক। তার বয়স ২০ বছর। তখন আমি আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিভাবে সম্ভব হলো যে, তুমি খ্রিস্টান। সে বলল, আমি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি বললাম, তুমি কি ভাবে খ্রিস্টান হলে?

তারপর জানতে পারলাম যে, তার কাছে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সংশয়পূর্ণ অনেক বার্তা এসেছে। কিন্তু সে ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখত না। তাই খ্রিস্টধর্মে প্রভাবিত হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে।

প্রিয় পাঠক! তারা যদি একে তাদের ধর্ম প্রচারে ব্যবহার করতে পারে আমরা কেন পারবো না। অথচ আমাদের ধর্ম সঠিক ও মানব জাতির জন্য কল্যাণকর।

খ্রিস্টানদের তথ্যসমৃদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ, বার্তা আছে। আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তারা প্রকাশ করে। এখানে স্বরণ রাখা উচিত যে, আমাদের দাওয়াত, প্রচারণা শুধু অমুসলিমদের মাঝেই সীমিত থাকবে না। বরং মুসলিমদের ঈমান মজবুত করার জন্যও হবে।

কিছু ছাত্রী আমাকে বলেছে যে, তারা প্রিয় নবী সা. এর সাহায্যার্থে বিভিন্ন লিফলেট সিডি প্রচার করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু কিছু জটিলতা তাদের উদ্যোগ স্থগিত করে দেয়। ফলে তারা ফিরে আসে। এখন তারা কি করবে?

আমরা কর্ম পদ্ধতি বুঝি না। অনেক সময় কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবো জানি না। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

তোমরা ঘরে দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। *[সূরা বাকারা-১৮৯]*

মৌলনীতি হচ্ছে, কেউ যদি মসজিদে কাজ করতে চায় তাহলে ইমাম থেকে তার অনুমতি নিতে হবে। ঘরে কাজ করতে হলে পিতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতে হবে।

জনৈকা বোন এক ফার্মেসীতে কাজ করতেন। তিনি তিব্বে নববী (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিকিৎসাবিধান) সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনা করেন। এ প্রসঙ্গে প্রতিদিনই কিছু না কিছু লিখতেন। তার সহকর্মী বান্ধবীরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন, এটা ভবিষ্যতে ইন্টারনেটে প্রচার করতে পারবো।' কত উত্তম চিন্তা! আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কিছু জিনিস আমাদের সময় খেয়ে ফেলে। আপনি কিছু নির্মাণ, সংস্কার করতে লাগলেন আরেকজন এসে তা ভেঙ্গে চূরমার করে দিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾

তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই তার নিকট কিয়ামত দিবসে একাকি আসবে। *[সূরা মারইয়াম : ৯৪-৯৫]*

আপনার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাদীসে এসেছে, আমার উম্মতের বয়স ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি। অপর দিকে অন্য হাদীসে এসেছে, বান্দা কিয়ামত দিবসে চারটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে কিসে তা নষ্ট করেছে? তার যৌবন সম্পর্কে কোথায় নিঃশেষ করেছে।

কাজেই আল্লাহ তায়ালা যখন আপনাকে এই মূল্যবান খনি সময়কে কিভাবে ব্যয় করেছ? এই প্রশ্ন করবেন তখন আপনার কি জবাব হবে?

আপনি কি বলবেন, আমি খেলাধুলায় মগ্ন ছিলাম। ঘরবাড়ি বানিয়েছিলাম। বা যুদ্ধ করেছিলাম। তখন আপনি লজ্জিত হবেন। অথচ আপনি দেখছেন যে, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম প্রচারে সময় ব্যয় করছে। আমার মনে আছে যে, একবার ফিনল্যান্ডের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। এক যুবক ও যুবতী আমার গতিরোধ করে খ্রিস্টধর্মের কিছু লিফলেট দিল। আল্লাহ্ মহান! তাদের বয়স ১৮ কি ১৯ হবে। আমি প্রশ্ন করলাম, একাজে গির্জা কি তোমাদের কোন বিনিময় দেয়?

তারা উত্তর দিল, না। কিন্তু আমরা সপ্তাহে দুই ঘন্টা সময় গির্জার জন্য ব্যয় করি। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ধর্মের সেবা করি।

বর্তমান কালের সকল মুসলিম যদি মাসে মাত্র এক ঘন্টা সময় ইন্টারনেট বা অন্য কোন মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে ব্যয় করে তাহলে মুসলমানদের এই করুণ পরিণতি হতো না।

হে ভাই! আপনাকে বলছি না যে, অস্ত্র নিন এবং যুদ্ধ করুন। বরং বলছি ইসলামের খেদমতে যে কোন একটি ভূমিকা রাখুন।

আমি সেই মুসলিম ভাইদের প্রতি খুব আশ্চর্য হই যারা অনর্থক সময় নষ্ট করে। অথচ তার বোন ইরাকে নিহত হচ্ছে, আফগানে ধর্ষিত হচ্ছে, সোমালিয়ায় নির্যাতিত হচ্ছে। ফিলিস্তীনে শহীদ হচ্ছে।

বর্তমানে গাজায় আমাদের ভাইয়েরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। শিশুরা হাসপাতালে কাতরাচ্ছে। তারা খাদ্য পানীয় পাচ্ছে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু শৈত্যপ্রবাহ তাদেরকে মেরে ফেলছে।

হে ভাই! ইসলামের সেবায় নিজের অবদান রেখে যান। নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদির সদস্য মনে করুন। জাতির জন্য কিছু পেশ করুন। জাতির এই করুণ অবস্থা চলতে থাকলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

আমি ত্রিশটি উদ্যোগের কথা জানি যা মানুষ ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে পারে। সেই সব উদ্যোগ অনেকেই জানেন। তবুও গাফিলদের স্মরণ করিয়ে দিতে উল্লেখ করছি।

১. গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ডাউনলোড আপলোড করা।

২. ভাল লেখকদের উৎসাহ প্রদান করা। কেননা, উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে অনেক ইতিবাচক ফলাফল বেরিয়ে আসে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি প্রশংসা উৎসাহে উজ্জীবিত হয়। এজন্য আপনি দেখবেন যে, প্রিয়নবী সা. এর হাদীসে ইবাদতে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বেশী এসেছে।

যেমন 'যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ বলবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করবেন।' এখানে ফলাফল বলে দিলেন যেন আমল করতে আগ্রহী হয়।

৩. বিভিন্ন মন্তব্য (Comment) করে তাদের উৎসাহ প্রদান করা। যেমন- মাশাআল্লাহ আপনার লেখা শৈলী চমৎকার। আপনার লিখনি যোগ্যতা আছে। কেন আপনি লেখা থেকে দূরে থাকেন? কেন নিজেকে এমন কাজে মগ্ন করছেন না যা দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার ও সমগ্র মুসলিম জাতির উপকার করবে?...

৪. এক নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধকে একত্র করা।

৫.মানুষের মাঝে প্রচলিত বিদআত গোনাহের কাজে সতর্ক করা।

৬. বিভিন্ন মুনতাদায় অংশগ্রহণ ও তাতে প্রবন্ধ প্রদান।
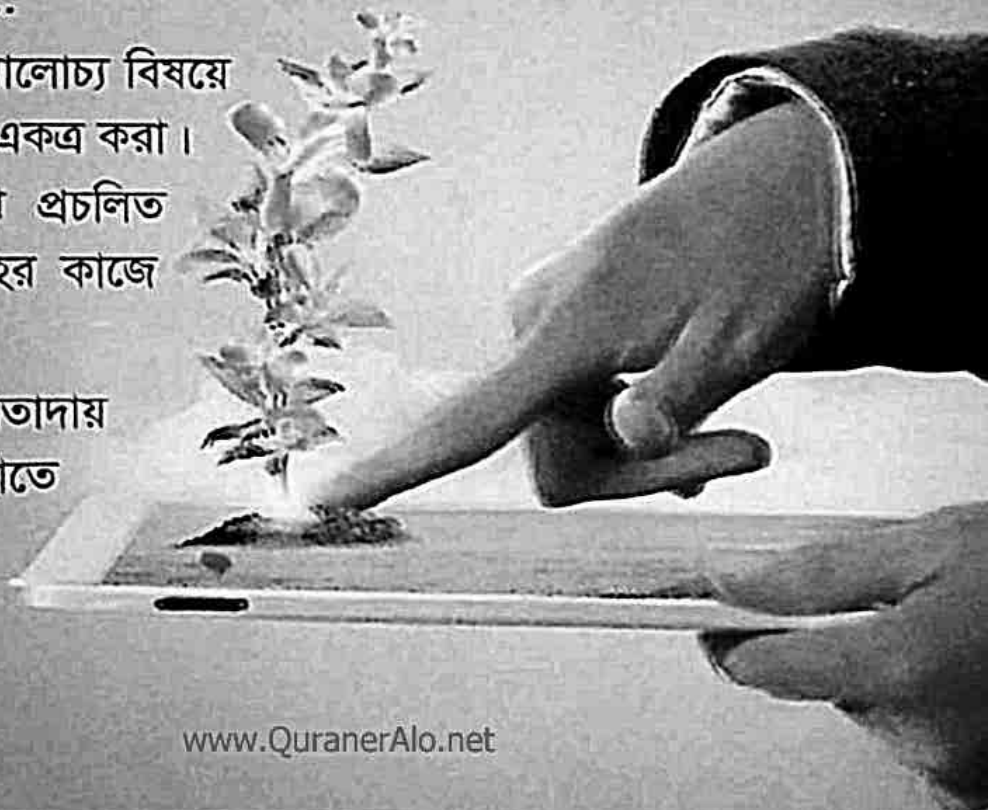
৭. মানুষকে ওয়াজ নসীহত করা।

৮. তাৎক্ষণিক সামাজিক প্রয়োজন ও তড়িৎ সেবামূলক কর্মকান্ডে মানুষকে দিক নির্দেশনা প্রদান।

৯. বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ।

১০. মুসলমানদের নতুন তথ্য দিয়ে উপকৃত করা। উদাহরণস্বরূপ নির্দিষ্ট সাইটে এই তথ্য লেখা যে, ২০০৬ সালে জার্মানে চার হাজার ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে। আবার এই সুসংবাদও লিখতে পারেন যে, আপনি কি জানেন, ইউরোপে প্রতি দু ঘন্টায় একজন মুসলিম হচ্ছে। বেলজিয়ামের সরকারি পরিসংখ্যান আপনি জানেন কি? বেলজিয়াম সরকারি জরিপ বলছে, ২০২৫ সালে ইসলাম হবে প্রথম ধর্ম।

১১. ইন্টারনেটের মাধ্যমে হাদীসের খেদমত করতে পারেন। ২০০৮ এর এক জরিপে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা পড়েছি। সেই জরিপের আলোকে স্পষ্ট যে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর নিম্নে পরিসংখ্যান দেওয়া হলো−

এশিয়াতে ৫৭৮ মিলিয়ন। ইউরোপে ৩৮৫ মিলিয়ন। উত্তর আমেরিকাতে ২৮৪ মিলিয়ন। ল্যাটিন আমেরিকাতে ১৫১ মিলিয়ন। আফ্রিকাতে ১৫১ মিলিয়ন। অস্ট্রেলিয়াতে ২১ মিলিয়ন। চিনে ২৭৬ মিলিয়ন। মধ্যপ্রাচ্যে ৪১ মিলিয়ন।

এখন আসেন ওয়েবে ভাষার পরিসংখ্যান। ইংরেজী ভাষায় ৪৮০ মিলিয়ন।

যেসব ওয়েবসাইট ইসলামের সেবা করে তন্মধ্যে চীনা ভাষায়

ইসলামিক ওয়েবসাইটের সংখ্যা সবচেয়ে কম। তারপর স্প্যানিশ ভাষা, তারপর জার্মান ও ফ্রান্স ভাষার অবস্থান।

১২. হাজীদের তথ্য উপাত্ত, হজ পরিচিতি সেবাপ্রদান।

১৩. হাজী সাহেবদের তারবিয়াত-প্রশিক্ষণ ও হজ বিষয়ক মাসায়িল শিক্ষাদান। এসব কাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে করার বাস্তব নমুনা আমাদের সামনে আছে। সেকেন্ড লাইফকে (secondlife.com) কাল্পনিক বিশ্ব বলা হয়। (এটি একটি থ্রিডি ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড ওয়েবসাইট যেখানে মানুষ সামাজিক কর্মকাণ্ড, যোগাযোগসহ অনেক কাজ করতে পারে) তা আমাদের বসবাসযোগ্য এই পৃথিবীর আরেকটি চিত্র যা আমরা ইন্টারনেটে দেখে থাকি। এই সাইটের মাধ্যমে বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। মসজিদ, গির্জা বানাতে পারবেন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, রয়টার ও বিভিন্ন গোয়েন্দাসংস্থা (যাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ নামে অভিহিত করা হয়) সেকেন্ড লাইফের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের খোঁজে। সেকেন্ড লাইফ একটি বিশ্বের মত। আপনি এর ভিতর গিয়ে তাকে বাস্তব পৃথিবী মনে করবেন। শুধু পার্থক্য এতটুকু, এটা ইন্টারনেটে দেহ ধারণ করে আছে।

এক কথা আরেক কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভুলে গিয়েছিলাম। ইসলাম অন লাইন (islamonline.net) হাজীদের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃপক্ষকে উত্তম

প্রতিদান দান করুক। ওয়েব সাইটটি ইংরেজি ও আরবিতে। আমি আশা করি তা জার্মান ভাষায়ও হবে। এই ওয়েব সাইটে হাজীরা হজের বিধানাবলী একেবারে সায়ী তাওয়াফ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শিখতে পারে। পরামর্শ বিভাগ থেকে হাজীরা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও জানতে পারেন।

সেকেন্ড লাইফ এবং এ ধরণের ওয়েবের মাধ্যমেও আমরা ইসলামিক চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করতে পারি। ফলে অমুসলিমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে। এক সময় ইসলামে প্রবেশ করবে। সম্প্রতি চারজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

আমরা প্রত্যেকেই কখনো না কখনো পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। এজন্য পৃথিবী প্রায় বড় বড় কোম্পানী যেমন HP মাইক্রোসফট তারা Help সার্ভিস রাখে। চব্বিশ ঘণ্টা তারা গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর বা পরামর্শ প্রদানের অপেক্ষায় থাকে। আমরাও তদ্রূপ সরাসরি হাজীদের প্রশ্নের উত্তর, পরামর্শ দিতে পারবো যদি আমরা সৎ উদ্যোগী হই। (এভাবে ধর্মীয় যে কোন বিষয়ে Help সার্ভিসের মতো সেবা দিতে পারি)

১৪. গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির পর্যাপ্ত সঞ্চয়ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারি।

১৫. নেটের মাধ্যমে ইসলামিক লিংক, পণ্যসামগ্রি বাজারজাতকরণ ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইসলামের সেবা করা সম্ভব। নবীজীর সিরাত বিষয়ক ওয়েব বা বিভিন্ন কেরাতে তাফসীরসহ পবিত্র কুরআন পড়া ও ডাউনলোডের সুব্যবস্থা সমৃদ্ধ ওয়েব প্রস্তুত ও লিংক প্রচার করতে পারি।

১৬. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, অমুসলিমদের দাওয়াতে আমরা বেশি মনোযোগী হবো। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

بَلِّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً

[আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও]

সামাজিক যোগাযোগের অনেক সাইট আছে। (যেমন ফেসবুক, টুইটার, ভাইবার, ইমো ইত্যাদি) এখানে গ্রুপ (লাইক পেজ) আছে। সেই সব গ্রুপে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ মেম্বার থাকে। আপনি যদি একটি প্রবন্ধ পোস্ট করেন তাহলে মুহূর্তেই এক লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে যাবে।

এসবই করা সম্ভব। বরং তার থেকে আরো বেশি করতে পারি যদি আমরা উদ্যোগী হই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে অনেক মানুষ বিশেষত যুব সমাজ অনর্থক কাজে লিপ্ত। আমরা সমূহ বিপদে আছি। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা থেকে বিমুখ হয়ে আছি।

১৭. নেটে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার সংস্থা হতে পারে।

১৮. যোগ্যরা তাদের যে যে যোগ্যতা আছে তা প্রকাশ করতে পারেন।

১৯. অনেক যুবকের মাঝে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া হয়। আপনি নেটের মাধ্যমে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

২০. ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ এমন লোকদের কাছে বিভিন্ন প্রবন্ধ ভাষান্তরিত করে পাঠাতে পারেন।

২১. অনেক অনৈসলামিক ওয়েবে প্রবেশ করেও মানুষকে উপদেশ দেওয়া যায়। জনৈকা বোন বলেন, তিনি তার এক সহপাঠীর কাছে একটি মেসেজ পাঠান।

যাতে আল্লাহর দিকে ডাকা হয়। কুরআনের কিছু অংশও দেওয়া হয়। সে এই উপদেশ গ্রহণ করে।

আরেকজন বলেন, জনৈকা ইন্টারনেটে গান শুনতো। তাকে তিনি কিছু আরবি নাশিদ (সংগীত) দিলেন। তখন সে বলল, 'আমি জীবনে কখনো নাশিদ শুনি নি। আমাকে আরোও শুনাও। আমার খুব ভালো লেগেছে।' তখন তাকে আমি আরো শুনালাম।

২২. অনেক নির্দিষ্ট ওয়েব সাইট আছে যা অমুসলিম ও অনারবীদেরকে দাওয়াত দেওয়া সম্ভব। যেমন ফেসবুক। এখানে প্রত্যেক জাতি, ভাষী ও ধর্মাবলম্বীর লোক আছেন। তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, অনেক কিছু মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর। আপনি কিছু পোস্ট করলে অনেকেই তা পড়তে পারবে। অন্তত চোখ বুলাতে পারবে। সে এটা গ্রহণ করুক বা না করুন। আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ তার বান্দাদের দেখছেন।

২৩. আরব দেশসমূহে অমুসলিম অনারবি আরবি শিক্ষার্থীদের দাওয়াত দেওয়া সম্ভব। এই ভাষার মর্যাদা সম্পর্কে বলা যাবে। অনেক ওয়েব সাইট আছে পবিত্র কুরআন অনুবাদের। প্রত্যেক আয়াত অনুবাদসহ পড়া হয়। আল্লাহ চাহেন তো পরবর্তীতে এটা তাদের ইসলাম গ্রহণ করার কারণ হবে।

২৪. কুরআন বিতরণ করে প্রচারাভিযান চালাতে পারেন।

২৫. ওয়েব কর্তৃপক্ষ ও ডেভলাপমেনদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। তাদের সাথে পরামর্শ করে জানতে হবে কিভাবে ইসলাম প্রচারণা বেশী বেশী করা যায়। আমি এমন একটি ওয়েবসাইটের নাম জানি যা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গানের ওয়েবসাইট ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা ইসলামিক ওয়েবে রুপান্তরিত করে ফেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাতে যত গান ছিল সব ডিলেট করে দিয়ে কুরআন ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয় স্থান দেন।

এই সব যা বললাম তা আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের কল্যাণার্থে। কেউ তা করলে নিঃসন্দেহে পুন্যের অধিকারী হবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তিনি যেন সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(২)
গাজা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না।

বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم* فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

অর্থ : তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

আমরা এখন হাসতে পারি না। আমরা কিভাবেই হাসবো? অথচ আমাদের বিধবা বোন ফিলিস্তীনে শহীদ হচ্ছে। মা-বোনের স্বামী আহত হচ্ছে। সন্তান ইয়াতীম হচ্ছে।

কিভাবে হাসবো? অথচ আমাদের সামনে গাজার নিহত আহত ভাইদের চেহারা ফুটে উঠছে। আমরা কিভাবে হাসতে পারি অথচ মসজিদ ধ্বংস করা হচ্ছে। কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। আহতদেরসহ হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তাদের আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়।

কিভাবেই হাসবো? অথচ আমাদের কপালে ক্ষত। বিশ্বের সামনে আমরা অপমানিত, লাঞ্ছিত। আমাদের দুঃখ, যাতনা, কষ্ট-লাঞ্ছনাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘের কথিত নিরাপত্তা সংস্থা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ইত্যাদির কাছে আমরা সাহায্য চাই। অথচ প্রকৃত পক্ষে তারা আমাদের শত্রু অথবা শত্রুর সাহায্যকারী।

আসুন আমাদের কপালের ক্ষত নিয়ে আলোচনা করি। ফিলিস্তীন নিয়ে যা ছিল রিসালাতের কেন্দ্রস্থল। প্রথম কিবলা যা আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবী (সা) ও মুসলিম জাতির কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ফিলিস্তীন ছাড়া অন্য কোন দেশ কিবলার জন্য নির্ধারিত করেননি। ফিলিস্তীন সেই শহর যা আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীর রাত্রির সফরস্থল বানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

আমি এমন এক দেশ সম্পর্কে আলোচনা করছি যেখানে শেষ যমানায় ঈসা আ. অবতরণ করবেন।

আমরা গাজায় আহতদের সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

হারানো হৃত দেশের জন্য ক্রন্দন নিয়ে কথা বলছি না। বরং আমরা সেখানে কি ভূমিকা রাখতে পারি তা নিয়ে কথা বলছি। যেন আল্লাহ তায়ালা গাজার ভাইদের প্রতি আমাদের অবহেলার কারণে পাকড়াও না করেন।

আসুন, ফিলিস্তীনের আহত ভাইদের নিয়ে কথা বলি। এছাড়া অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা বৈধ হবে না। কেননা, এটা কঠিন মুসিবত। খাটে বিছানো মৃত ব্যক্তি তুল্য যার জানাযা পড়তে হবে।

শহীদ ড. নাযার রাইয়ান। বর্বর ইয়াহুদীরাষ্ট্র ইসরাইল তার বাড়ি মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। পাঁচটি বোমা নিক্ষেপ করে। অথচ ২০০ বা ৩০০ কেজির এই সব বোমার একটি বোমাই যথেষ্ট ছিল।

তারা এই ব্যক্তির শক্তি, জিহাদী জযবা সম্পর্কে জানে। ড. সাহেব ১৯৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ৫০ বছরে শাহাদাত বরণ করলেন। তার চার স্ত্রী ও ১১ সন্তানসহ শহীদ হন।

তিনি হাদীসের প্রফেসর ছিলেন। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি গাজা থেকে অনার্স, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স বেং মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

তার সহপাঠী ড. আব্দুল্লাহ শাওয়াহিনীর তথ্য মতে, তার থিসিস ছিল শাহাদাত ও শুহাদা সম্পর্কিত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস নিয়ে। তিনি বলেন, সেই থিসিসের শেষে ড. নাযার এই দুআ লেখে ছিলেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ وَاَهْلِيْ الشَّهَادَةَ

[হে আল্লাহ! আমাকে ও আমার পরিবারকে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের তাওফিক দান করুন।]
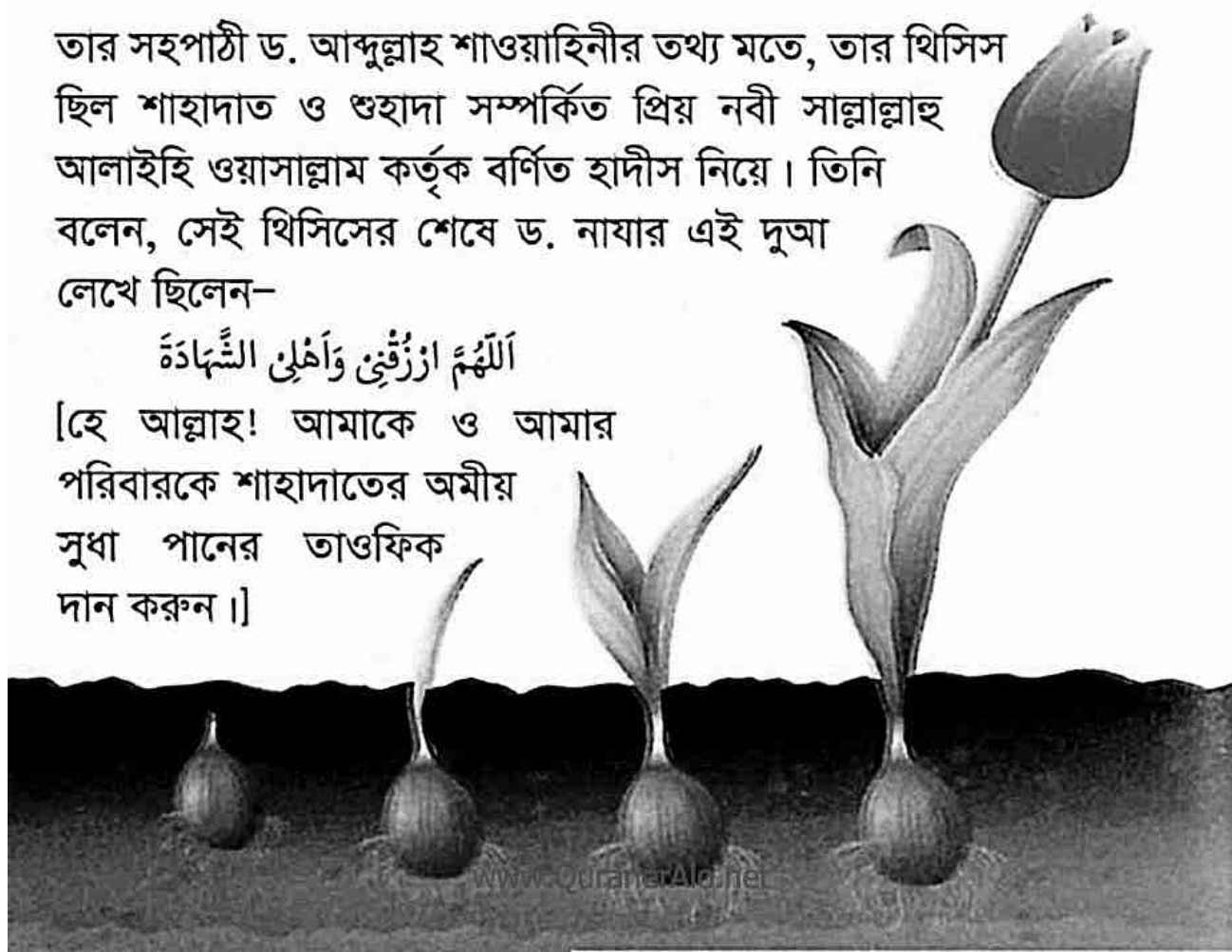
লক্ষ্যণীয় যে, শুধু ডা. নাযারের আলোচনা করার দ্বারা আমি অন্যান্য শহীদদের গুরুত্ব হ্রাস করছি না। যুদ্ধের ময়দান থেকে মুসলিম সৈন্যরা ফিরে এলে ওমর রা. প্রশ্ন করলেন, কে কে শহীদ হয়েছে? লোকেরা বলল, অমুক অমুক। জনৈক ব্যক্তি বলল, এমন অনেকে শহীদ হয়েছেন যাদেরকে আমীরুল মুমিনীন চিনেন না।

তখন ওমর রা. বললেন, আমিরুল মুমিনীন তাদেরকে না চিনলেই কি আসে যায়। তাদেরকে আল্লাহ চিনেছেন এটাই যথেষ্ট।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বলেন, আমার কি হলো যে, বিছানায় মৃতের সংখ্যা বেশি দেখছি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর রহমতে ডেকে রাখুক। আমাদেরকে সেই দলভুক্ত করুক যাদের মর্যাদা আল্লাহ জান্নাতে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আমাদেরকে তাঁর পথে শাহাদাত নসীব করুন।

আমরা গাজা প্রসঙ্গে কথা বলছি। শুধু কথা বলাই যথেষ্ট? কোন ভূমিকা রাখা বা উদ্যোগ গ্রহণ করার দায়িত্ববোধ কি নেই?

এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছিলাম যে, প্রিয় নবী সা. সেই প্রথম ব্যক্তি যার জন্মলগ্নেই চারপাশে শত্রু ছিল। (তবাকাতে ইবনে সা'দ) হালিমা সাদিয়া বলেন, আমার সাথে ইয়াহুদিদের একটি দলের সাক্ষাত হয়। আমি প্রিয় মুহাম্মদকে নিয়ে নিজ গোত্রে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে ইয়াহুদিরা প্রশ্ন করল, এই শিশু কে? তারা তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল।

হালিমা বললেন, 'সে আমার সন্তান।' তিনি সন্তানের নিরাপত্তার ভয় পেলেন।

ইয়াহুদিরা প্রশ্ন করল, তার পিতা কি জীবিত? হালিমা মনে করলেন, হয়ত তারা ইয়াতীমকে সাহায্য করতে চায়। তাই তিনি বললেন, না তার পিতা মৃত। তখন তারা তাকে জোড়পূর্বক ধরে নিয়ে যেতে চাইল। তখন ভয়ে সন্ত্রস্ত হালিমা তড়িঘড়ি করে বললেন, 'আরে না না। তার পিতা জীবিত। এই তার পিতা।' এই বলে নিজ স্বামীর দিকে ইশারা করলেন।

ইয়াহুদিরা বলল, যদি তার পিতা মৃত হতো, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতাম।

হালিমা বলেন, ইয়াহুদিরা বলেছিল, তার চেহারায় নবুওয়াতের নিদর্শন আছে যা আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি।

তাই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোলে থাকা অবস্থায়ই শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন।

প্রিয় নবী সা. ধীরে ধীরে বড় হলেন। এক সময় নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন। কুরাইশ প্রতিনিধিদল ইয়াহুদি পণ্ডিতদের কাছে এসে বলল, আমাদের কাছে এমন এক ব্যক্তি আছে, যে বলে আমি নবী। আকাশ থেকে আমার কাছে ওহী আসে। হে ইহুদীরা! তোমরা তো কিতাবধারী। এব্যাপারে তোমাদের কি অভিমত? ইয়াহুদিরা বলল, তোমরা তার থেকে অনেক ভাল। তোমরা যারা মূর্তিপূজা কর দেব-দেবীর সামনে যবাহ্ নাযরানা পেশ কর এবং আল্লাহর সাথে শিরক কর; তোমরা তার থেকে বেশি সরল পথপ্রাপ্ত।

তাদের নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করলেন। সেখানেও বনু নযীর, বনু কাইনুকা, বনু কুরাইযা তার পিছে লেগে থাকে। তাদের সাথে তার যুদ্ধ হয়। বনু নযীর সর্বপ্রথম প্রিয়নবীকে হত্যার চক্রান্ত করে। পরে তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়। কেননা, তারা কৃত সন্ধি ভঙ্গ করে।

বনু কাইনুকা জনৈকা মুসলিম নারীকে অপহরণের চেষ্টা করে। এক মুসলিমকে হত্যাও করে। ফলে তাদেরকে প্রিয় নবী সা. মদীনা থেকে বিতাড়ন করেন। বনু কুরাইযা আহযাবের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মিলে যায়। প্রিয় নবী সা. কে পিছন থেকে আঘাত করে। আল্লাহ বলেন–

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

যখন তারা (তোমাদের বিরুদ্ধে) সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে। *[সূরা আহযাব : ১০]*

তারা পিছন থেকে আক্রমণ করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তাদের ফায়সালা করে দেন। সুতরাং বুঝা গেল ইয়াহুদিদের স্বভাব হলো প্রতারণা করা। আপনি শূকরকে যতই পবিত্র করতে চেষ্টা করেন না কেন তা অপবিত্রই থেকে যাবে। তাদের স্বভাব হচ্ছে, ধোঁকা দেওয়া প্রতারণা করা। যেমন মানুষের স্বভাব হলো যখন সে গরম অনুভব করে তখন তার দেহ থেকে ঘাম বের হয়। সে যখন অনেক কথা বলে, তার মুখের থুথু শুকিয়ে যায়। সুতরাং ইয়াহুদিদের স্বভাবই এমন।

অধিকন্তু ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র শুধুমাত্র মুসলিম জাতির সাথেই নয় বরং পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সাথে। কিন্তু মুসলিমদের সাথে তাদের শত্রুতা হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের থেকেও বেশি। এজন্য আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুসলমানদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে এ ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরকে, আর তন্মধ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐসব লোককে পাবে, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, এটা

এ কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু জ্ঞানপিপাসু আলেম এবং আবেদ বান্দা রয়েছে, আর এই কারণে যে, তারা অহংকারী নয়। *[সূরা মায়েদা : ৮২]*

কাজেই আমরা যতই সম্প্রীতির চেষ্টা করি না কেন ব্যর্থ হবে। ইয়াহুদিরা কখনো আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সদ্ভাব দেখাবে না। আল্লাহ বলেন–

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

এবং ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানগণ তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। *[সূরা বাকারা : ১২০]*

তারা তখনই সদ্ভাব দেখাবে যখন বলব, উযাইর আল্লাহর পুত্র। যখন তাকিয়া পরিধান করবো যখন দেয়ালের পাশে মাথা ঝাঁকুনি দিব। (এগুলো ইয়াহুদিদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান)

আমাদেরকে তাদের বীজ চিনতে হবে। আমরা ষাট বছর ধরে তাদের সাথে লাঞ্ছনা-অপদস্থতার সাথে আলোচনার টেবিলে কথা বলে যাচ্ছি। আমাদের মূর্খতা, কাপুরুষতা দেখে বিশ্ব হাসছে। অথচ প্রতিনিয়ত আমাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিচ্ছে। তারা জানে আমরা কি করবো। আমরা তাদের গালি দিব, তাদের ঘৃণা করবো এবং পরিশেষে অভিযোগপত্র নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে যাবো, যার অফিসে বক্সসমূহ আমাদের অভিযোগপত্রে ভরে গেছে।

তাদের সমাধান একমাত্র সামনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

আর সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। *[সূরা তাওবা : ৩৬]*

হাদীসে এসেছে, প্রিয় নবী সা আওফ বিন মালেক রা.কে বলেন–

তুমি ছয়টি বিষয়কে কিয়ামতের আলামত

হিসাবে গণনা করো। (তন্মধ্যে প্রথমে) আমার মৃত্যু ও বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়।' (বোখারি : ২৯৪০) যেন তিনি সাহাবীদের বলছেন, আমার মৃত্যুর পর তোমাদের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম এক্ষেত্রে উদাসিনতা প্রদর্শন করেননি। প্রিয় নবী সা. ১১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন আর ১৫ হিজরীতে বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়। আবু উবাইদা রা. খ্রিস্টান পাদ্রী থেকে চাবি নেওয়ার জন্য গেলেন। পাদ্রী বলল, যে চাবি নিবে তার সমস্ত গুণাবলী (যা আমাদের কিতাবে আছে) তোমার মাঝে নেই। অতপর ওমর রা. আসলেন। পাদ্রী তার হাতে চাবি দিয়ে দিল।

ওমরের হাতে চাবি দিয়ে পাদ্রী কাঁদতে লাগলো। ওমর রা. বললেন, কেন কাঁদছো? পাদ্রী বলল, আমরা রাজত্ব বিলুপ্তির জন্য কাঁদছি না। বরং কাঁদছি এজন্য যে, এই পবিত্র ভূমি চিরদিন তোমাদের হাতে থাকবে।

আল্লাহর কসম, কুদস ক্রসেডের সময় মাত্র ৯১ বছর আমাদের হাত থেকে বঞ্চিত ছিল। এরপর আমাদের হাতে এসেছে। এখন ৪২ বছর ধরে তাদের হাতে অবরুদ্ধ। অচিরেই তা আবার ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আমি সব জায়গায় মুসলিম যুবকদের স্মরণ করিয়ে দেই যে, পবিত্র ভূমি কুদসে তাদের ওয়ারিসী স্বত্ব রয়েছে। সেই সম্পত্তি তাদের রক্ষা করতে হবে।

একটি কাহিনী শুনাচ্ছি, জনৈক ইয়াহুদি এসে জনৈক ফিলিস্তীনির কাছে পবিত্র ভূমির জায়গা কিনতে চাইল।

সে ফিলিস্তীনিকে বলল, তুমি যা ইচ্ছা তা চাও।
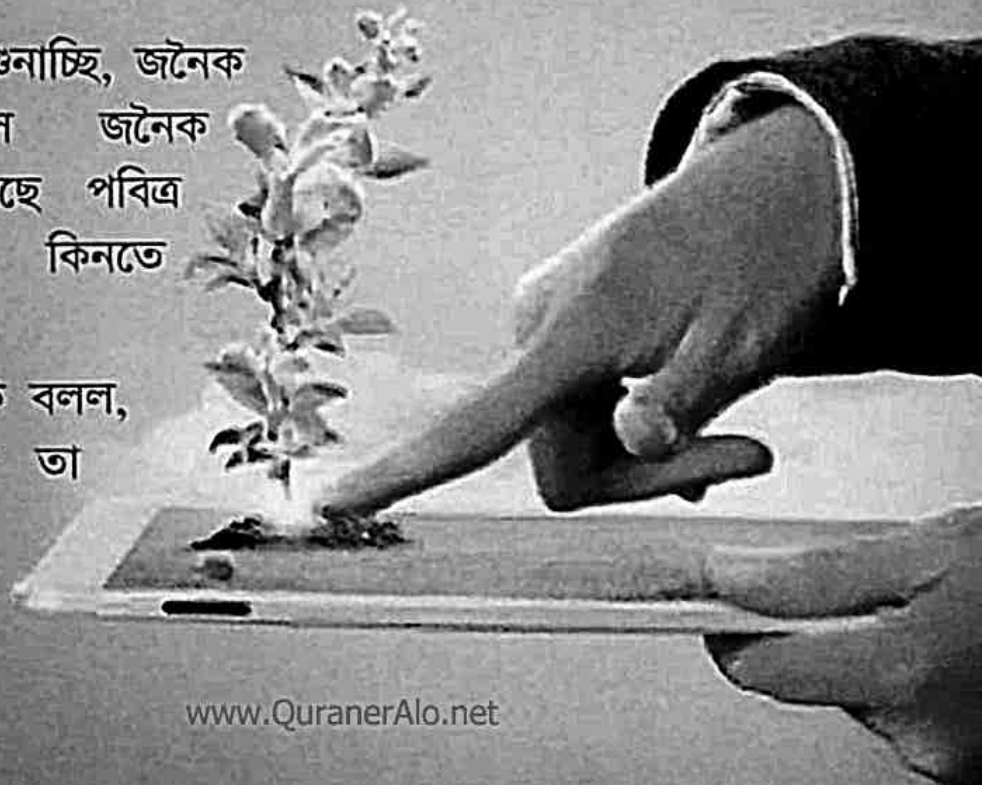
আমি তোমাকে দিয়ে দিব। তবে বিনিময়ে এই পবিত্র ভূমির কিছু জমি কিনতে চাই। ফিলিস্তীনি বলল, আমি তোমাকে বিনা মূল্যে দিব। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, বিনা মূল্যে!

ফিলিস্তীনি বলল, হ্যা, বিনা মূল্যে। তবে একটি শর্ত আছে। সে বলল : কি শর্ত? ফিলিস্তীনি বলল, আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে বলে গেছেন, এই ভূখণ্ডে আমার সাথে ৩০০ মিলিয়ন মুসলিম আছে, যারা আমার অংশীদার।

এখন তুমি যদি সবার কাছ থেকে সম্মতির স্বাক্ষর আনতে পারো তাহলে এই ভূমি তোমাকে বিনা মূল্যে দিয়ে দিবো।

খুবই চিন্তার বিষয়। হে মুসলিম সম্প্রদায়! এই ভূমি তোমাদের পিতৃ কর্তৃক মিরাছী সম্পদ। কেননা, ফিলিস্তীন ইসলামী ওয়াকফকৃত সম্পত্তি, এতে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। প্রত্যেকের এ ব্যাপারে সচেতন থাকা আবশ্যক।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে শাম বিজয়ের নিমিত্ত উসামাকে সসৈন্য অভিযানে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করেন। প্রিয় নবী জানতেন না যে, তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু ইন্তেকাল করলেন। ফলশ্রুতিতে সাহাবায়ে কেরাম জায়শে উসামা প্রেরণ করেন। মুতার যুদ্ধ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পূর্বে ছিল।

মোটকথা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় প্রশাসন ব্যবস্থা মজবুত করে বাইতুল মাকদাস মুক্ত করার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। যেমনভাবে মুশরিকদের থেকে মক্কাকে মুক্ত করেছিলেন। হারামে অবস্থিত সব মূর্তি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং কুদসের মর্যাদা অনেক। কাজেই আমরা শুধু হানাদার বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ কোন দেশ
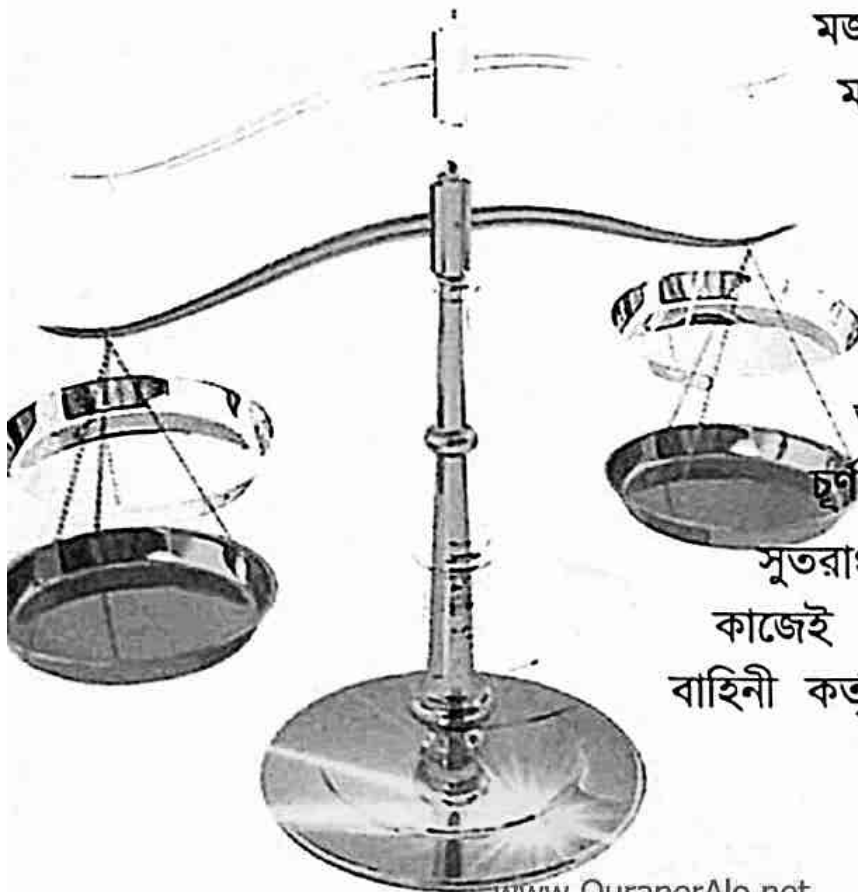
নিয়ে কথা বলছি না। প্রিয় নবী সা. অত্র অঞ্চলে জিহাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। যেভাবে খায়বার ও অন্যান্য অঞ্চলে জিহাদ করেন। তিনিই জিহাদের প্রথম শিক্ষক।

উলামায়ে কেরাম জিহাদ প্রসঙ্গে কথা বললে জোড় দিয়ে বলেন, সেই সব দেশে আগে সংগ্রাম করতে হবে যেসব দেশ একসময় মুসলমানদের হাতে ছিল। শত্রুরা তা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। যেমন ফিলিস্তীন, আন্দোলুস।

ড. জিহাদ ফিলিস্তীনে তাদের ত্রাণ, পুনর্বাসন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেন, ফিলিস্তীনের ভৌগলিক ও ধর্মীয় বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্যের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠন সেখানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। হানাদারদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এনজিও তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। আজ ফিলিস্তীনবাসী যে খাদ্য, ত্রাণসামগ্রী, জ্বালানী ও ঔষধ পাচ্ছেন তার প্রধান কারণ হানাদারদের উপস্থিতি।

বিভিন্ন জরিপে গাজাবাসীর দুর্ভোগ চিত্র ফুটে উঠেছে। গাজায় সর্বশেষ হামলায় মাত্র সাত দিনে ৪৩০ জন নারী পুরুষ শহীদ হয়। ২৩০০ আহত তন্মধ্যে ৫০০ জনের অবস্থা আশংকাজনক। তাদের এক চতুর্থাংশ শিশু। বর্তমানে গাজায় ১৫০০০ জন নারী-পুরুষ শিশু বৃদ্ধ আশ্রয়হীন মানবেতর জীবন যাপন করছে। কেননা, তাদের ৩০০টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বংস্ত করে দেওয়া হয়েছে।

গাজা উপত্যকায় কোন ময়দা রুটি নেই। অথচ দৈনিক ৩০০ টন ময়দা প্রয়োজন।

গাজায় দুধ নেই। অথচ দৈনিক দুধের চাহিদা ৩০ টন। গাজার ৮০% এলাকায় বিদুৎ নেই। হাসপাতালে বিদুৎ নেই। প্রসূতি গাইনীরা মোমবাতি দিয়ে কাজ করছেন।

আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না যে, দুই ইন্তিফাদায় ইয়াহুদীরা ৮৪৮ জন মেধাবী ছাত্রকে হত্যা করেছে। আহত করেছে ৪৭৯২ জনকে। তাদের অর্ধেক চিরদিনের জন্য পঙ্গু। সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহুদিদের অধিকাংশ আঘাত মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে লেগেছে। ইয়াহুদি সৈন্য হাত-পায়ে আঘাত করে না। তারা এমন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে আঘাত করে যেন সে না মরলেও চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

আরব দেশে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্ররা বৎসরে ২৪০ দিন ক্লাশ করে। কিন্তু ফিলিস্তীনে শিক্ষার্থীরা মাত্র ১০০ দিন স্কুলে যেতে পারে। কিন্তু আপনারা আশ্চর্য হবেন যে,আরব দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে কম নিরক্ষরতার হার ফিলিস্তীনে। (তাদের ৯৯% শিক্ষিত, মাত্র ১% অশিক্ষিত)

ইয়াহুদিরা নিজেদেরকে একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জাতি দাবি করে। আর অন্যান্য জাতি পশুতুল্য।

বিগত ষাট বছরে ৭,০০,০০০ ফিলিস্তীনি বন্দী হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি চার জনে এক জন। এই হচ্ছে, ফিলিস্তীন জাতির দুর্ভোগের চিত্র।

আপনি আশ্চর্য হবেন যে, ইয়াহুদি বিদ্বেষ শুধু মানব জাতির প্রতিই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বৃক্ষলতা ও পশু পাখিও তাদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত নয়।

তারা ৫ বছরে ১১ লক্ষ বৃক্ষ কেটেছে। বনের জন্তু জানোয়ারের সাথেও তারা যুদ্ধ করে। হায়! মানবতার কত দুর্দশা!!

এইসব করুণ চিত্রের মাঝে কিছু সুসংবাদও আমাদের কানে ভেসে আসে। ফিলিস্তীনে অনেক ইয়াতীম শিশু আছে। আমাদের জরিপ মতে, ৫৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার ইয়াতীম আল্লাহর রহমতে মাকফুল (যার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে) হিসাবে জীবন যাপন করছে।

অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার বন্দী ও শহীদ পরিবারকে পছন্দ করে। কেননা, ১১ হাজার ফিলিস্তীন বন্দীর অর্ধেকেই বিবাহিত। তাদের স্ত্রী-সন্তান আছে। সুতরাং যারা তাদের দায়িত্ব নিবে সে জিহাদ করার সওয়াব পাবে।

ফিলিস্তীনে হিফজুল কুরআনের হালকা হয়। গাজার ৮০ হাজার ছাত্র/ছাত্রী হিফজুল কুরআনের হালকায় অংশ নেয়। এসব হালকা থেকে ৪০০০ হাফেজ হেফয সমাপ্ত করেছে। আমরা আগামী বছর ১০ হাজার হাফেজ তৈরীর এক প্রোগ্রাম চালাচ্ছি যার ব্যয়ভার হবে তিন মিলিয়ন ডলার।

গাজা ফিলিস্তীনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের শাসন ক্ষমতায় চলে না। এখানে মাহমুদ আব্বাসের ক্ষমতা নেই। বরং তা হামাসের নিয়ন্ত্রণাধীন। এটা কি কম না কি যে, ইসরাঈলের কোন কর্তৃত্ব এখন গাজায় নেই। নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতি এক। প্রিয় নবী সা. বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের জন্য ভিত্তিস্বরূপ। এক অংশ আরেক অংশকে শক্তিশালী করে।

কেউ যদি গাজার ভাইদের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, তাতে আহতদের আর্তনাদ ও নিহতের রক্তস্রোত দেখেও তার হৃদয়ে ঈমান না জাগে, তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ না করে তাহলে এর থেকে আশ্চর্য বিষয় আর নেই। সুতরাং কমপক্ষে হলেও আমাদের তাদের প্রতি হৃদয়ের ব্যথিত অনুভূতি প্রকাশ করতে হবে।
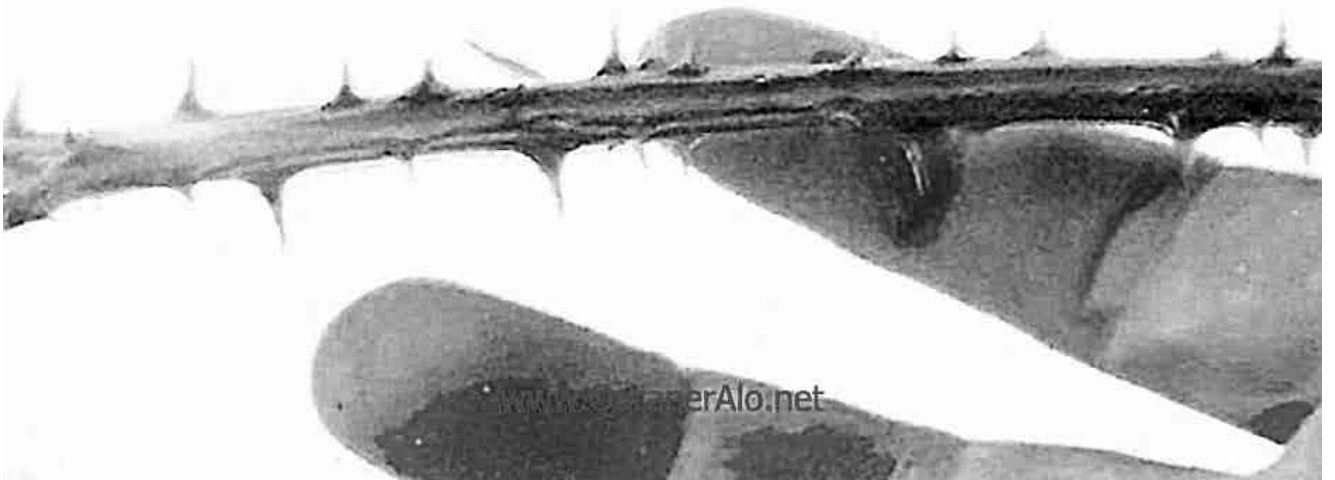
আর যার হৃদয়ে এতটুকু ব্যথিত সহমর্মিতাও প্রকাশ পাবে না সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করতে পারবে না। তার জন্য মুসলিম দাবি করা অন্যায়।

তদ্রূপ এসব করুণ দৃশ্য দেখেও টেলিভিশনে সিরিজ দেখা, অশ্লীল ভিডিও দেখাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট। হায়! তার হৃদয় যেন পাথর। সে তার ভাইদের ব্যাপারে কোন চিন্তা করে না। অথচ প্রিয় নবী সা. বলেন, কোন মুসলিম যদি কাউকে এমন স্থানে লাঞ্ছিত করে যেখানে তার ইজ্জত আবরু নষ্ট হয় তাকে আল্লাহ এমন স্থানে অপদস্ত করবেন যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে।

নিঃসন্দেহে আমাদের নিহতরা জান্নাতে। তাদের নিহতরা জাহান্নামে। যেমনটা প্রিয় নবী সা. হাদীসে উল্লেখ করেছেন। মানুষ তার ভাইয়ের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের আল্লাহর নিম্নের বাণীও মনে রাখতে হবে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতএব তারা হয় হত্যা করে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হয়, এর (এই যুদ্ধের) দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইনজীলে এবং কুরআনে; আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাকো তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছো, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। *[সূরা তাওবা : ১১১]*

অন্যত্র বলেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

৪১

যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালক হতে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়।

[সূরা আলে ইমরান : ১৬৯]

প্রিয় নবী সা. সুসংবাদ দিয়েছেন, শহীদদের রুহ কেয়ামত দিবসে সবুজ পাখি হয়ে মনের আনন্দে জান্নাতে উড়বে। সে কামনা করবে যদি আবার কোন সৈন্যবাহিনী আল্লাহর পথে বের হয় তাহলে সেও বের হবে।

অনেক সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবী সা. এর কাছে আসল জিহাদে বের হওয়ার জন্য। কিন্তু নবীজী তাদেকে কোন বাহন দিতে পারেন নি। তখন তারা অশ্রুসজল চোখে ফিরে যায়। তাদের এই অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

আর ওই লোকদের ওপরও কোন গোনাহ নেই, যখন তারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলে দিয়েছো আমার নিকট তো কোন কিছু নেই যার ওপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এ অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই। *[সূরা তাওবা : ৯২]*

গাজার নিহত-আহত ভাইদের জন্য চিন্তিত হলেও আমরা বলতে পারি যে, গাজাবাসী সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে যুদ্ধ করছে। আল্লাহর কাছে দুআ করি আল্লাহ যেন তাদের চিত্ত প্রশান্ত করেন। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। তাদের পা দৃঢ় রাখেন। ইয়াহুদিদের সাথে তাদের এই যুদ্ধ শরীয়ত সমর্থিত যুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা আমাদের আল্লাহর পথে মুজাহিদ হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

অনেক ভাই অভিযোগ করেন, কেন এ ব্যাপারে আমাদের শাসকরা পদক্ষেপ

নেয় না। তার মতে, শুধুমাত্র অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করাই একমাত্র দায়িত্ব ও করণীয়। অথচ সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়াও আরো অনেক কিছু করার অবকাশ আছে। স্মর্তব্য যে, কেউ যদি মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যে ইতিবাচক ভূমিকা না রাখে তাহলে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। ইতিহাস আমাদেরকে ছাড়বে না। ভবিষ্যতে নতুন প্রজন্ম আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখবে।

অনেকে বলেন, তাদের জন্য মসজিদে দুআই কি যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ দুআ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শুধু দুআতে সীমিত থাকলে চলবে না। বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

তুমি বলে দাওঃ তোমরা কাজ করতে থাকো, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও ঈমানদারগণ, আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন। *[সূরা তাওবা : ১০৫]*

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এখন তুমি যা করবে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তা সম্পর্কে অবহিত করবেন।
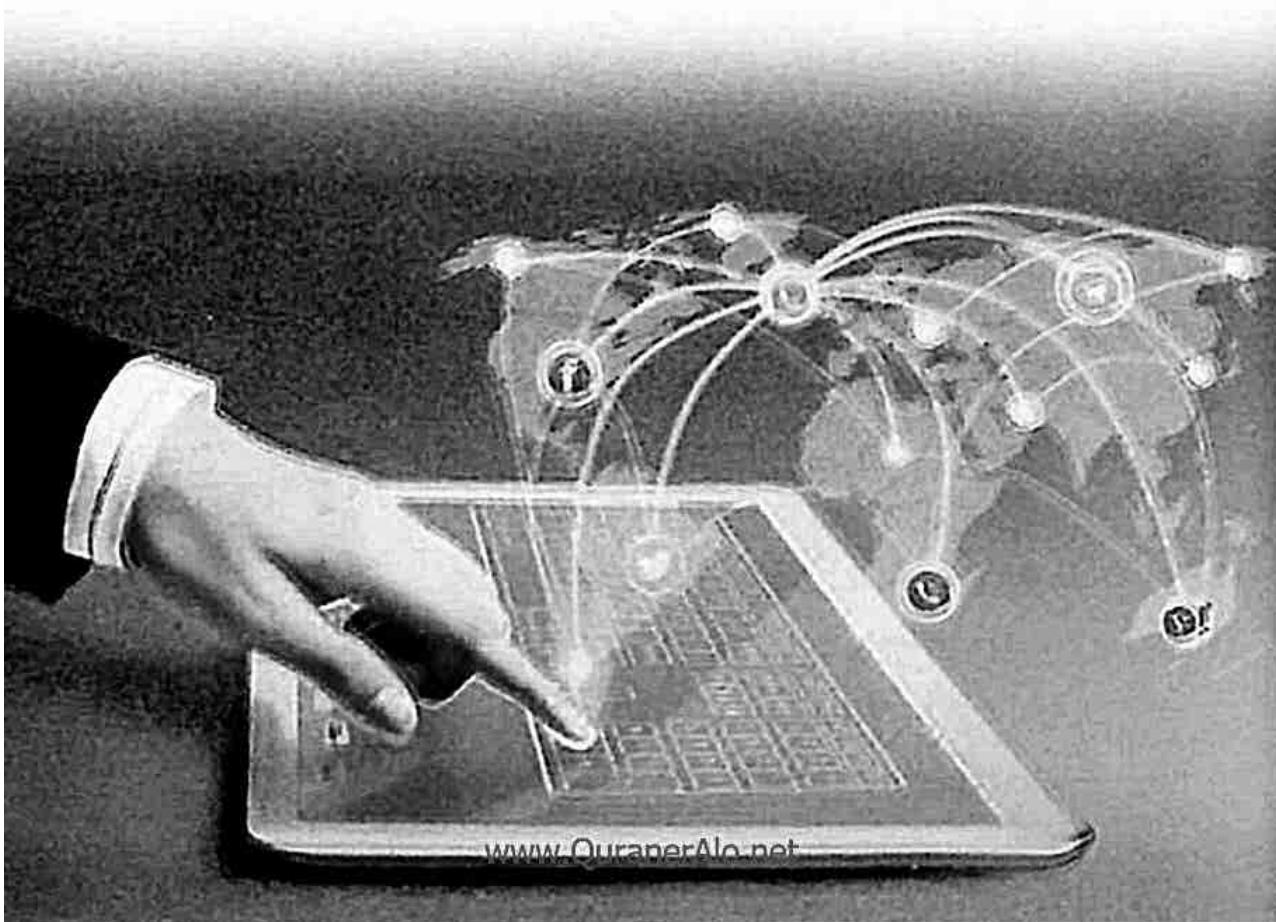
আমরা যেভাবে গাজাবাসীর সেবা করতে পারি

যথাসম্ভব ধন, সম্পদ, সময়, পরিশ্রম দিয়ে তাদের সাহায্য করা। সামাজিক সেবামূলক কর্মকান্ড করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তার মনের অনুভূতি কেমন? আপনি দেখবেন সে এ কাজে এত তৃপ্তি পাচ্ছে যা অন্য কোন কাজে নেই।

যদি কোন সেবামূলক সংস্থা-সংগঠনে জড়িত থেকে কাজ করতে না পারেন তাহলে ইন্টারনেটে আপনার সময় শক্তি ব্যয় করুন। সুন্দর সুন্দর প্যাকার্ড, লিফলেটে তাদের সমর্থনে প্রচারণা চালান। আসলে কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পারি। অপরজন করবে- এ আশায় বসে না থেকে আমাদের কাজ করে যাওয়া উচিত। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি এইসব আন্তর্জাতিক সংগঠন, নিরাপত্তা পরিষদ ও মানবাধিকার সংগঠন গাজায় কোন ভূমিকা রাখতে পারবে না।

প্রচার মাধ্যমগুলো নিহত আহত ও ধ্বংসস্তুপের রিপোর্ট, দৃশ্য প্রচার করেই ক্ষ্যান্ত হয়ে যায়। যা আমরা আমাদের টেলিভিশনে দেখি। কিন্তু তারা মানবিক দিক তুলে ধরে না। আমাদের মানবিক দিকটি তুলে ধরতে হবে। বিশ্বের সামনে এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে হবে যে, ইসরাইল শুধু (কথিত) সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ সংহত করছে না বরং নিরপরাধ নাগরিকদের হত্যা করছে। মানবতাকে অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত করছে।

মিডিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা সুবাদে বলছি যে, জনৈক প্রতিনিধি তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন, তিনি বিশ্বের দরবারে আমাদের দুর্যোগ তুলে ধরবেন।

কিন্তু আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে, C.N.N আরব বিশ্বের খবর বিশেষভাবে প্রচার করবে?

কানাডার এক ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। তিনি বললেন, আমি জানি না আপনাদের কি হয়েছে? আমি বললাম, আপনি কেন জানেন না? ইন্টারনেটে কি দেখেন না? তিনি বললেন, আমি ইন্টারনেটে বসি না। আমি বললাম, C.N.N -এ কি এ সংক্রান্ত খবর পান না? তিনি বললেন, C.N.N মাত্র ৪ মিনিট ফিলিস্তীন ও গাজা নিয়ে সংবাদ প্রচার করে। তারপর অন্যান্য সংবাদে চলে যায়। আমি বললাম, আমাদের এখানে C.N.N তো এই বিষয়ে দৈনিক দুই ঘন্টা সংবাদ প্রচার করে।

তিনি বললেন, আপনাদের অঞ্চলের C.N.N আমাদের এখানে সম্প্রচার করে না। আমেরিকান জাতির জন্য ভিন্ন স্টেশন।

চিন্তা করুন, কিভাবে তারা ঘটনা চাপা দেয়। বুশকে প্রশ্ন করা হলে সে বলে, ইসরাইলের অধিকার আছে নিজের আত্মরক্ষা করার।

আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরের বন্ধু। [সূরা মায়েদা : ৫১]

তারা একে অপরের বন্ধু। তারা সবাই বলে, আল্লাহর সন্তান আছে। খ্রিস্টানরা তার নাম দিয়েছে ঈসা এবং ইয়াহুদিরা ওযাইর নাম দিয়েছে।

ফিলিস্তীন, গাজা ও রাফাহর মুসলিমদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা আবশ্যক। কারো সাথে যোগাযোগ হলে বলুন, 'সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আপনাদের সাথে আছে

এবং আল্লাহর দরবারে দুআ করছে।' আপনার এই কথা তাদের শক্তি যোগাবে।

আমি সৌদি, মিশর, উপসাগরীয়, ইয়ামান, শাম, ইরাক ও মরক্কো এবং ইউরোপ, আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর সব ভাইদের বলছি, আপনারা ফিলিস্তীনের ভাইদের সাথে যোগাযোগ রাখুন। তাদেরকে শত্রু প্রতিরোধ উৎসাহ দেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের দৃঢ়তা বজায় রাখুক।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, আমরা শেষ জমানায় ইয়াহুদীদের সাথে যুদ্ধ করবো।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে, তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি বৃক্ষ, পাথর বলবে, 'হে মুসলিম! আমার পিছনে ইয়াহুদী আছে। তাকে হত্যা কর।' তবে গারকাদ বৃক্ষ ব্যতীত। কেননা, তা ইয়াহুদিদের বৃক্ষ।

অন্য হাদীসে জর্দান সমুদ্রের (বাহরে মাইয়্যিত) কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, তোমরা জর্দান সমুদ্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমরা পূর্বে এবং তারা থাকবে পশ্চিমে। রাবী বলেন, আমি اردن(জর্ডান) কোথায় আছে জানি না। (যেহেতু তখন এই নামের দেশ ছিল না।)

আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, মৃত সাগরের পূর্বে জর্দান এবং তার পশ্চিমে ফিলিস্তীন। আমরা থাকবো পূর্বে আর তারা থাকবে পশ্চিমে। রাশিয়া আফ্রিকাসহ পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চল থেকে ইয়াহুদিরা এই যুদ্ধের জন্য একত্র হয়েছে।

ভৌগলিক রিপোর্ট বলছে, বাহরে মাইত(البحر الميت) যাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম نهر الاردن [জর্ডান নদী] বলে নামকরণ করেছেন তা বর্তমানে শুকিয়ে যাচ্ছে। ১৩ বছরের মধ্যে পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে।

লক্ষ্য করুন, (সুবহানাল্লাহ!) সেই নদীর পূর্বে জর্ডান এবং পশ্চিমে কুদসে ইয়াহুদিরা আছে। বর্তমানে জর্ডানে একটি নদী আছে কিন্তু তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রিয় নবী সা. এর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী অচিরেই মুসলিম ও ইয়াহুদিদের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হবে।

এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, ফিলিস্তীনের সংঘাত একটি ধর্মীয় সংঘাত। ইসরাইল রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা একমাত্র ইয়াহুদিদের চিন্তা-চেতনায় সীমাবদ্ধ ছিল।

হাইকালে সুলাইমান ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাদের জাতীয় স্বপ্ন আমরা জানি। জায়নবাদীরা ইয়াহুদি সৈন্য সমবেত করছে সেখানে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সুতরাং এই সমস্যাটি শুধু আরব সমস্যা নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সমস্যা। এই গূঢ়রহস্য আমাদের জানা থাকুক বা না থাকুক।

আরো কিছু সুসংবাদ

হামাস পাঁচ দিনে ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। এই কারণে এক মিলিয়ন ইয়াহুদি রকেটের ভয়ে গোপন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের অফি- আদালত, শিক্ষা-কার্যক্রম ৩ দিন বন্ধ ছিল। আল্লাহ বলেন, তাদের অন্তরে তিনি ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। *[সূরা আহযাব-২৬]*

প্রিয় নবী (সা.) বলেন, আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। সে প্রসঙ্গ বর্ণনায় তিনি বলেন–

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ

আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদিদের ভীরুতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
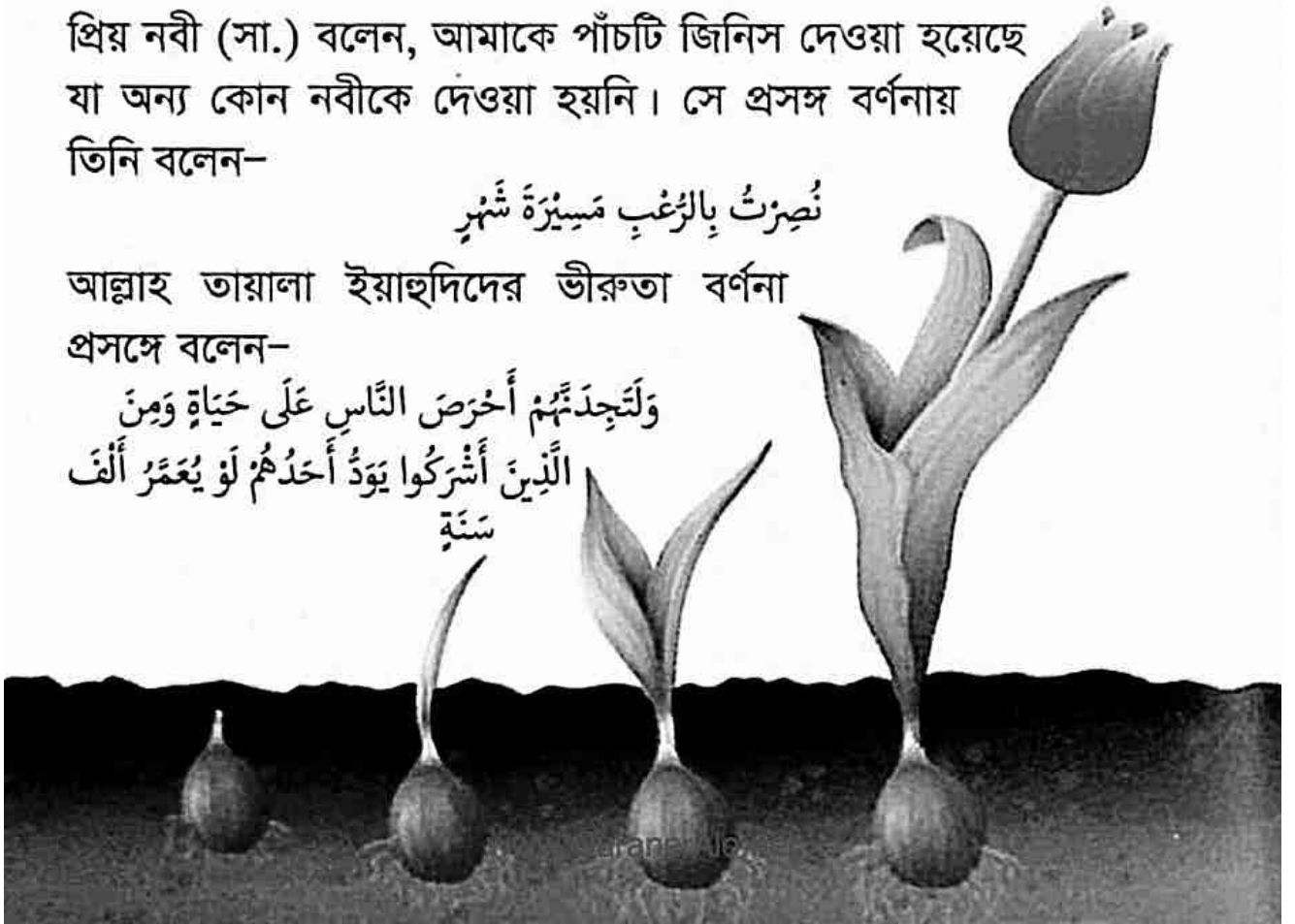
এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু আকাঙ্ক্ষী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে সে যেন হাজার বছর আয়ু প্রাপ্ত হয়। *[সূরা বাকারা : ৯৬]*

ইয়াহুদি পত্রিকা উল্লেখ করেছে যে, এক সপ্তাহ যুদ্ধ করতে ইসরাইলের দুই লক্ষ শেকল (মুদ্রা) ব্যয় হয়। দুই সপ্তাহ যুদ্ধ ব্যয় হচ্ছে সাড়ে তিন মিলিয়ার। একমাস যুদ্ধ করতে ব্যয় হয় প্রায় আট মিলিয়ার শেকল (মুদ্রা)। আমেরিকা ইয়াহুদিদের বেশী সাহায্য করে।

হামাস ভাইদের রকেট ক্ষেপণে জায়নবাদীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। তাদের সাইরেন বেল নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে বলেন–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

আর যখন তুমি [ধূলোবালি] নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলত ঃ তুমি তা নিক্ষেপ করনি; বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। *[সূরা আনফাল : ১৭]*

ইয়াহুদি ও অনেক আরব লেখকরা হামাসের ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। তারা উপহাস করতো। এখন দেখ এগুলো কত শক্তিশালী! আমেরিকায় এসব নিয়ে কথা হচ্ছে। পাঁচ দিনে ২০০ টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপিত হয়। আমাদের ভাইদেরকে আল্লাহ নুসরত করেছে। এব্যাপারে কি প্রশ্ন থাকতে পারে?

আমি বলছি, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ তোমাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন না। আল্লাহ তোমাদের সর্বদা সাহায্য করতে থাকবেন। সুতরাং কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

ইয়াহুদিদের সন্তানরা খুবই খারাপ দীক্ষা পায়। আল্লাহ বলেন, তারা কতক অসেকেল্লাদসান্তানখি ইয়াহুদি সৈন্যরা তাদের ছেলে মেয়েদের রকেট দেখার জন্য ডাকল। তাদেরকে বলল, তোমরা গাজার শিশুদের কাছে (তোমাদের দুর্দশা জানিয়ে) পত্র লিখ। তারা কি লিখবে?

যদি সমস্যার সমাধান নিয়ে কথা বলি তাহলে বলতে হয় যে, আকসা, গাজা, ফিলিস্তীন কখনো মুক্ত হবে না যতক্ষণ না আমরা নিজেদেরকে মানসিক দৈন্যতা থেকে মুক্ত করবো। যতক্ষণ না ভয় থেকে মুক্ত হবো। যতক্ষণ না লোভ লালসা থেকে মুক্ত হবো। যতক্ষণ না মূর্খ্য সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হবো। ইসরাইলের বাণিজ্যমন্ত্রী হামাসের রকেট নিয়ে উপহাস করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার পাশেই রকেট আঘাত হানল। সৈন্যরা তাকে গাড়ির নিচে লুকিয়ে বাঁচালো। আল্লাহ বলেন–

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ

তারা সমবেতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থেকে। *[সূরা হাশর : ১৪]*

আমি আমার দ্বীনি ভাইদের প্রতি এই বার্তা পাঠাচ্ছি যাতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ

এবং সে সম্প্রদায়ের অনুসরণে শৈথিল্য করো না যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তবে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্টভোগ করেছে এবং তৎসহ আল্লাহ হতে তোমাদের যে আশা (জান্নাতের) আছে, তাদের সে আশা নেই। *[সূরা নিসা : ১০৪]*

আল্লাহ মহান! ইয়াহুদি সৈন্যরা, নাগরিকরা ফিলিস্তীন দখল করে এখন যে ভয় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাদের শাস্তি আরো বাড়িয়ে দিবেন। বোমার আঘাতে তোমাদের যে কষ্ট হচ্ছে তা থেকেও কঠিন শাস্তিতে তারা
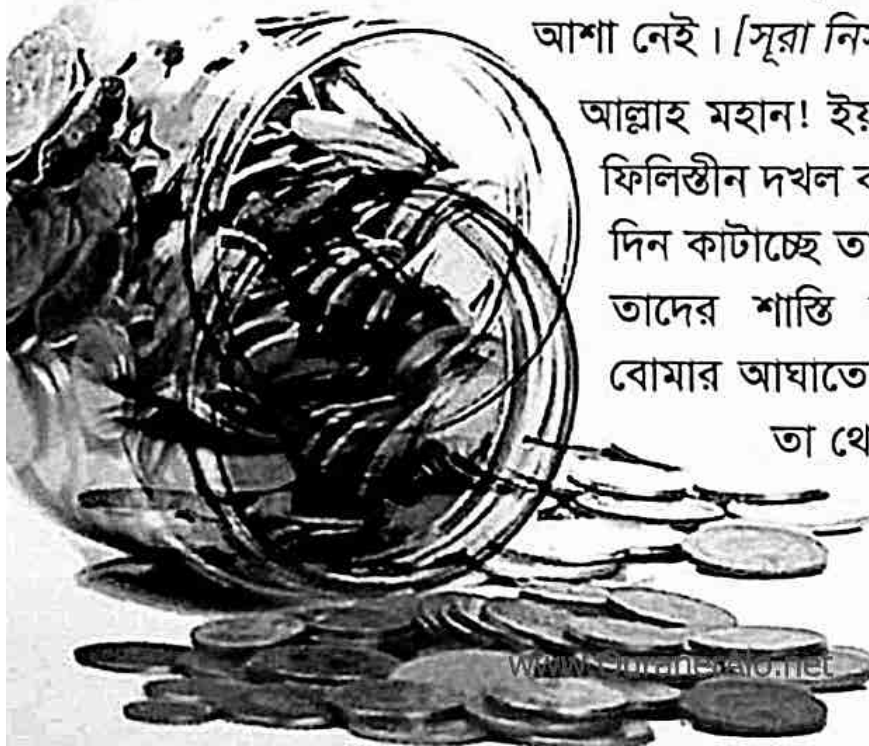
দিনাতিপাত করছে।

হে ভাইয়েরা! তোমরা যদি মারা যাও শহীদ হবে। যেমন আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا

মুমিনদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে তাদের কষ্টের উত্তম পুরস্কার দান করার জন্যে। *[সূরা আনফাল : ১৭]*

অন্যত্র বলেছেন–

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

এবং তোমাদের মধ্য হতে কতেকগুলোকে শহীদরূপে গ্রহণ করবেন।

[সূরা আলে ইমরান : ১৪০]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ পথে শাহাদাতের মর্তবা দান করুক। আমীন।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(৩)
সালাত
গুরুত্ব ও তাৎপর্য

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِي النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة

وموت الفارس الضرغام هدم* فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

অর্থ : তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

আজকে আমি এমন একটি ফরয সম্পর্কে আলোচনা করবো যা আকাশে ফরয হয়েছে। এই ফরযটি ব্যতিত অন্যগুলো দুনিয়ার জমিনে

ফরয হয়েছে।

এমন একটি ফরয বিধান নিয়ে আলোচনা করবো যার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল আ. কে নবীজীর কাছে পাঠান নি। বরং সরাসরি তিনি নিজেই প্রিয় নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমন একটি ফরয সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা মানুষ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সর্বপ্রথম আদায় করার জন্য আদিষ্ট হয়। প্রথমে যাকাত, রোযা, হজ্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ফরিযাকে আদায় করার জন্য।

এমন ফরয যার অপরাধ প্রথমে মানুষের জীবনে হয়। এমন ফরয যা ইনসানের হৃদয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে তার মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পর থেকে। তদ্রূপ কবরে দাফনের পূর্বে সেই ফরয আদায় করা হয়।

এমন একটি ফরয বিধান যার কল্যাণে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে সকল মানুষের উপর আপতিত বিপদ দূর করে দিবেন। শুধু মু'মিন ও মুসলিমদের থেকেই নয়; বরং সমস্ত মানুষের উপর যে বিপদ আসবে তা দূর করে দিবেন। যখন প্রিয় নবী সা. হাশরের মাঠে এই ফরিযাটি আদায় করবেন।

এমন একটি ফারিযা যার হিসাব কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম নেওয়া হবে। এমন ফরয যা পালনরত অবস্থায উমর রা. জখম হন, আলী রা. শহীদ হন। এমন একটি ফরয, যা প্রিয় নবী সা. মৃত্যু অবধি বারবার করেছেন।
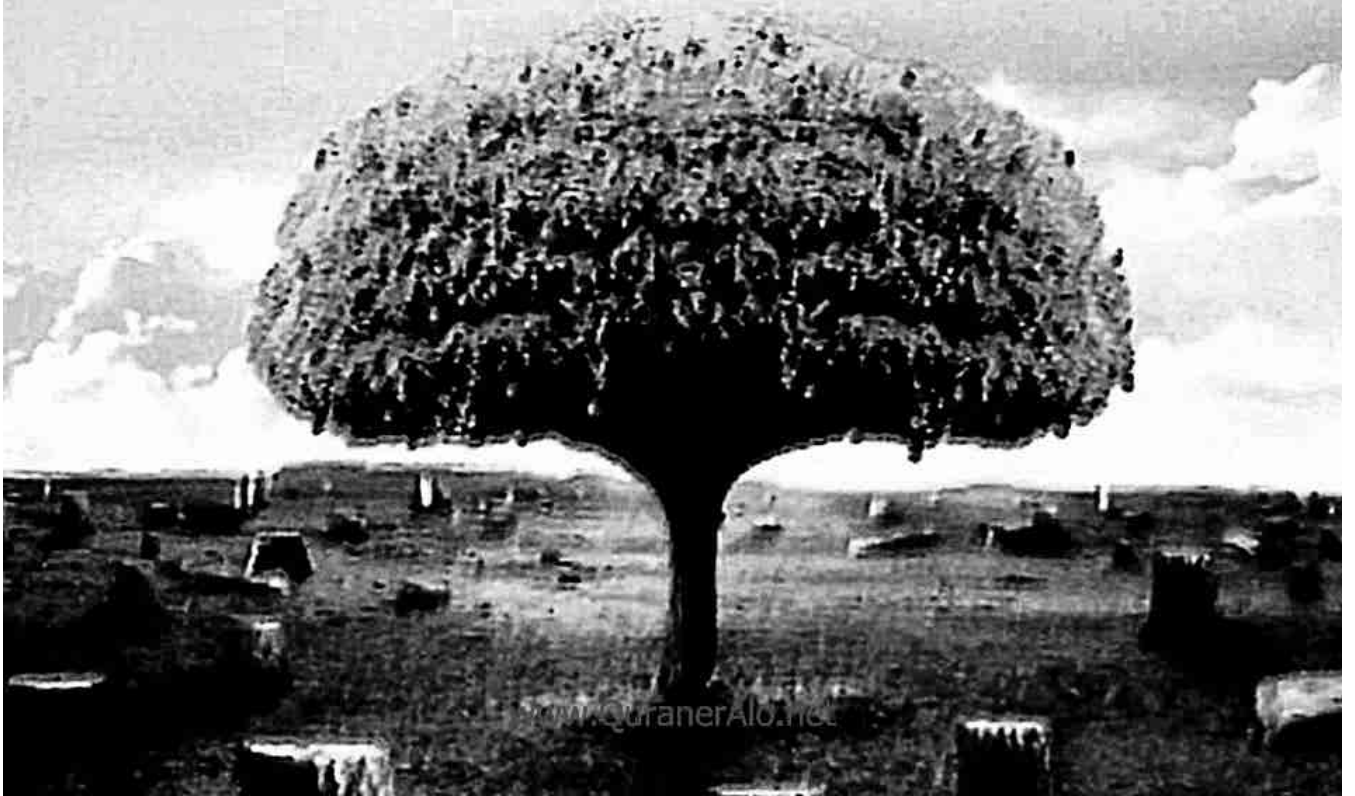
সেই ফরযটি কি? সেই ফরযটি হচ্ছে সালাত যা একাত্মবাদীদের চোখের শীতলতা। ইসলামের স্তম্ভ। শান্তির নিবাসের চাবি। সর্বশ্রেষ্ঠ আমল যা মানুষ তার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। সেই আমল যা সম্পর্কে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে।

সেই ইবাদত হচ্ছে সালাত, যা জমিনের বান্দা ও আকাশের রবের সাথে সংযোগ মাধ্যম। যে এটাকে হিফাযত করলো সে তার দীন হিফাযত করলো। যে তা নষ্ট করলো সে তার ধর্ম নষ্ট করলো। এর মাধ্যমেই প্রিয় নবী তাঁর জীবন শেষ করেছেন। সালাতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। সুতরাং আসুন সালাতে আমাদের নিদর্শন স্থাপন করি। সালাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখি।

সালাত এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ তায়ালা আকাশে ফরয করেছেন এবং বান্দা ও তার মাঝে রশিতুল্য বানিয়েছেন। তিনি এই ইবাদত তাঁর সামনে দৈনিক পাঁচবার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত্যুকালে প্রিয় নবী সা. বার বার বলেছিলেন اَلصَّلَاةُ اَلصَّلَاةُ (তোমরা সালাত কায়েম কর, সালাত কায়েম কর।)

কিয়ামত দিবসে যখন মানুষের উপর মহা বিপদ নেমে আসবে, তখন তারা কামনা করবে যেন আল্লাহ দ্রুত তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। তখন প্রিয় নবী সা. আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় পড়ে যাবেন। তিনি আল্লাহর এমন হামদ ছানা (প্রশংসা) পাঠ করবেন যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তখন

আল্লাহ খুশী হয়ে বলবেন–

اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَاسْأَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

'আপনি মাথা তুলোন। যা চান তাই দেওয়া হবে। সুপারিশ করুন আপনার সুপারিশ গ্রহণ হবে।' *[সহীহ বুখারী : ৬৫৬৫]*

তখন প্রিয় নবী সা. বলবেন, اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত।' সুতরাং কেয়ামতের ময়দানের বিভীষিকা দূর হবে সালাতের মাধ্যমে।

আপনারা জানেন যে, সালাত বান্দার জিম্মাদারী থেকে একমূহূর্তের জন্যও রহিত হয় না। কেবলমাত্র মৃত্যু এবং উন্মাদনার সময়ই রহিত হয়। মানুষ যদি পঙ্গু হয় তখন বসে সালাত আদায় করবে। যদি অবশ রোগী হয় যে মাথা ছাড়া কিছু নড়াচড়া করতে পারে না তাহলে সে মাথায় ইশারা করে সালাত আদায় করবে। যদি মাথাও না নড়াচড়া করতে পারে তাহলে চোখে ইশারা করে মনে মনে সালাত আদায় করে নিবে। তবুও যতক্ষণ তার বিবেক থাকবে ততক্ষণ সালাত রহিত হবে না।

যদি কেউ বলে আমি ওজু করতে সক্ষম নই। তখন তার তায়াম্মুম করতে হবে। যদি কেউ বলে আমি তায়াম্মুমও করতে পারি না। আমরা তাকে বলবো, তুমি অজু ও তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত পড়। ওজুর নিয়ত কর। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সালাত বর্জন করতে পারবে না। কেননা, প্রিয় নবী সা. বলেন, কিয়ামতের দিবসে সালাতের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে। এটা সঠিক ভাবে আদায় করার পর অন্যান্য ইবাদত যথা- যাকাত, মসজিদ নির্মাণ, ইয়াতীমদের দায়িত্ব নেওয়া, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়াদি দেখা হবে।

তদ্রুপ সালাত যদি বাতিল হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য ইবাদতের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না।

অর্থাৎ মানুষ যদি পাহাড় পরিমাণ নেককর্ম নিয়ে আসে। কিন্ত সে তার ও রবের মাঝে যে রশি ছিল তা ছিঁড়ে ফেলেছে (অর্থাৎ সালাত আদায় করেনি) তাহলে তার এইসব আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ বলেন–

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى

আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসুলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা সালাত অলসতার সাথে ছাড়া আদায় করে না। *[সূরা তাওবা : ৫৪]*

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ اَوِ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

বান্দা ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত বর্জন করা। *[সহীহ মুসলিম : ২৫৭]*

অন্য হাদীসে তিনি বলেন–

اَلْعَهْدُ الَّذِىْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَلصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

আমাদের ও তাদের মাঝে ওয়াদাকৃত বস্তু হচ্ছে সালাত। সুতরাং যে সালাত তরক করবে সে কাফের হয়ে যাবে। *[সহীহ ইবনে মাজা : ৪৬২]*

সালাত আদায়ের পূর্বে অযু করা আবশ্যক। এই সালাতকে কেন্দ্র করে নানামুখী কর্মতৎপরতার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ভূমিকা রাখতে পারি। তন্মধ্যে মানুষকে ওজু শিক্ষা দেওয়া অন্যতম।

মসজিদে অনেককে দেখি, ভালভাবে অজু করতে পারে না। তাদের নাকে পানি, কুলি করা সঠিক ভাবে হয় না। তারা চেহারা ভালভাবে ধৌত করতে পারে না। তাই অজু শিক্ষাদানে আমরা কাজ করতে পারি। তাছাড়া অজু সালাতে যেসব ভুল করে থাকে তা শুধরিয়ে দিতে পারি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রধান বিশেষত্ব হলো, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সমগ্র জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র বানিয়ে দিয়েছেন।

ফলে বিমানে সালাত আদায় করা যায়। বরফের উপর সালাত আদায় করা যায়। মাঝ সমুদ্রে সালাত আদায় করা যায়। রেল স্টেশন বা রাস্তায় যেখানেই ওয়াক্ত হবে সালাত আদায় করা যাবে। হাদীসে এসেছে–

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا

প্রিয় ভাই-বোনেরা! উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সালাত প্রত্যেক ওয়াক্তে সর্বদা পালন করতে হবে। এটাকে বর্জন করার কোন সুযোগ নেই।

ওজুর নিয়মাবলী

কেউ যদি অজুর নিয়মাবলী ভাল করে রপ্ত করে তাহলে তার পক্ষে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে। অজুর ধারাবাহিক বর্ণনা-

প্রথমেই বিসমিল্লাহ বলবে তারপর দুই কব্জিসহ ধৌত করবে। তারপর নাকে পানি দিবে এবং কুলি করবে। এক চুল্লিতে পানি নিয়ে মুখে ও নাকে দিবে। মুখে কুলি করবে এবং নাক ঝাঁড়া দিবে। অর্থাৎ নাকে যে ময়লা থাকবে তা বের করে দিবে। আর এই পানি বাম হাতে বের করবে।

তারপর চেহারা ধৌত করবে। চেহারার সীমা হচ্ছে, কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত। প্রত্যেকেই এই অংশটুকু ধৌত করতে হবে। চেহারা ধৌত করার পর যদি মুখে দাড়ি থাকে তাহলে তা এক মুষ্টি পানি দ্বারা খিলাল করবে।

তারপর হাত ধৌত করবে। পানি দ্বারা কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে। অনেকে কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত ধৌত করে। কিন্তু আবশ্যক হচ্ছে সমগ্র হাত ধৌত করা। ডান হাত দিয়ে শুরু করবে এবং বাম হাতে শেষ করবে। তারপর মাথা মাসেহ করবে। মাথার সামনে থেকে মাসাহ শুরু করবে। তারপর আবার মাথার সামনের অংশে নিয়ে আসবে। তারপর দুই কান মাসেহ করবে। শাহাদাত অঙ্গুলীদ্বয় কানে প্রবেশ করিয়ে তার পিছনের অংশটুকু মাসেহ করবে। অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রবেশ করিয়ে মাসেহ করবে।
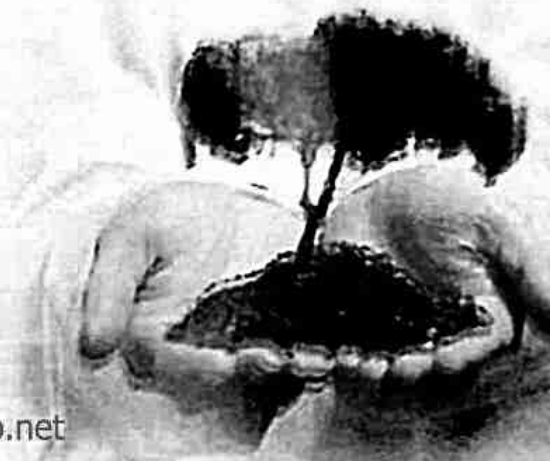
যে মহিলার লম্বা চুল আছে তার ঝুলন্ত চুলকে মাসেহ করা আবশ্যক নয়। সে শুধুমাত্র মাথার শুরু থেকে পিছনের অংশ মাসেহ করে আবার সামনে হাত নিয়ে আসবে। ঝুলন্ত চুল মাসেহ করা জরুরী নয়।

তারপর দু'পা ধৌত করবে। প্রিয় নবী সা. বলেন, এসব গোড়ালীর জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ। লক্ষ্য করুন প্রিয় নবী সা. কিভাবে ভালভাবে ধৌত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং পা পরিপূর্ণ ভাবে টাখনু পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। এবং পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করবে। বাম হাতে কনিষ্ঠ অঙ্গুল দ্বারা খিলাল করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! এই হচ্ছে অজুর সাধারণ বর্ণনা। এই প্রোগ্রামে সালাতের পদ্ধতির বর্ণনা আসবে। পাশাপাশি সালাতে যেসব ভুল-ত্রুটি হয় সেসবের আলোচনাও আসবে। এখানে আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের একটি বাণী উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, "সালাতে লোকজন যে পরিমাণ ভূমিকা রাখে ইসলামেও তাদের ভূমিকা সেরূপ হবে। সালাতে যে পরিমাণ আন্তরিকতা ইসলামেও সে পরিমাণ আন্তরিকতা থাকে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর সামনে এমন শূন্য হাতে উপস্থিত হয়ো না যে, তোমার হাতে ইসলামের কিছুই নেই। তোমার হৃদয়ে সালাতের গুরুত্ব যতটুকু থাকবে ততটুকু ইসলামের সম্মান থাকবে।"
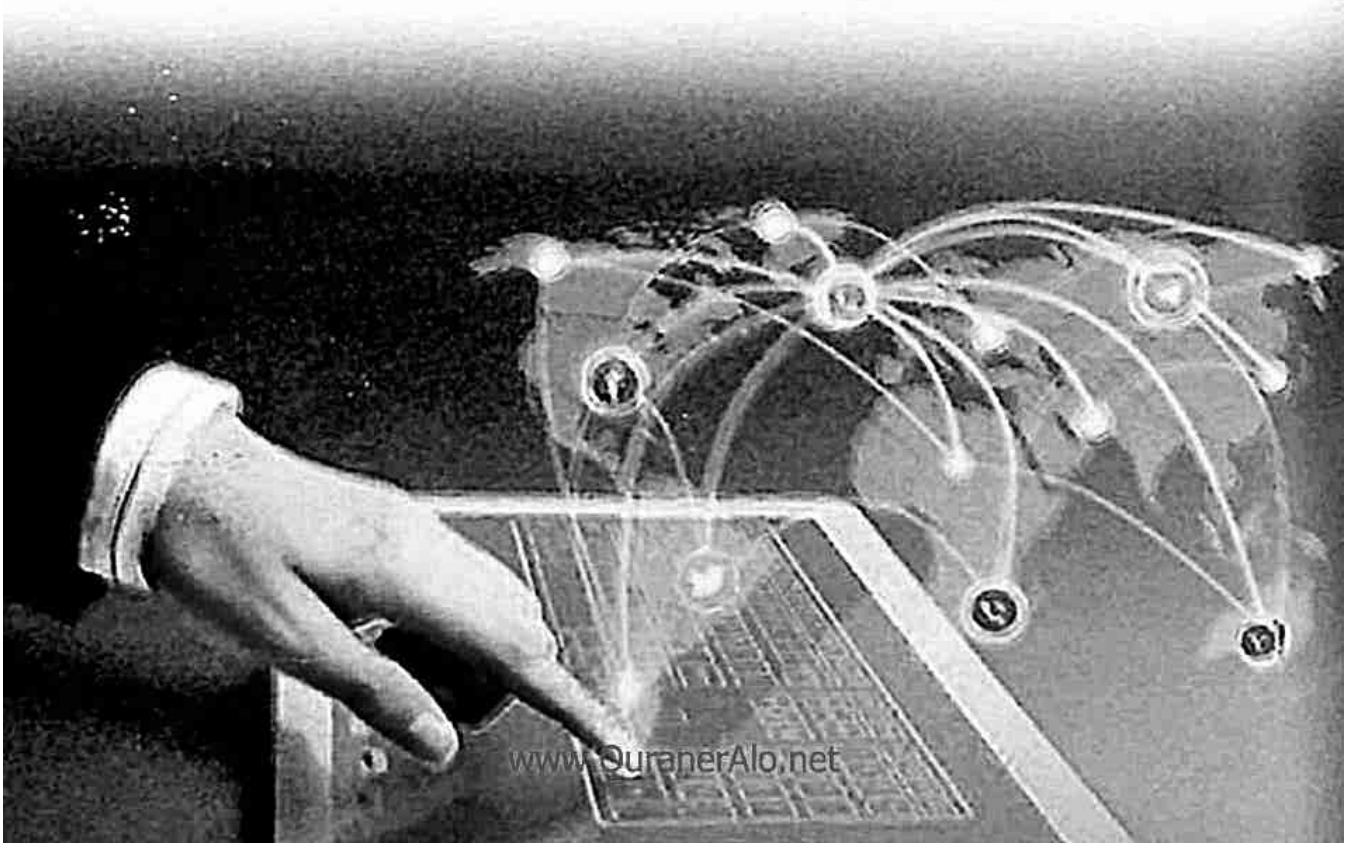
তার উক্তিটি কতই না চমৎকার! সুতরাং সালাত আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সংযোগ মাধ্যম। এই সংযোগের রহস্য কি? কেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত?

ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আকল তথা বিবেক ইলমের আহার্য গ্রহণ করে। মানুষের মেধা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়। তদ্রুপ কলব প্রেম-ভালবাসায় পরিতৃপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে রুহ আল্লাহর মুহাব্বতে পরিতৃপ্ত হয়। সালাত না পড়ে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। যখন সে সালাত পড়ে তখন তার রূহকে খাদ্য দেয়। এই বিষয়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গে প্রিয় নবী সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত পড়ে তখন সে যেন ভাল করে রুকু করে। সেজদায় যেন (কাকের ন্যায়) ঠুকর না দেয়। কেননা, এক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ন্যায় যে এক খেজুর দুই খেজুর খায়। এই সামান্য খেজুর কি তার ক্ষুধা দূর করবে? আমাদের রুহকে আত্মিক খাদ্য পরিবেশন করা অত্যন্ত জরুরী। এখন আমরা যদি যথাসময়ে রুহকে খাদ্য না দেই তাহলে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে। আপনারা একজন বেনামাজি ব্যক্তিকে লক্ষ্য করুন। তার হৃদয় হয় সংকীর্ণ। পাপাচার, অশ্লীল কাজে খুব অগ্রসর থাকে। কিন্তু ভাল কাজে তার যোগ্যতা কম। এর থেকেই বুঝতে পারি যে, আমাদের জীবনে সালাতের গুরত্ব কত বেশী।

সালাতের ভূমিকা নিয়ে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। মসজিদে বক্তৃতা দিয়ে বের হওয়ার প্রাক্কালে এক যুবকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়।
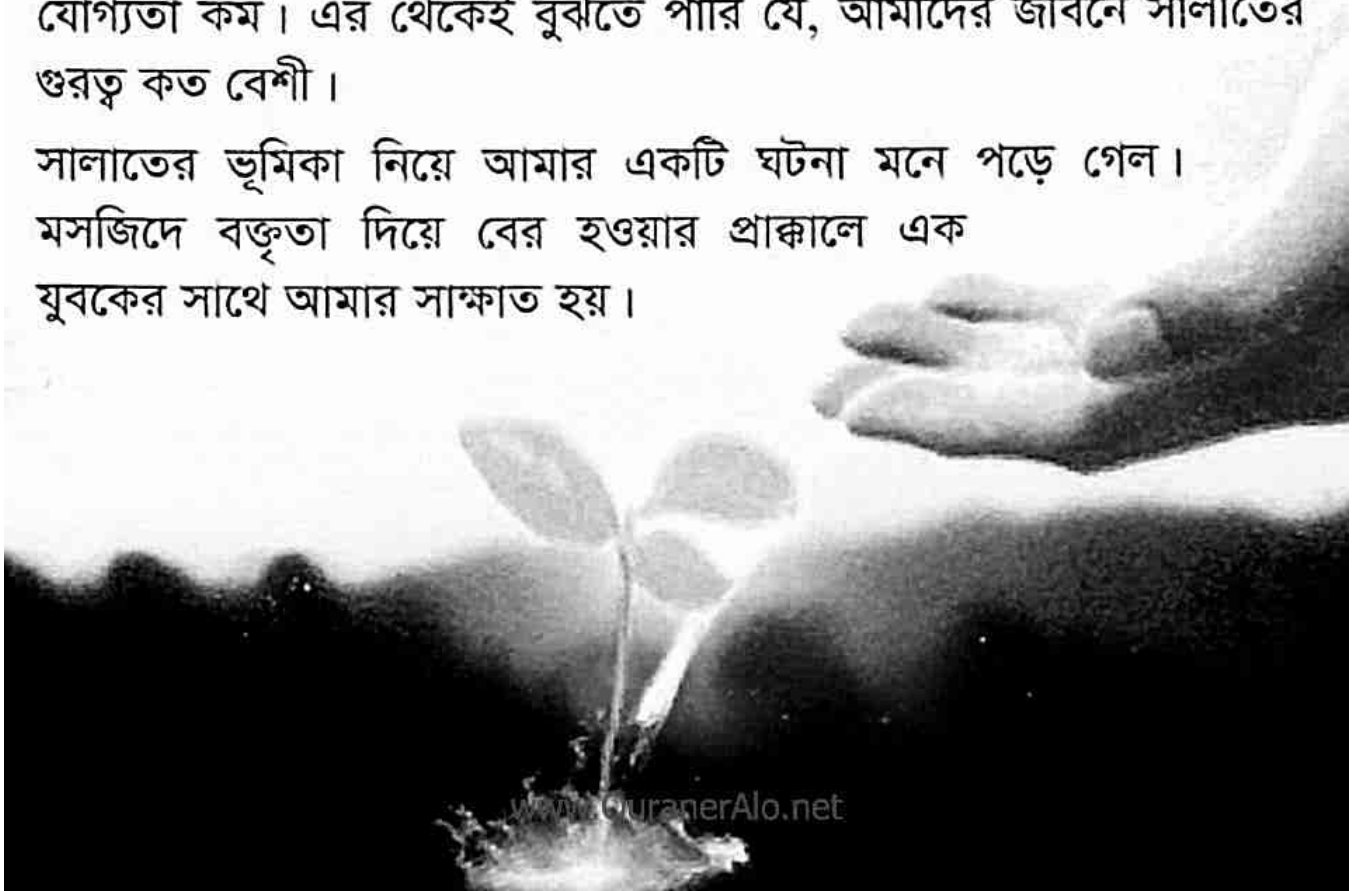
সে আমার কাছে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে ঝাঁড়ফুকের জন্য আবদার করল; যেন তার দিলের পেরেশানী দূর হয়ে যায়। আমি ঝাড়ফুঁক করি না। বরং অন্যদের কাছে যাওয়ার জন্য বলি। আমি কৌতুহল হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার কী সমস্যা?

সে বলল, শায়খ, আমি এত পেরেশানীতে আছি যে, সমগ্র রিয়াদবাসীর উপর যদি তা বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলেও তা কমবে না। অতঃপর সে কাঁদতে লাগল। তার বয়স আনুমানিক ২৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বড় ব্যবসায়ীর পুত্র। পিতার পরিচয় দিলে আমি তাকে চিনতে পারলাম। পিতা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। বাড়ি, গাড়ি, অর্থ-কড়ি সব কিছুই তাদের আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সুখী নয়। অতঃপর সে আমাকে জানাল যে, মেয়েদের সাথে তার সম্পর্ক আছে। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি সালাত আদায় কর? সে বলল, না। আমি বললাম, কেন সালাত পড় না? তোমার ও আল্লাহর মাঝে এমনকি শত্রুতা আছে যে, তুমি সালাত বর্জন করে দিলে?

আমি বললাম, তুমি কি একেবারেই সালাত পড় না? সে বলল, আমাদের বাসায় মেহমান এলে তারা যদি সালাতের জন্য দাঁড়ায় তাহলে আমি চাপে পড়ে সালাত আদায় করি। অনেক সময় অজু ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাই। কখনো বা যদি শেষ দুই রাকাআতে ইমামকে পাই; তখন নামায শেষ না করে ইমামের সাথেই সালাম ফিরিয়ে ফেলি।

আমি বললাম, কত দিন ধরে এই অবস্থা? সে বলল, নয় বছর ধরে। আমি বললাম, আল্লাহ পানাহ!! আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আছো আবার সুখী জীবন চাও? আল্লাহর শপথ, মদ্যপান, হারাম দৃষ্টি ও মেয়েলী সম্পর্ক রেখে কখনো শান্তি পাবে না।

তোমার আত্মা প্রশান্তি পাবে যদি নিয়মিত সালাত আদায় কর। তাই তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, এক সপ্তাহ প্রথম কাতারে মসজিদের সালাত আদায় করবে। তারপর আগামী মঙ্গলবার আমার নিকট আসবে।

প্রিয় উপস্থিতি! মঙ্গলবার আসলে দেখলাম সে আমার অবস্থান ফলো করছে। আমি তাকে সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিলাম। যখন বের হলাম, আমাকে দেখে বলল, শায়খ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি এমন প্রশান্তি ও স্বাচ্ছন্দে আছি যা বিগত নয় বছরও আস্বাদন করি নি।

তাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজে মগ্ন হওয়ার পর এই হচ্ছে সেই যুবকের অনুভূতি যা সে এখন অনুভব করছে। মানুষকে একমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই যখন সে ইবাদতে নিজের দেহ মন সঁপে দিবে তখন সে শান্তি পাবে। যেমন এই গ্লাস বানানো হয়েছে পানি পান করার জন্য। কাজেই তাকে আপনি লেখার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। কেননা, তাকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বানানো হয়েছে। তদ্রুপ আমরা এটি জুতা বা চশমা হিসাবে ব্যবহার করতে পারি না। এই গ্লাসকে যদি আগুনের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করেন তা ভেঙ্গে যাবে। তদ্রুপ জুতা হিসাবে ব্যবহার করলেও।

আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। তাই দেহ মনকে যদি অন্যত্র ব্যবহার করেন কখনো শান্তি পাবেন না।

মুসল্লি দু'ধরণের। কিছু লোক আছে নিজের জিম্মায় গুনাহ না হওয়ার জন্য পড়ে। আরেক শ্রেণীর লোক সালাত পড়ে যেহেতু এতে সে আত্মপ্রশান্তি লাভ করে। এদের সংখ্যা খুবই কম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন أَرِحْنَا يَا بِلَالُ [বেলাল! সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি দাও।]

তিনি সালাতে প্রশান্তি পেতেন। অপর হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلَاةِ

[সালাতের মধ্যে আমার চোখের শান্তি রাখা হয়েছে]

أَسْعَدُ وَأَفْرَحُ وَتَطْمَئِنُّ نَفْسِيْ عِنْدَمَا أُصَلِّ

[সালাত আদায়ের সময়ে আমি শান্তি ও আনন্দ পাই]

সুতরাং সালাত ব্যতিত কিভাবে এই প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব।

সালাত বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সরাসরি একটি সম্পর্ক। এর মাধ্যমেই বুঝা যায় সালাতের গুরুত্ব কত বেশী।

চিকিৎসাবিদদের মতে, সালাতে মানুষের দৈহিক কল্যাণও নিহিত আছে। শরীর চর্চা হয়। জীবনী শক্তি উজ্জীবিত হয়। মুনাজাতের মাধ্যমে প্রভুর সান্নিধ্য কাছাকাছি হয়।

اَلصَّلَاةُ وَاَثَرُهَا فِي الصِّحَّةِ [সালাত ও সুস্থতা] একটি কিতাবের নাম। হয়তো এটা ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। আমি অনেক পূর্বে এই বইটি ক্রয় করেছিলাম। সেই কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে কেন রুকু এই পদ্ধতিতে হয়েছে। কেন রুকুতে سُبْحَانَ اللهِ তিনবার বলতে হয়? কেন তিন সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়েছে? পাশাপাশি তাতে অন্তর্নিহিত আছে রক্ত সঞ্চালন, মস্তিষ্কের দক্ষতা, শিরা-উপশিরায় রক্ত সঞ্চালন বর্ধন। এছাড়াও আরো অনেক উপকার নিহিত আছে। সুবহানাল্লাহ। আমরা জানি যে, প্রিয় নবী সা. সুস্থতা ও অধিক আদায়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। প্রিয় নবী সা. বলেন, তোমরা কিয়ামুল লাইল কর। কেননা, রাতে দাঁড়ানো নেককারদের অভ্যাস এবং তোমাদের প্রভুর নৈকট্য অর্জন মাধ্যম।

হে ভাই! মনে করেন না যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

صَلُّوْا الْفَجْرَ

[তোমরা ফজরের সালাত আদায় করো]

আল্লাহ তায়ালা এর থেকে অনেক উর্ধ্বে। কাজেই আল্লাহ তায়ালা কোন না কোন হিকমতের কারণেই বিধানাবলী দিয়ে থাকেন। চাই আমাদের বোধগম্য হোক বা না হোক।

মাগরিবের সালাত ইশার নিকটবর্তী হওয়ার মধ্যে হেকমত নিহিত আছে। আসর সালাতের পর সালাত পড়া নিষিদ্ধ। কোন কাযা সালাত বা ঐ সালাতই পুনরায় পড়তে হলে তা পড়া ছাড়া অন্য কোন সালাত পড়তে পারবে না। এভাবে ফজর সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত সালাত পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এতে হিকমতে রব্বানী নিহিত। কিন্তু এই সময়েও সালাত না পড়ার মধ্যে মানুষের দেহ মনে কল্যাণ নিহিত আছে।

আপনি গবেষণা করলে দেখবেন যে, সমস্ত ইবাদতের মধ্যে সালাতের প্রভাব বেশী। এজন্য আল্লাহ তায়ালা কতক উম্মতের উপর করেছেন আর কতকের উম্মতের উপর করেননি-এমন নয়। বরং পূর্ববর্তী জাতির উপরও ফরয করেছেন। উদাহরণত যাকারিয়া আ. এর আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন–

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

অতঃপর যখন তিনি 'মেহরাবের' মধ্যে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করলেন।

[সূরা আলে ইমরান : ৩৯]

মারিয়ামের ব্যাপারে বলেন–

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

হে মারইয়াম! তোমার প্রভুর ইবাদত কর এবং সিজদা কর ও রুকুকারীগণের সাথে রুকু কর। *[সূরা আলে ইমরান : ৪৩]*

ঈসার ব্যাপারে বলেন–

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি, তত দিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। *[সূরা মারইয়াম : ৩১]*

শুয়াইবের ব্যাপারে বলেন–

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

তারা বললো, হে শুআইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ওইসব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষরা করে আসছে? *[সূরা হুদ : ৮৭]*

ইবরাহিমের ব্যাপারে বলেন–

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও; হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআ কবুল কর। *[সূরা ইবরাহিম : ৪০]*

মুসার ব্যাপারে বলেন–

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই; অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। *[সূরা তহা : ১৪]*

মুহাম্মদ সা. এর ব্যাপারে বলেন–

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে নিজে

অবিচলত থাকো। *[সূরা তাহা : ১৩২]*

সুতরাং সমস্ত নবী রাসূলকে সালাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, যে সালাত হেফাযত করল সে দীন হেফাযত করল। যে ধ্বংস করল সে সব কিছূই ধ্বংস করে দিল। কাউকে যদি সালাত ধ্বংস করতে দেখেন তাহলে তার থেকে হাত ঘুটিয়ে নিবেন। তার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী–

فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

ফলে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। *[সূরা আরাফ : ১৭৫]* প্রযোজ্য। যার উপর শয়তান পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে।

কিন্তু বর্তমান কালের মানুষ সালাতের ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। একটি ঘটনা বলছি। একবার মাধ্যমিক মাদরাসায় প্রায় একহাজার ছাত্রের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। সেখানে আমি সালাতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করি। অতঃপর আমি বলি, তোমাদের কে কে আজ ফজর সালাত মসজিদে পড়েছো সত্যি করে বল।

একহাজার ছাত্র। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ১২ জন হাত তুলল। এই বারজন জামাআতের সাথে সালাত পড়েছে। আমি মেনে নিলাম হয়ত দুশত ছাত্র বাসায় সালাত পড়েছে। তাহলেও তো আরো আটশত ছাত্র সালাত আদায়কারী ছিল না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমি যখন বক্তৃতা দিয়ে চলে আসলাম, তখন মাদরাসার দায়িত্বশীল অধ্যক্ষ আমার সাথে যোগাযোগ করে কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, শায়খ আপনি যখন বক্তৃতা দিয়ে বের হলেন, (বক্তৃতাটি মাদরাসার সালাত পড়ার হলে ছিল) আমরা সব ছাত্রকে নিজ নিজ ক্লাশে যেতে বললাম।

তখন এক ছাত্র নামাজে দাড়ালো। তার দেখা দেখি আরেকজন। আরেকজন। এভাবে প্রায় পনেরজন সালাত পড়ল।

আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা এখন সালাত পড়ছ কেন অথচ যোহরের আজান দেওয়া হয় নি? তারা বলল, আমরা ফজর সালাত পড়ছি। পূর্বে পড়িনি। এখন তওবা করছি।

তিনি বলেন, আরেক ছাত্র এসে বলল, আমাকে বাসায় যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? সে উত্তর দিল, কেননা, আমি ফজর সালাত পড়িনি। আমি বললাম, তাহলে এখানেই পড়ে নাও। সে বলল, আমি অপবিত্র।' তখন আমি তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।

এর কিছুক্ষণ পরই আরেকজন এসে বাসায় যেতে চাইল। আমি বললাম, কেন? সে বলল, গোসল করতে চাই।

এই অবস্থা দেখে আমরা বিদ্যালয়েই গোসলের সুব্যবস্থা করলাম। এরপর থেকে যখনই কোন ছাত্র এসে জানাবাতের ওজর পেশ করত আমরা তাকে বিদ্যালয়ের গোসলখানায় গোসল করে এখানেই সালাত পড়তে বলতাম।

মোটকথা, মানুষের মাঝে সালাত নিয়ে কথা বলতে হবে। আপনাদের হয়ত মনে আছে। আমরা যখন গাজা ট্রাজেডি নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন জনৈক ইয়াহুদির বক্তব্য উল্লেখ করেছিলাম। সে বলেছিল, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের ফজরের সালাতে কাতারের সংখ্যা জুম্মার সালাতের ন্যায় হবে।

অর্থাৎ যখন তোমাদের মসজিদ মুসল্লি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বিজয়ী হবে।

অনেক মানুষ সালাতের পদ্ধতি জানে না। তারা এমন ব্যক্তির সন্ধান করে যারা তাদেরকে সালাত শিক্ষা দিবে। দাওয়াহ সেন্টারের প্রধান শায়খ আহমদ হামদান বলেন, আমরা মক্কা থেকে সত্তর কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে যাই। সেখানে এক লোককে প্রশ্ন করি, কিভাবে আপনি সালাত পড়েন? সে উত্তর দিল, আমি জানি না। আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, কিভাবে সালাত পড়েন। সে বলল, শামের দিকে মুখে করে দাঁড়াই এবং আল্লাহু আকবার বলি।' এই ভাই প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদাসমুখী হয়ে সালাত পড়ে। সে এখনো জানে না যে কিবলা পরিবর্তন হয়েছে!

তারা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কা থেকে মাত্র সত্তর কিলোমিটার দূরে। কিন্তু সালাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। দাওয়াহ সেন্টারের লোকজন তাদের কাছে গিয়ে সালাতের তালিম দেয়। ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। আবার কিছু দান সাদাকাও করে।

ছোট-বড় সকলেই সালাত শিক্ষার প্রতি মুখাপেক্ষি। সেসব ভাইয়েরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে মানুষকে ওজু-সালাতের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। মানুষের সামনে অজু করেন যেন তারা অজু শিখতে পারে। এটা কোন দূষণীয় নয় যে, আপনি সালাতের পদ্ধতি শিখবেন অথবা অন্য কাউকে শিক্ষা দিবেন ।

তারা ওজুর সুন্নত, অজু ভঙ্গের কারণও শিক্ষা দেয়। কোন ব্যক্তির অজু ভেঙ্গে গেলে কিভাবে তা পুনরাবৃত্তি করবে- তাও শিক্ষা দেয়। আবার অজু সালাত সম্পর্কিত তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এভাবেই ইবাদতের পদ্ধতি ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
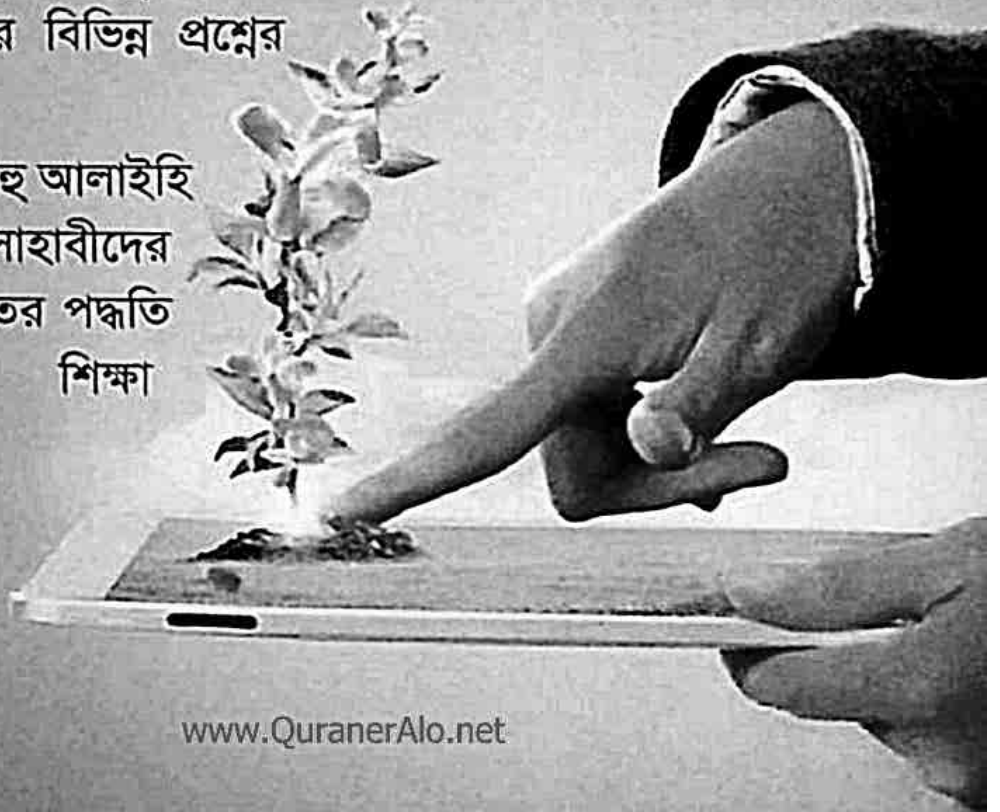
সিজদার সময় বিলম্ব করে সিজদা দিয়েছেন যেন সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারেন কিভাবে সিজদা দিবেন। সুতরাং এটা কোন দোষ নয়।

হযরত আবু হুরাইরা রা. তাবেয়ীদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলের সালাত দেখাবো। তিনি তাদেরকে সালাত-সিয়াম শিক্ষা দিলেন।

মালিক ইবনে হুয়াইরিস রা. মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন।

জনৈক শায়খকে দেখলাম, সাধারণ মানুষকে সালাতে বসার পদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন। একজনকে টেবিলে বসিয়ে কিভাবে বৈঠকে বসতে হবে তাও শিক্ষা দিচ্ছেন।

সুতরাং যদি কেউ সঠিক পদ্ধতি না জানে তাহলে তার সালাত সম্পূর্ণ বাতিল না হলেও যথার্থভাবে আদায় হয়েছে-বলা যাবে না। তাই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় সবাইকেই সঠিকভাবে এসব আদায় করতে হবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রদের সামনে গিয়ে বলবেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে যেমন সালাত পড়তে দেখেছ তোমরা সেভাবে সালাত পড়।' সুতরাং আসো আমরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা অনুযায়ী সালাত পড়ি।

আপনি যদি কাউকে এভাবে সালাত শিক্ষা দেন তাহলে নিঃসন্দেহে সওয়াব পাবেন।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, যে হুইল চেয়ারে বা বেডে শুয়ে থাকে সে মূলত প্রতিবন্ধী নয়, বরং প্রতিবন্ধী সেই; যে তার চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় ইবাদত বন্দেগীতে প্রতিবন্ধী।

হিম্মতের প্রতিবন্ধী। যাকে আমরা প্রশ্ন করি তুমি কি ফজর সালাত পড়েছ? তখন সে বলে না। এই ব্যক্তি হচ্ছে প্রকৃত প্রতিবন্ধী।

মানুষের হিম্মত প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বলছি। খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এক বেদুইনকে দেখলেন সে জনৈকা দাসীর প্রেমে পাগল হয়ে গেছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আশা কর যে, তুমি খলীফা হবে আর দাসী মারা যাবে।'

সে বলল, না। আমি তা চাই না।

খলীফা আশ্চর্য হয়ে, কেন?

সে বলল, যেহেতু দাসী মারা যাবে। আমি দাসীর মৃত্যুর বদৌলতে খলীফা হওয়া কামনা করি না।' চিন্তা করুন, তার সমস্ত চিন্তা চেতনা সেই দাসীর প্রেমে মজে গিয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন। মুসলমানদের সৃষ্টি করেছেন যেন তারা পৃথিবী আবাদ করে। তারা যেন নেতৃত্বদানকারী জাতি হয়। অপর কর্তৃক চালিত জাতি না হয়।

আমাদের যদি হিম্মত না থাকে তাহলে অস্তিত্ব থাকবে না। আর যতক্ষণ ফজর সালাত না পড়বো ততক্ষণ হিম্মত হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। *[সূরা হুদ : ৬১]*

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা উপনিবেশ নয়। সেটা আল্লাহর জমিনে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ছাড়া কিছুই নয়। বরং সেই উপনিবেশ যা মুসলমানকে কল্যাণ ও সফলতার দিকে পথ দেখাবে।

বোখারি শরীফে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একব্যক্তির অবস্থা বলা হলো যে ফজরের সময় ঘুমিয়ে ছিল ফলে ফজরের সঠিক সময়ে সালাত পড়তে পারে নি। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই ব্যক্তির কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।

হে ভাই, এতো লাঞ্ছিত হয়ো না যে, শয়তান এসে প্রস্রাব করে দিবে। আপনি আপনার হিম্মতকে এতটুকু দৃঢ় করতে পারেন না যে, সালাত পড়বেন। তাহলে কিভাবে বলবেন যে, আমি জিহাদ করতে চাই। আমি উম্মতের সাহায্য করতে চাই।

প্রথমে নিজের নফসের সাহায্য করুন। যে ব্যক্তি 'হাইয়্যা আলা সালা' এর খেয়ানত করবে সে হাইয়্যা আলাল জিহাদেরও খেয়ানত করবে। যে ব্যক্তি সালাতের জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত হতে পারেনি শয়তান তো তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবেই।

আমরা বর্তমানকালে উম্মতের শোচনীয় অবস্থা দেখছি। মূর্খতা অপদস্থতা সর্বত্র বিরাজমান।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। *[সূরা রাদ : ১১]*

ফজর সালাতে কখনো এক কাতার বা অর্ধ কাতার হয়। তাই আমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

আমি জনৈক আমেরিকান প্রকৌশলীর কাহিনী পড়েছি। তিনি আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে ইয়ামানে কাজ করতেন। সেখানে রাস্তা নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়ামানি শ্রমিকরা আমাকে খুব কষ্ট দিত। তাদের কাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে খুব বেগ পেতে হতো। তারা আমার কথা শোনত না। কাজে-কর্মে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে খুব কষ্ট করতে হতো। কিন্তু যখন সালাতের সময় হয়ে যেত তখন তারা এক কাতারে দাঁড়িয়ে যেত যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর। তাদের একজনও নড়াচড়া করতো না। একই সময়ে রুকু করতো একই সাথে সিজদা করতো।

আমি তাদের এই অবস্থা দেখে খুব আশ্চর্য হলাম। তোমরা একটু পূর্বে অন্য রকম ছিলে আর সালাতে এমন হয়ে গেলে। সালাতের পূর্বে টাকা পয়সা, পুরস্কার দিয়েও তোমাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারতাম না। আর এখন সালাতে এত সুন্দরভাবে দাঁড়াও!

এই দৃশ্য দেখে সে ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করতে লাগল। পরবর্তী এই ঘটনা তার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে যায়।

সুবহানাল্লাহ! চিন্তা করুন প্রকাশ্যে এই বিধান রাখার আল্লাহর হেকমত কত গভীরে!!

বুখারিতে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নি। আমাকে মাসপথের শত্রুভীতি দান করা হয়েছে। আমার জন্য গণীমত হালাল করা হয়েছে অথচ আমার পূর্বে কোন নবীর জন্য তা হালাল ছিল না। আমার জন্য সমগ্র জমিনকে মসজিদস্বরূপ করা হয়েছে। সুতরাং যেখানেই কেউ সালাতের মুখোমুখি হবে তার সামনে মসজিদ ও পবিত্রতা হাসিলের মাধ্যম আছে। পানি না পেলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।' *[সহীহ বুখারী]*

অর্থাৎ আপনি সালাত না পড়ে থাকতে পারবেন না। কোন ওজর পেশ করতে পারবেন না।

পূর্বকালে (সত্যপন্থী) ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা নির্দিষ্ট স্থানে সালাত পড়তো। কিন্তু এই উম্মতের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই সালাত পড়তে পারবে।

সমস্যা হচ্ছে, অনেক মুসলমান অমুসলিমদের সামনে সালাত পড়তে লজ্জা পায়। বিমানে সালাতের সময় হলে বলে, আমি কিভাবে তাদের সামনে সালাত পড়বো? সুবহানাল্লাহ! তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে, আর আপনি তাদের উপস্থিতিতে মহান প্রভুর সামনে মাথা নত করতে লজ্জা পাচ্ছেন!

আমি একবার সুইডেনে ছিলাম। আমি ইউনিভার্সিটিতে আকিদা ও সমকালীন ধর্ম বিভাগের প্রফেসর। তাই ধর্ম নিয়ে গবেষণা করি। সুইডেন সফরে একদিন এক ভাই বললেন, শায়খ! এখানে একটি জাদুঘর আছে যা খৃস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জিলসহ প্রাচীন পুস্তকাদি প্রদর্শন করে। আমি বললাম, আমি তা পরিদর্শন করবো। হতে পারে কিছু তথ্য আমার ছাত্রদের সামনে পেশ করতে পারবো।

কথামতো আমরা প্রত্যেকে জনপ্রতি দশ ডলার দিয়ে টিকেট নিলাম।

জাদুঘরে দশ মিনিট কাটানোর পর সাথের বন্ধু বললেন, আসুন চলে যাই।

আমি বললাম, কেন, আমরা তো এই মাত্র প্রবেশ করেছি। সে বলল, আমরা ইসলামিক সেন্টারে সালাত পড়ে আবার ফিরে আসবো।

আমি বললাম, ভাই, ইসলামিক সেন্টার অনেক দূরে। আমরা যদি বের হই তাহলে আবার প্রবেশ করতে টিকেট কাটতে হবে। বরং এখানেই বাগানে সালাত আদায় করবো।

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমরা সুইডিশদের সামনে সালাত পড়বো?

আমি বললাম, তাদের সামনে সালাত পড়লে সমস্যা কি? তারা মদ পান করছে। করুক।

আমি একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, পূর্ব-পশ্চিম কোন দিকে। সে আমাদেরকে সঠিক তথ্য দিলে সহচরকে বললাম, আসুন।

আমি এক পাশে দাড়িয়ে আযান দেওয়ার জন্য কানে হাত দিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কি করছেন? আমি বললাম, আজান দিবো।

তিনি বললেন, এখানে আজান দিবেন?

আমি বললাম, হ্যা, যাতে করে এই স্থান আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কথামতো নিম্নস্বরে আজান দিলাম। তারপর ইকামত দিয়ে সালাত আদায় করলাম। আল্লাহর শপথ, এজন্য আমাদের উপর আকাশের ছাদ ভেঙ্গে পড়ে নি, জমিন সংকুচিত হয়নি, নিরাপত্তাবাহিনী পাকড়াও করে নি।

আমি চাই প্রত্যেক এমন স্থানে সালাত পড়তে যেখানে লোকেরা বিস্ময় নিয়ে বলবে, কি করছে? যাতে করে তারা এই দীন সম্পর্কে জানতে পারে। পরবর্তীতে ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয়ত ইসলাম কবুলও করে নিবে।

তোমাকে ভিন্নধর্মাবলম্বীরা যখন দেখবে তুমি বিমানে, জাহাজে, বাজারে সালাত পড়ছো তখন তারা ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে জানতে উৎসুক হবে। তারা ভাববে, এই মুহূর্তেও সে কেন সালাতে এতো আগ্রহী? কি আছে সালাতে? (পরবর্তীতে ইসলামে প্রবেশ করার প্রাথমিক পথ তৈরি হবে)

এজন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

তোমরা সালাত ও ধৈর্য দিয়ে সাহায্য কামনা কর। *[সূরা বাকারা : ৪৫]*

এরপর বলেন–

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

নিশ্চয়ই তা গুরুভারতুল্য। তবে বিনীতদের ক্ষেত্রে ভিন্ন। যারা মনে করে তাদের প্রভুর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে এবং তারা তার কাছেই ফিরে যাবে। *[সূরা বাকারা : ৪৬]*

সুতরাং সালাতে ভূমিকা রাখুন। সাধারণ স্থানসমূহে প্রকাশ্যে সালাত আদায় করুন। আসুন মানুষকে সালাতে উদ্বুদ্ধ করি। মসজিদে যেতে বলি। সালাতের সময়ের পাবন্দী বানাই। বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের ব্যাপারে যেন মনোযোগী হয়। অদ্রূপ কিয়ামুল লাইলেও যেন আগ্রহী হয়।

এক কর্মকর্তার কাহিনী

তিনি বলেন, আমি একটি ইয়াহুদি কোম্পানিতে কাজ করতাম। আল্লাহ তায়ালা তওবা করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই কোম্পানিতেই সালাত পড়তাম। আমি বিশ্রামের সময় ধূমপান বা হোটেলে খাওয়ার জন্য যেতাম না। এমনস্থানে যেতাম যেখানে গেলে ইবাদত করা যায়।
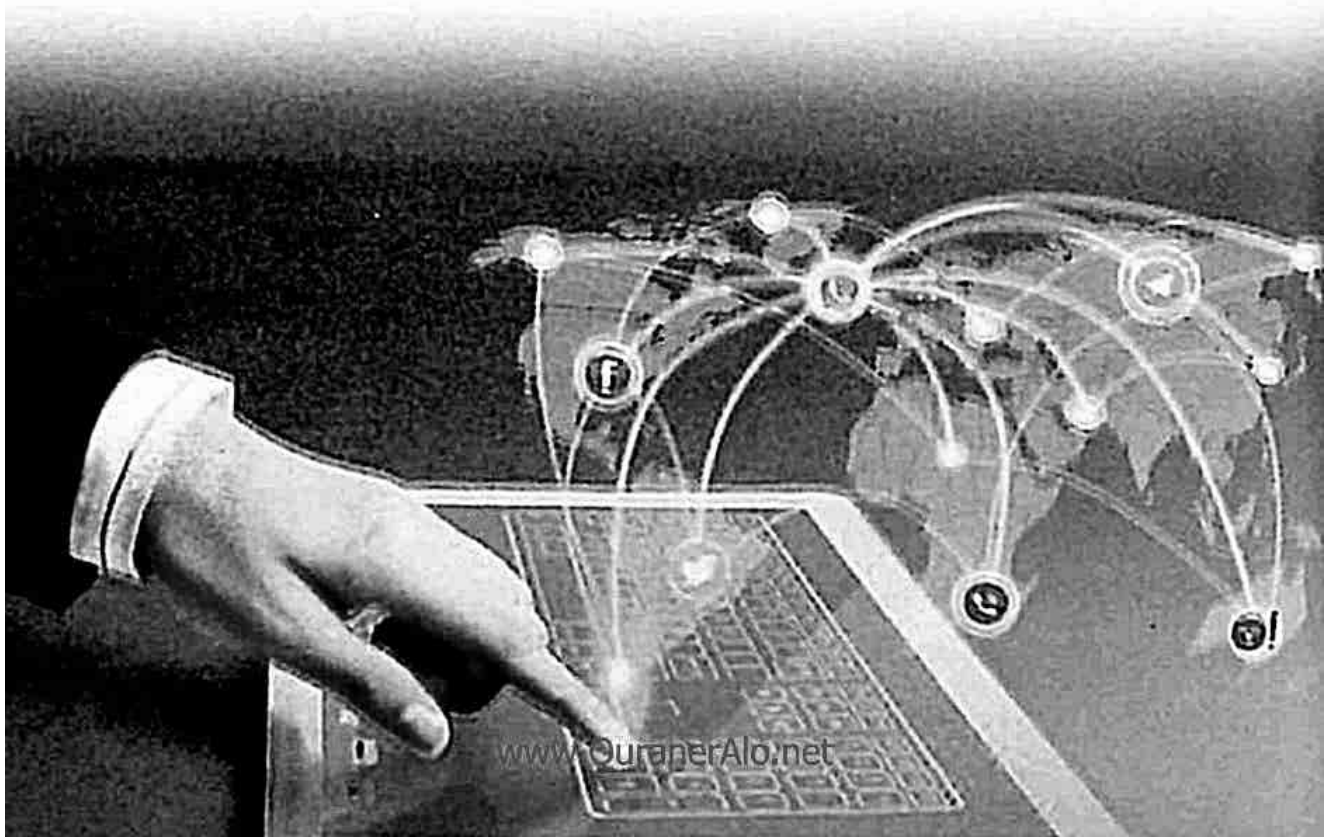
আমার চেহারায় সুন্নতের আলামত তথা দাড়ি প্রকাশ পেতে লাগল। কোম্পানির লোকেরা আমাকে তিরষ্কার করত। তারা আমার ধার্মিকতা পছন্দ করত না। তারা অহেতুক হয়রানি ও তির্যক ভাষায় কথা বলত যেন আমি চাকরি ছেড়ে দেই। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রহমতে আমি সালাত চালিয়ে যাই।

তারা আমার পিছনে বখাটে নামধারী মুসলিম ও ইয়াহুদিদের লেলিয়ে দিত। তারা এসে আমার সামনে অশীল কর্ম করত যেন আমার ইবাদতে বিঘ্নতা ঘটে। কিন্তু আল্লাহর দয়ায় আমি তাদের নসীহত করতে লাগলাম। আল্লাহ তাদের হেদায়ত ইচ্ছা করেছিলেন। ফলে অনেকেই সঠিকপথে ফিরে আসল। আমি তাদেরকে অজু-সালাত শিক্ষা দিলাম। পরবর্তীতে আমরা একসাথে সালাত আদায় করতাম।

যাদেরকে অজু-সালাত শিক্ষা দিয়েছিলাম তাদের অনেকে জাপানী নাগরিক ছিলেন। তারা মুসলমান কিন্তু অজু-সালাতের পদ্ধতি জানতেন না।

এভাবে আমরা সাধারণ স্থানগুলো যেমন পার্ক, কোম্পানি, অফিস ইত্যাদিতে সালাত কায়েম করে ভূমিকা রাখতে পারি। কেননা, অনেক মুসলমান আছে সালাত পড়ে না কিন্তু অন্যকে যখন এমন মুহূর্তেও পাবন্দী করতে দেখে তখন লজ্জিত হয়ে তওবা করে।

ফজরের সালাতের সময় কারো বাড়িতে উকি মারলে মনে হবে, বাড়ির সবাই মনে হয় বেড়াতে গেছে। কিন্তু সকাল ৭টায় গিয়ে দেখবেন, এই ঘর থেকে তিনজন যুবক বের হচ্ছে। ঐ ঘর থেকে চার/পাঁচজন বের হচ্ছে। কিন্তু এরা ফজরের সময় কোথায় ছিল?
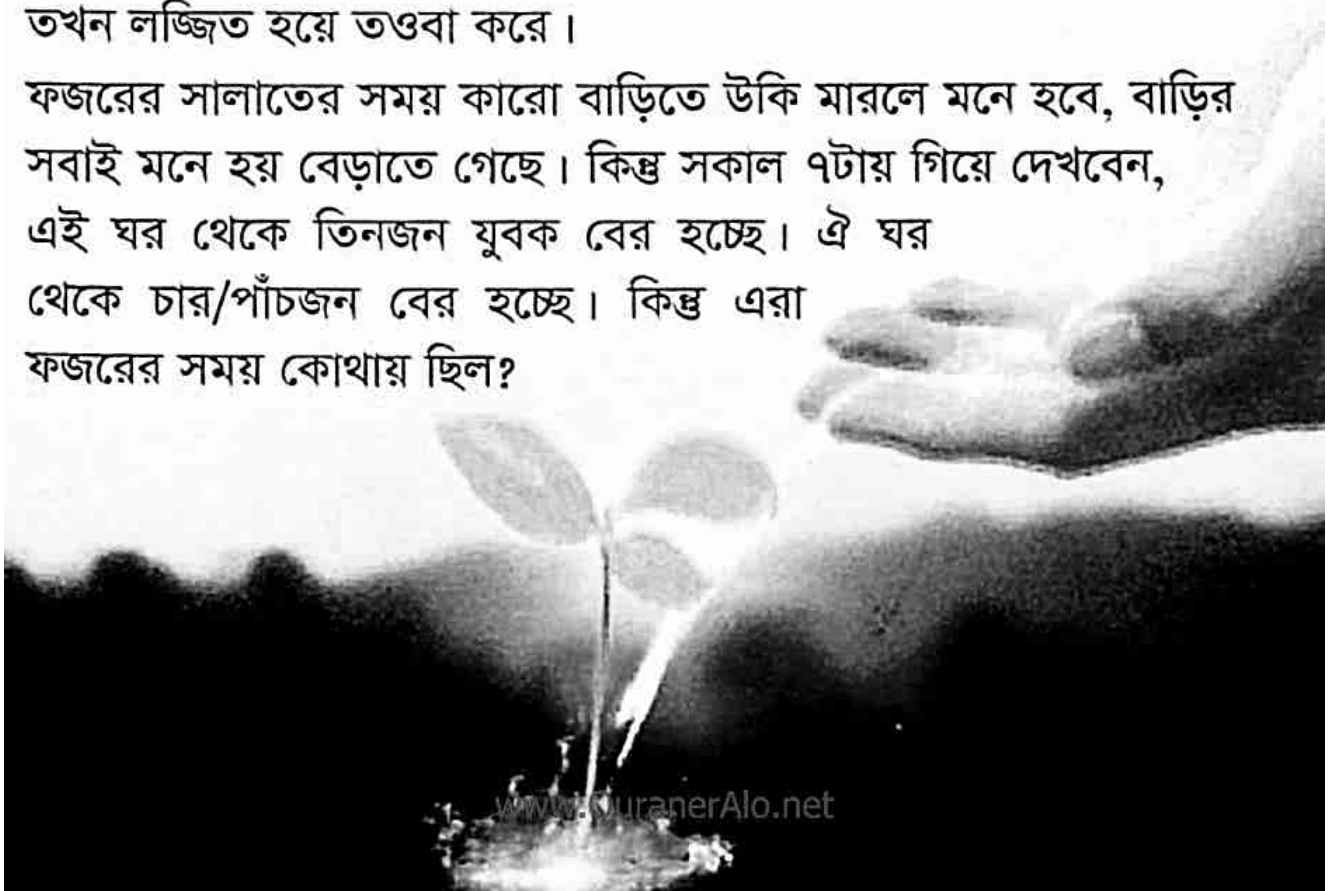
ফজরের সালাত ঈমানের মাপকাঠি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাআতে ইশার সালাত পড়বে সে যেন অর্ধরাত্রি দাঁড়াল আর যে ফজর সালাত পড়বে সে যেন পুরো রাত্রি কিয়াম করেছে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর সালাতের পর সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতেন, অমুক কি উপস্থিত? অমুক কি উপস্থিত? সাহাবারা বলতেন, না। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এই সালাত মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু তারা যদি জানত এতে কি ফযিলত আছে তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও আসত।

আমার আলোচনা শুধু ফজর সালাত নিয়ে নয়। বরং সমস্ত সালাতের বেলায়ই আমাদের আগ্রহ দেখাতে হবে।

মানুষকে সালাতে ভুলভ্রান্তি সম্পর্কেও অবগত করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। একব্যক্তি আসল এবং দুই রাকাত সালাত পড়ল। সালাত শেষে রাসূলের কাছে গিয়ে সালাম দিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ফিরে যাও। কেননা, তুমি সালাত পড়নি।

লোকটি দ্বিতীয়বার সালাত পড়ে আসলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, তুমি ফিরে যাও। কেননা, তুমি সালাত পড়নি। সে আবার পড়ে আসলে নবীজী একই কথা বললেন, তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি তো এর থেকে ভাল করতে পারি না। সুতরাং আমাকে শিক্ষা দিন। তখন নবীজী তাকে সালাতের শিক্ষা দেন।

[সহীহ বুখারি : ৭১৫]

সালাতের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ

অনেক লোক সালাতে দাঁড়াতে গেলে মুখে নিয়তের উচ্চারণ করে। উদারণত 'আমি জোহরের চার রাকাত সালাতের নিয়ত' বলে। অথচ মুখে উচ্চারণ করা বিদয়াত। নিয়তের স্থান হচ্ছে কলব। সুতরাং উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই।

* অনেক সময় একই মসজিদে দুই জামাত আদায় করা হয়। এটা জায়েয নেই।

* অনেকে মলমূত্র বেগ নিয়ে সালাতে দাঁড়ায়। এটা নিষিদ্ধ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলমূত্রের বেগ নিয়ে সালাতে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

* কাতার এক কোণা থেকে শুরু করা। সঠিক নিয়ম হচ্ছে, ইমামের পিছন থেকে কাতার শুরু হবে।

* দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসা। অনেকে মাসজিদে আসলে তার মুখ দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। সিগারেট, ঘাম, খাদ্যের অসহনীয় গন্ধ বের হয়। ফলে মানুষ কষ্ট পায়। তাই সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে আসতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন– তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের সজ্জা গ্রহণ কর। *[সূরা আরাফ : ৩১]*

* উচ্চস্বরে হাই তোলা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাইকে শয়তানের কর্ম বলেছেন। সুতরাং যতটুকু সম্ভব হাই আটকিয়ে রাখতে হবে।

* ইমামের অনুসরণ না করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমামের আগে রুকু সিজদা করে ফেলে। ইমাম সেজদা দিয়ে ফেললেও মুসল্লী দাড়িয়ে দুআ করতে থাকে। আবার সেজদায় এত দেড়ি করে যে ইমাম কিরাত শুরু করে দিয়েছে। অথচ ইমামকে অনুসরণীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

* সালাতে বেশী নড়াচড়া করা। অনেকে ঘড়ি দেখে, মোবাইল বের করে, অনেক সময় দেখে কে মিস কল দিয়েছে। অনেক সময় ম্যাসেজ আসলে পড়ে।

* উচ্চস্বরে দুআ করা। ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ কালে অনেকে আমরা আল্লাহর সাহায্য চাইলাম বলে দুআ করে।

* সালাতের সময় ভাল পোষাক পড়ে না আসা : মানুষ বিবাহ শাদী দাওয়াতের অনুষ্ঠানে গেলে সাজসজ্জা গ্রহণ করে যায়। কিন্তু সালাতে গেলে ময়লা কাপড় পড়ে যায়। অথচ সালাত অতি উত্তম কাজ।

* মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা।

* উচ্চস্বরে কাঁদা।

* সঠিকভাবে রুকু সেজদা না করা। রুকুর সময় মেরুদন্ড সমান হয় না। সেজদার সময় প্রথমে মাটিতে কপাল এরপর নাক এরপর দুই হাত রাখবে। সেজদাতে অনেকে পা উপরে তুলে রাখে, যা ভুল।

* মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা।

* মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া। সালাত শেষ হতে না হতেই মোবাইল খুলে কথা বলা শুরু করে দেয়। মসজিদে এসব থেকে বিরত থাকতে হবে।

উপরের যেসব ভুল-ক্রটির কথা বলা হল তা ভুলের সমুদ্র থেকে সামান্য বিন্দু মাত্র। তাই মানুষকে সঠিকভাবে সালাতের শিক্ষা দিতে হবে। ভুল-ক্রটির ব্যাপারে সচেতনা সৃষ্টি করতে হবে।
সালাতের তাগিদ দিতে গিয়ে অনেকে ভুল করেন।
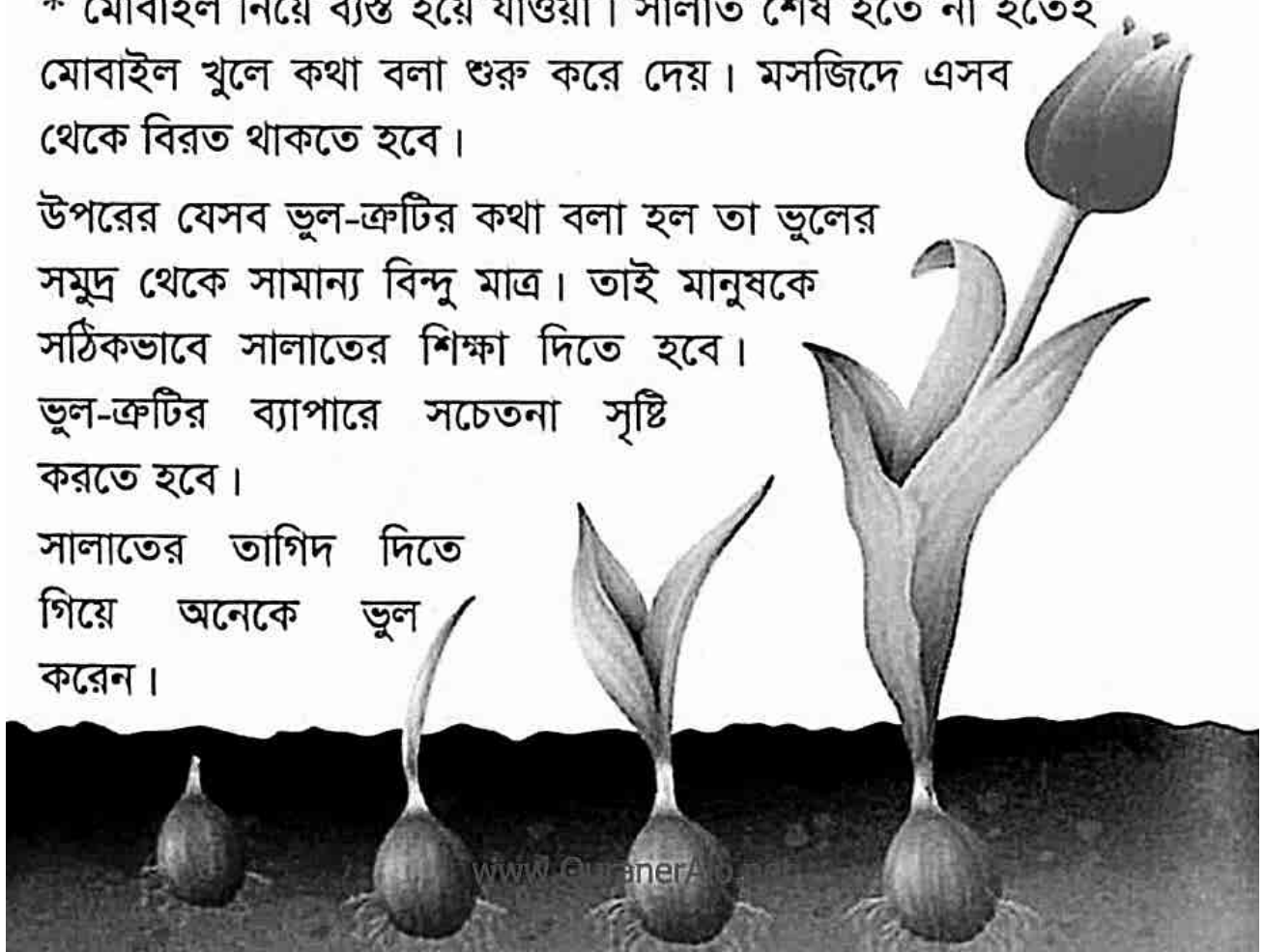
পিতা সন্তানকে এত প্রহার করেন যে, তার অঙ্গহানি হয়। এটা অনুচিত। নবীজী সালাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই আমাদেরকে সেভাবে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে সালাতের তারবিয়াত দিয়ে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারি। বিদ্যালয়ে এক ছোট শিশুকে শিক্ষক প্রহার করতে গেলে শিশুটি বলল, আমাকে প্রহার করতে পারবেন না। কেননা, আমি আজকে ফজর সালাত জামাতে পড়েছি। আমি আল্লাহর জিম্মায় হিফাজতে আছি। (লক্ষ্য করুন তার আত্মবিশ্বাস কত মজবুত)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন, যে ফজর সালাত জামাতে পড়বে সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে।

মানুষকে একথাও জানাতে হবে, সালাতের জন্য একজন বিশেষ শয়তান নিয়োজিত আছে। তার কাজই হচ্ছে আপনাকে সালাতে বিভ্রান্ত করা। তাই সালাতের শুরুতেই তার ওয়াসওয়াসা থেকে তিনবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন, মানুষ জন্মের পর যে কাজটি প্রথম করা হয় তাহচ্ছে তার কানে আজান দেওয়া হয়। আর যখন মানুষ মারা যায় তখন সর্বশেষ যে কাজটি করা হয় তাহচ্ছে সালাত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তার সমগ্র জীবনটা আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে মাত্র।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার

উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(৪)
মসজিদ
আবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন। আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে

আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন? জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم * فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القولم ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

এই উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহর অশেষ নেয়ামত যে, তিনি তার জন্য মসজিদ বানিয়েছেন। যেন তা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মিলনস্থল এবং মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হয়। সুবহানাল্লাহ! তারা দিনে পাঁচবার মসজিদে যায়। সেখানে সালাতে মাকতুবা আদায় করে। তারা মসজিদে আল্লাহর কাছে দয়া, ক্ষমা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে।

আমাদের মসজিদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া আবশ্যক। কেননা, এগুলো এই জমিনে আল্লাহর ঘর। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। তদ্রূপ ইমান ও তাকওয়ার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তি। কাজেই মসজিদ একদিকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাতিঘর অন্য দিকে তেমনি ইবাদত-বন্দেগীর মিহরাব।

মসজিদ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধিকরণ এবং সর্বোপরি যে কোন চাহিদা পূর্ণ করে আল্লাহর ঘরের তত্ত্বাবধান করা প্রত্যেক সেই মুসলিম সমাজের নৈতিক দায়িত্ব যারা পূর্বসূরীদের পথে চলতে চায়।

সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তিনি বলেন–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট (প্রতিষ্ঠা) করা হয়েছে, তা ঐ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত; ওটা বরকতময়। *[সূরা আলে ইমরান : ৯৬]*

এই মসজিদ ইবাদতের জন্য আমাদের পিতা ইবরাহীম আ. নির্মাণ করেন। মসজিদে ইবাদত করার পদ্ধতি আল্লাহই চালু করেন। আল্লাহ তায়ালাই মসজিদসমূহে ইবাদতের প্রথা প্রবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছে এবং তা ধ্বংস করতে প্রয়াস চালিয়েছে– তার অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? *[সূরা বাকারা : ১১৪]*

এই আয়াতে বলে দিয়েছেন কি জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

মসজিদের তত্ত্বাবধান, সংস্কার সবার হৃদয়েই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি ইউরোপ, ইন্দোনিশিয়া, মালেশিয়া, আইভরিকোস্ট, সাইবেরিয়া সর্বত্র একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন। ফান্সে মসজিদের সংখ্যা ১৫০০। মিশরে এক লক্ষ মসজিদ। সৌদি আরবে এক লক্ষ যাতে সাধারণ মসজিদ, জামে ও আওকাফ আছে। আলজেরিয়ায় পনের হাজারের বেশী মসজিদ আছে।
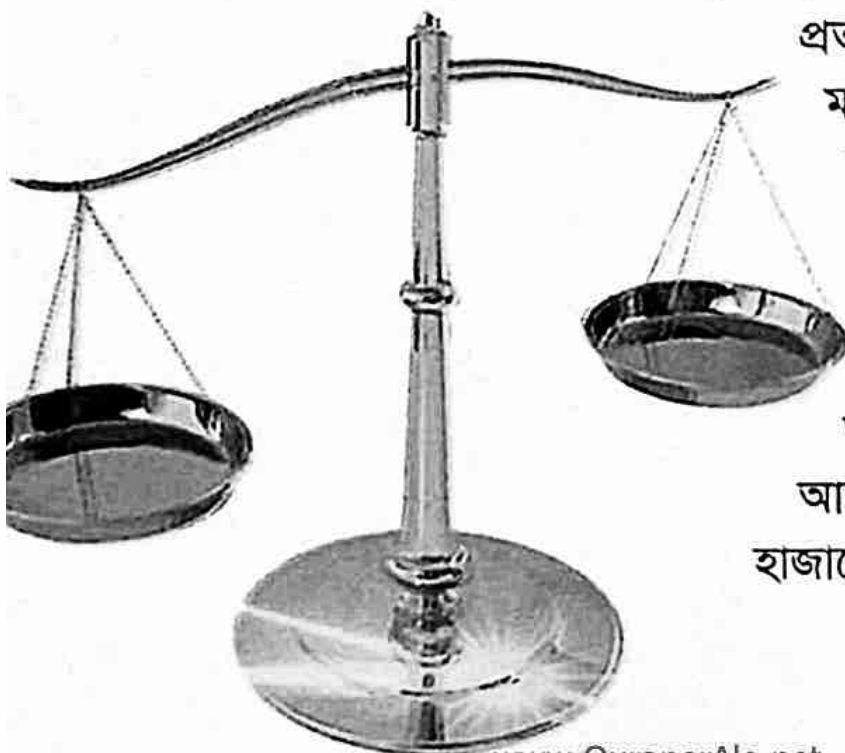
আশ্চর্য যে, এগুলো লোকজনে পরিপূর্ণ। বৃটেনের সানডে টাইমস ম্যাগাজিনে আমি পড়েছি, বৃটেনে বর্তমানে ৪৮৪০০ গির্জা আছে। এই সংখ্যা ২০৩০ সালে এক পঞ্চমাংশ কমে যাবে। জরিপ অনুযায়ী সংখ্যাটি ৩৯২০০ নেমে আসবে।

উল্লেখ্য যে, প্রতি সপ্তাহে দুটি গির্জা বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, তা ব্যবহার উপযোগী নয়। সেগুলোর সংস্কারের ব্যবস্থা নেই। কেউ সংস্কারের জন্য অনুদানও দেয় না। আমি জার্মানিতে ছিলাম। আমি সেখানে অবস্থানকালে বিশটি গির্জার জমি বিক্রি করা হয়েছে। কিছু মুসলিম ভাই সেখানে একটি গির্জা কিনলে তা মসজিদে রূপান্তরিত করি। আমি সেই মসজিদের নাম রাখি دَارُ السَّلَامِ [দারুস সালাম] এবং তাতে সালাত আদায় করি। এই গির্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

আমি এ প্রসঙ্গে বেশি কথা বলবো না। কিন্তু যখন এ ব্যাপারে গবেষণা করেছিলাম তখন আশা করেছিলাম যে, খ্রিস্টান জগত মনে হয় তাদের গির্জার তত্ত্বাবধানে খুব মনোযোগী থাকে। কিন্তু দেখলাম, তাও উদাসীনতার পাত্র। বরং তারা বলে, বর্তমানে বৃটেনে ২০০ মিলিয়ন স্টালিং (বৃটেনের মুদ্রা) প্রয়োজন এইসব গির্জার তত্ত্বাবধান করতে। অর্থাৎ তারা পাঁচ বছরে এক মিলিয়ার স্টার্লিং এর মুখাপেক্ষী হবে। এই বিশাল অংক সম্ভবপর নয়। প্রশাসন তাদেরকে মাত্র ২৫ মিলিয়ন গির্জার জন্য বরাদ্দ দিয়ে থাকে।
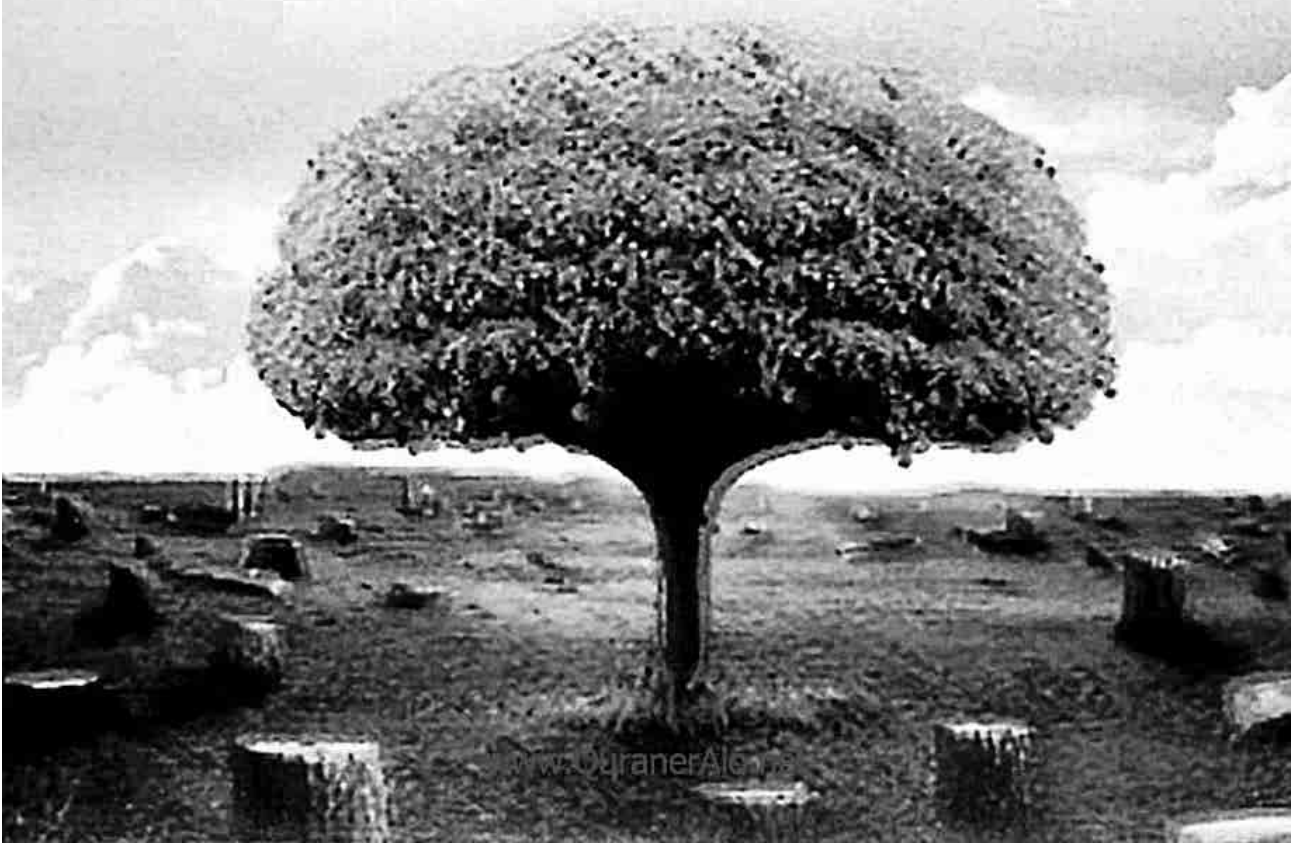
আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মসজিদগুলো আমাদের অবহেলা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও তাদের গির্জা থেকে অনেক ভাল অবস্থানে আছে। আল্লাহ তায়ালা এই অবহেলা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

আমি মসজিদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আপনি যদি কিছু মসজিদে প্রবেশ করেন অনেক সময় সিজদার সময় বিছানায় দুর্গন্ধ পাবেন। অনেক মসজিদে এয়ারকন্ডিশন নেই। থাকলেও নষ্ট হয়ে আছে। এক বছর নষ্ট হয়ে থাকলেও কেউ দেখার নেই। অথচ তার সংস্কার সামান্য টাকায় করা যায়। কিন্তু এসব সংস্কারের মানসিকতা আমাদের মাঝে থাকতে হবে। অনেক মসজিদে দেখবেন হাউজের ঘাটে তালা নেই। বলতে গেলে অনেক মসজিদেরই যত্ন নেওয়া হয় না। অনেক মসজিদে বৈদুত্যিক তার খোলা থাকে। বাচ্চারা মসজিদে নামায পড়তে আসলে অনেক সময় বিদ্যুতায়িত হয়। তদ্রূপ মসজিদে সঠিক কাতার বিন্যাসও দেখি না।

আমি মসজিদ সংক্রান্ত ও তার তত্ত্বাবধান নিয়ে কিছু পরিকল্পনার কথা বলবো যা আমার দ্বীনি ভাইয়েরা পালন করে সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের স্থান। রাসূল সা. এ ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, জনৈকা মহিলা মসজিদে এসে ঝাঁড়ু দিত। প্রিয় নবী সা. তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন। একদিন মহিলার খোঁজ নিয়ে দেখলেন সে আসেনি। তখন সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, কালো মহিলাটি কোথায়

যে মসজিদ ঝাঁড়ু দিত? সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে মারা গেছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন আমাকে সংবাদ দেওনি। তারা বললেন, সে রাতে মারা গেছে। তাই আমরা আপনাকে জাগ্রত করতে পছন্দ করিনি। (তাদের দৃষ্টিতে এই মহিলা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল না।)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে তার কবরের পাশে নিয়ে যাও। সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহিলার কবরের পাশে নিয়ে গেলে তিনি মাগফিরাতের দুআ করলেন। সাহাবায়ে কেরামও দোয়া করলেন।

সুতরাং আপনি এ ধরণের ক্ষুদ্র কাজ করেও প্রশংসার দাবীদার হতে পারেন। প্রিয় নবীর দোয়া পেতে পারেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে তিনি মসজিদের সম্মান বজায় রাখা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায় কত গুরুত্ব দিতেন।

একদা এক বেদুইন এসে মসজিদের কোণে প্রস্রাব শুরু করে দিল। সে মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম রাগান্বিত হয়ে তাকে বাধা দিতে গেলেন। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাধা দিলেন। (প্রিয় নবীর বাধা প্রদান মসজিদের পবিত্রতার প্রতি অমনোযোগিতা স্বরূপ ছিল না। বরং বাধা না দেওয়াতে আগন্তুকের শারীরিক কল্যাণ নিহিত ছিল।) লোকটির যেহেতু প্রস্রাব শুরু করে দিয়েছে এখন তাকে বাধা দিলে তার স্বাস্থ্যগত সমস্যা হবে। অধিকন্তু প্রস্রাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আশপাশ আরো নষ্ট হয়ে যাবে। লোকটি প্রস্রাব শেষ করলে তিনি ডেকে বললেন, 'দেখ, এসব মসজিদ প্রস্রাবের জন্য বানানো হয় নি। এটাকে বানানো হয়েছে ইবাদত-বন্দেগী, তাসবীহ-তাহলিল করার জন্য।" অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এক বালতি পানি ঢালতে বললেন।
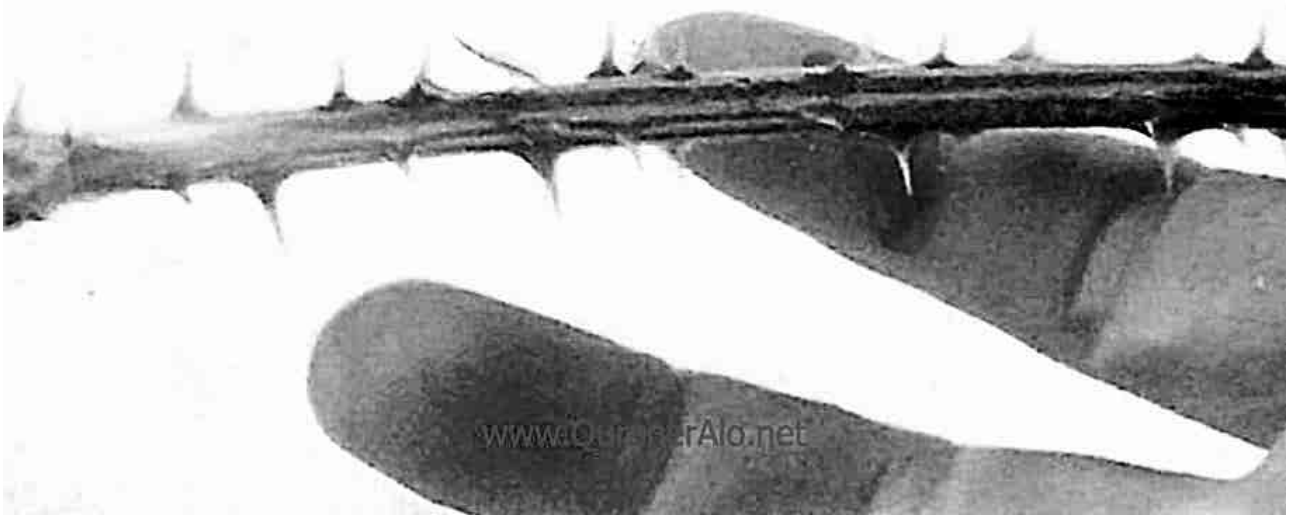
মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে হবে। এর সম্মান বজায় রাখতে হবে। অনেক মানুষ নামাযের অপেক্ষায় থাকলে হাত ফুটায়। অনেকে আবার মেসওয়াক কাটা শুরু করে। মসজিদে ময়লা আবর্জনা ফেলে।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ মহান! সে কি আল্লাহর ঘরে এসব করতে লজ্জা পায় না। কেউ যদি বিশ্বের মহারাজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সে কি এসব করতে সাহস দেখাবে?

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মসজিদে থুথু নিক্ষেপ গোনাহের কাজ। তার কাফফারা হচ্ছে, ময়লা অপসারণ করা।

একদা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে দেখেন থুথু পড়ে আছে। তিনি রাগান্বিত হলেন। খেজুর গাছের ডাল দ্বারা থুথু অপসারণ করলেন। তারপর বললেন, তোমরা সুগন্ধি নিয়ে আসো।' সুতরাং মসজিদের প্রতি আমরা যে পরিমাণ আন্তরিকতা দেখাব সে পরিমাণ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারবো।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই মসজিদ মুসলিম ও নওমুসলিমদের প্রথম কেন্দ্র। কেননা, কেউ নতুন মুসলিম হলে মসজিদে আসে। কোন নওমুসলিম প্রথমে এসেই যদি মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে (যা তার বৈশিষ্ট্য) তাহলে কতই না ভাল হতো।

জনৈক নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিম দেশে আসল ইলম অর্জনের আশায়। কোন এক মসজিদে জুতা ও ব্যাগ রেখে প্রবেশ করল। নামায পড়ে বের হলে দেখল তার ব্যাগ চুরি হয়ে গেছে। তখন সে বলল, আলহামদুলিল্লাহ আমি ইসলামকে চিনেছি মুসলিমদের চিনার পূর্বেই।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে মদীনায় পৌঁছে মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিজের জন্য গৃহ নির্মাণেরও পূর্বে মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রিয় নবী সা. নিজ হাতে কাজ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও মসজিদ নির্মাণে শরীক হয়েছেন।

কেননা, এই মসজিদ (ইসলামী রাষ্ট্রে মদিনার) কেন্দ্র। কোন কাফেরও যদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করতে চাইতো সেও মসজিদে প্রবেশ করতো। এজন্য প্রয়োজন হলে কাফেরের মসজিদে প্রবেশ বৈধ।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামা বিন আসালকে মসজিদে আটক করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি যদি মসজিদকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে আরশের নিচে ছায়া দিবেন। যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবে না।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা ডাক দিয়ে বলবেন, কোথায় আমার প্রতিবেশীরা? কোথায় আমার প্রতিবেশীরা! তখন ফেরেশতাগণ আশ্চর্য হয়ে বলবে, হে প্রভু! কে আপনার প্রতিবেশী হতে পারেন? তখন আল্লাহ বললেন, কোথায় কুরআন তিলাওয়াত কারীরা? কোথায় মসজিদ নির্মাণকারীরা?

সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু মসজিদে বসে নামাজ পড়ে সেই আ'মিরে মাসাজিদ তথা মসজিদ নির্মাণকারী নয়। বরং তারাই প্রকৃত মসজিদ নির্মাণকারী যারা মসজিদের সার্বিক দেখা শোনা করে, সংরক্ষণ করে। ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে, সংস্কার করে।

তিন যুবকের ত্যাগ

তিনজন যুবক মসজিদে তাদের বাসার বৈদ্যুতিক ঝাঁড়ু এনে ঝাঁড়ু দেয়। রুমাল এনে পবিত্র কুরআন পরিষ্কার করে। আতর গোলাপ এনে কার্পেট ও পরিবেশ সুরভিত করে। বিভিন্ন বড় বড় কাগজ মসজিদে লাগিয়ে দেয়। যাতে মুসাফিরের নামাজ পদ্ধতি, অজু তায়াম্মুমের পদ্ধতি লেখা থাকে। আবার অনেক সময় স্টিকার মসজিদের বাহিরে লাগিয়ে দেয়। কোন সময় কার্টুন এনে মসজিদের পুরানো কুরআন শরীফগুলো (যা পড়ার অযোগ্য) সংগ্রহ করে।

পরে এগুলো জ্বালিয়ে দেয় বা সংস্কার করে। হাউজ পরিস্কার করার বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে এসে হাউজ পরিষ্কার করে। পাত্রে ময়লা আবর্জনা তুলে নিয়ে যায়।

যুবকরা এইসব মহৎ কাজগুলো রাজধানী রিয়াদ, কাসিম ও মক্কার মধ্যবর্তী অঞ্চলের মসজিদগুলোতে করে থাকে। একটি মসজিদে এধরণের কাজ করতে দেড়শ রিয়াল খরচ হয়। তারা প্রায় সত্তরটি মসজিদে এমন কাজ করেছে।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাদের প্রতিদান দান করুন। তারা এর দ্বারা দুনিয়ার কোন প্রতিদান, সুনাম কুড়াতে চায় না। বরং একমাত্র আখেরাতের প্রতিদান প্রত্যাশী। দেখুন তাদের মহৎ কর্মতৎপরতার নমুনা।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, আমাদের দেশে যদিও মসজিদের তত্ত্বাবধানে বিশেষ মন্ত্রণালয় আছে। কিন্তু অনেক সময় মসজিদের আধিক্যের কারণে যথাসময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার করা সম্ভব হয় না। তাই আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করতে হবে।

মহিলারাও এই কাজে মসজিদ ব্যবস্থাপকের সাথে সমঝোতা করে কাজ করতে পারেন। তারা মসজিদ ঝাঁড়ু দিতে পারন। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি পথের ধারে একটি কাগজের টুকরা পেল। তাতে কুরআনের আয়াত লিখা ছিল।
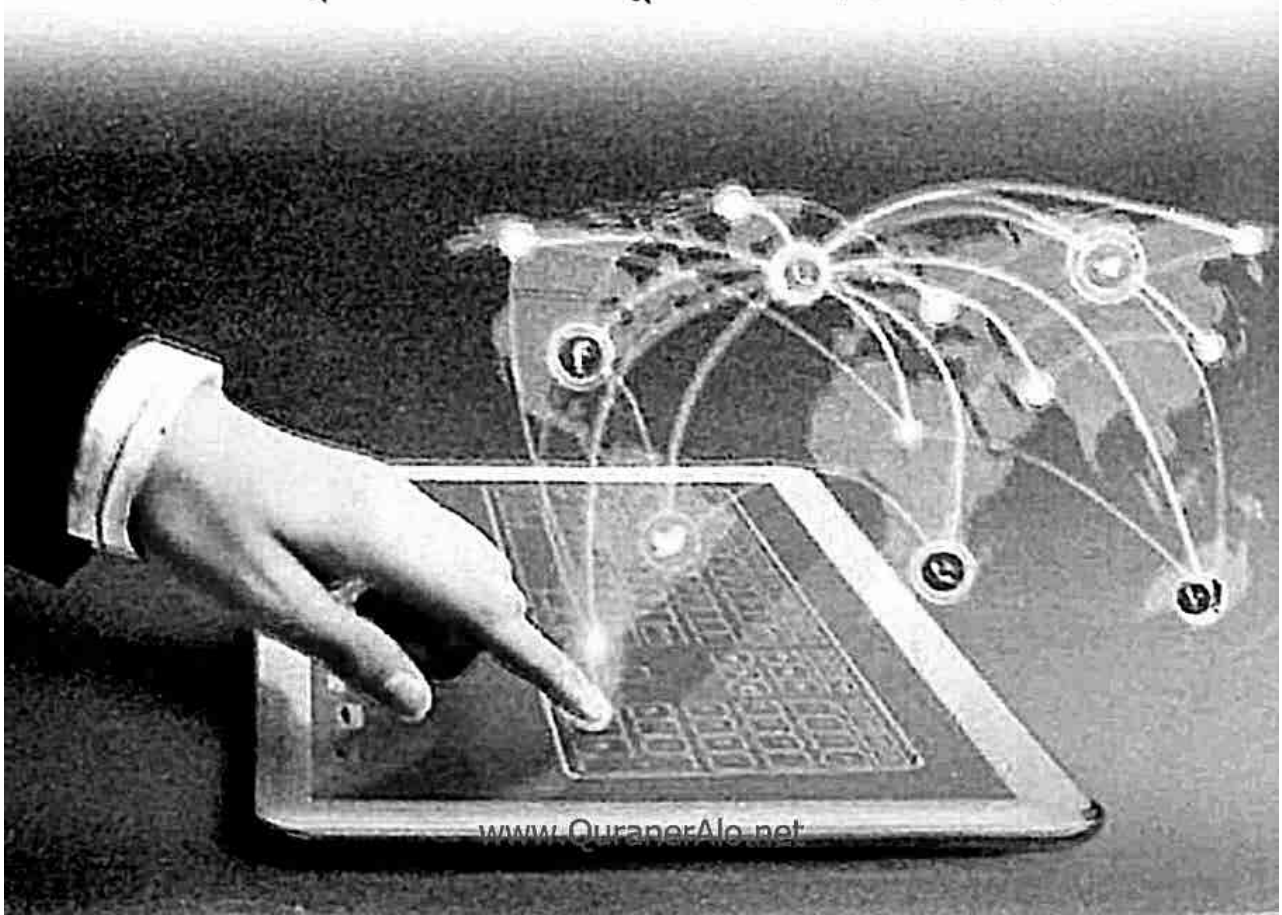
সে এটা তুলে নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করল, আতর গোলাপ মেখে যত্নকরে সংরক্ষণ করে রাখল। যখন সে মারা গেল আল্লাহ তায়ালা তার দেহ থেকে সুগন্ধি বের করলেন। লোকেরা বুঝতে পারল, এটা তার সেই নেক কাজের বদৌলতেই হয়েছে।

শায়খ আব্দুল্লাহ একটি কাহিনী বলেন, আমাদের মসজিদের পাশে একজন ধনী মহিলার বাসা ছিল। এই মহিলা খুব ধার্মিক ছিলেন। রমজান মাসের শেষ দশকে তিনি মসজিদের ইমামের সাথে যোগাযোগ করেন। মহিলা ইমাম সাহেবকে বললেন, আমি মসজিদের খাদিমার সাথে ঝাঁড়ু দিতে চাই। ইমাম তাকে অনুমতি দিলেন।

সেই দিন মহিলা মসজিদ ঝাঁড়ু দিলেন। আতর গোলাপ মেখে দিলেন। মহিলাদের নামাজের স্থান পরিষ্কার করে দিল। এদিকে ওই মাসেই মহিলা ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নিলেন যে, সে মসজিদ ঝাঁড়ু দিয়েছিল।

এখানে ঘটনাক্রমে শায়খ আব্দুল্লাহর কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি বলেন, ধরুন কোন ব্যক্তি আমার বাড়িতে এসে আমার ঘর পরিষ্কার করে দিল। সে আমার মেহমান হোক বা অন্য কেউ। আমি তাকে কী রূপ প্রতিদান দিব! (নিশ্চয়ই খুব খুশী হবো।) এখন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা যিনি অনেক মহান উদার, তিনি কত খুশী হবেন!

আমরা আমাদের পরবর্তীপ্রজন্মকে মসজিদের ভালোবাসায় গড়ে তুলবো। তারা যেভাবে নিজেদের শরীর, ঘড়দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে, তদ্রূপ মসজিদও যেন পরিষ্কার করে।

আল্লাহর ঘর এইসব মসজিদগুলো যেন তাদের নিকট শ্রদ্ধার স্থান হয়। আমরা একপ্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অতিক্রম করি। তাই শৈশব থেকেই শিশুদের মনে মসজিদের সম্মান, মর্যাদা গেঁথে দিব। যেন তারা বড় হয়েও মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি না করে।

শায়খ আব্দুল্লাহ বলেন, মনে করুন আপনার বাসায় কোন মেহমান আসল। সে যখন প্রস্থান করবে তখন তার থাকার ঘরটি পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। তাহলে নিশ্চয়ই আপনি খুশী হবেন। যে মেহমান যাওয়ার সময় কোন কিছুই লক্ষ্য করে নি তার তুলনায় তাকে বেশি পছন্দ করবেন। (ঠিক তদ্রূপ আমাদেরকেও আল্লাহর ঘরের ব্যাপারে এমন ধারণা রাখতে হবে।)

কিছু পুরষ্কারের ব্যবস্থা ভালো ফল দিতে পারে। আমি একবার এক মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য প্রবেশ করলাম। মসজিদের পাশে একটি টেবিলে শিশুদের জন্য অনেক খাবার সামগ্রী দেখলাম। আমি মনে করলাম, হয়তো কোন হিফজুল কুরআন অনুষ্ঠান হবে। ইমাম বাচ্চাদের নামধরে ডাকলেন এবং হাদিয়া দিলেন।

মূলত এই পুরষ্কার ছিল ফজর নামাজে পাবন্দী হওয়ার কারণে। (যে সব শিশু ফজর নামাজ জামাতে পড়েছে তাদেরকে পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে।) তখন এক শিশুকে দেখলাম সে তার পিতাকে এই বলে প্রহার ও কান্নাকাটি করছে, 'কেন তুমি আমাকে নামাজের জন্য জাগ্রত করো নি।'

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক।

(৫)
সম্পর্ক রক্ষা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি।

চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই।

এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন? জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم • وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل • فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى • يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم • فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو • محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا • يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভীর জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

জাহিলী যুগে আরবরা কাজ-কর্ম সামাজিকভাবে যৌথভাবে সম্পাদন করতো। তারা ভাষা, কৃষ্টি-কালচার, অনুকরণ, আকার-আকৃতি, খাবার-দাবার সর্ব কিছুতেই সামাজিকবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরব ভূখণ্ডের এমন কোন স্থান নেই যেখানে মারামারি, হত্যা, লুণ্ঠন, রক্তপাত, জীবন্ত কন্যা প্রোথন ইত্যাদি অপকর্ম ছিল না। ইসলাম আগমন পর্যন্ত তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা হয়নি। এমর্মে আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে সম্বোধন করে বলছেন–

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

আর তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন। *[সূরা আনফাল : ৬৩]*

এরপর বলেন–

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
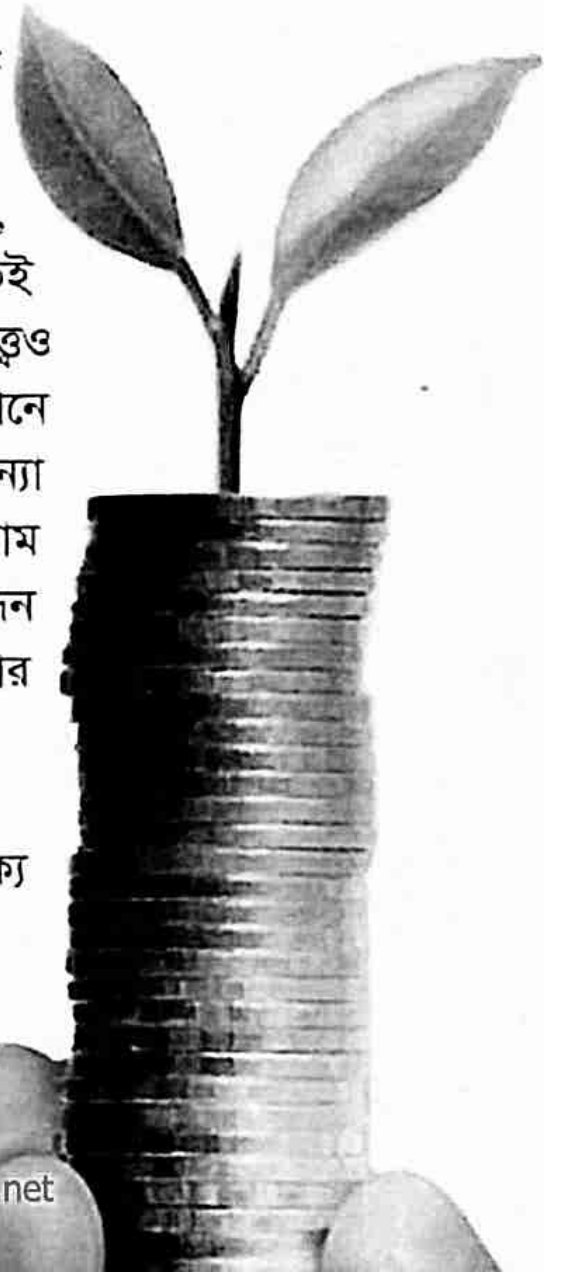
তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতে না। *[সূরা আনফাল : ৬৩]*

মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে ইতিপূর্বে যাদের সাথে শত্রুতা ছিল বা প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল তাদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র এ প্রসঙ্গে বলেন-

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

তোমরা তোমাদের প্রতি রবের অনুগ্রহ স্মরণ করো। *[সূরা বাকারা : ২৩১]*

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে মিলিয়ে দিলেন। ফলে তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।

[সূরা আলে ইমরান : ১০৩]

লক্ষ্য করুন, ইসলাম যখন তাদেরকে একত্র করলো তখন আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে তারা ভাই ভাই হয়ে গেল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সাহাবীদের ঐক্য-সম্প্রীতি কামনা করতেন। আজকে আমরা পারস্পরিক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা করবো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'জন শিক্ষক, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পিতা-ছেলে, ভাই-বোন, প্রতিবেশীসহ প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

অর্থাৎ এমন ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব যা শত্রুতাকে আন্তরিকতায়, হিংসা-বিদ্বেষকে ভালবাসায়, যুদ্ধ-বিগ্রহকে শান্তি-নিরপত্তা পরিবর্তন করে দিয়েছে। সেটা তো এমন ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন যা মুসলিম বিশ্বকে এক দেহের ন্যায় বানিয়ে দিয়েছে। এক অঙ্গ ব্যথা পেলে সমগ্র অঙ্গ তার ডাকে সাড়া দেয়। সেটা এমন ভ্রাতৃত্ব যা ঐক্যের ডাক দিয়েছে। বিচ্ছেদ-বিভেদ থেকে দূরে রেখেছে।

আমি বিশ্বাস করি, মুসলমানদের পারস্পরিক বিদ্বেষ, সংঘাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ব্যথিত। দু'জন মুসলিম, স্বামী-স্ত্রী, দু'দল ইত্যাদির মাঝে বিদ্যমান সংঘাতে কোন মুসলিম আনন্দিত হতে পারে না।

আমাদের ফিলিস্তিন, সোমালিয়া বা আফগানিস্তানে বিদ্যমান সংঘাতেও কেউ আনন্দিত হতে পারে না। তদ্রূপ জামাআতুল ইখওয়ান ও জামাআতুস সালাফিদের মাঝে সংঘাতেও কেউ আনন্দিত নয়।

খৃস্টানজগত তাদের পারস্পরিক বিরোধী মতবাদ মিটিয়ে সবাই এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। তারা মতভেদ ভুলে গেছে। অথচ তারা ক্যাথলিক, প্রোস্ট্রেট খ্রিস্টানে বিভক্ত। তাদের মাঝে পুরনো শত্রুতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আটাশটি দেশ এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যা 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' নামে পরিচিত। একটি ভিসা দিয়েই এইসব দেশে যাওয়া যায়।

আমি একবার জার্মানিতে ছিলাম। জার্মানিতে থেকে গাড়ি চরে রওয়ানা হলাম। হঠাৎ এক ভাই বললেন, এখন আমরা হল্যান্ডে এসে পৌঁছেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন সাইনবোর্ড বা সংকেত নেই কেন? তিনি উত্তর দিলেন, সমস্ত সাইনবোর্ড, সংকেত তুলে ফেলা হয়েছে। আর এইসব রাষ্ট্র একটি বড় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

সুবহানাল্লাহ! ইসলামের সোনালীযুগে সাহাবায়ে কেরামের খেলাফত, উসমানি খেলাফতে সমগ্র মুসলিম জাহান এধরণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। আমরা তো আজ একটি পরিবার, বিদ্যালয়, কোম্পানি, কারখানাতেই একতা প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। সমগ্র আরববাসীকে করবো তো দূরের কথা!

এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে আমরা পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে সমাজে ভূমিকা পালন করতে পারি।

সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম অনেক উৎসাহ দিয়েছে। আমাদের ধর্মে এমন অনেক রীতি-নীতি আছে যা সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে। যেমন, সালাম প্রচার, রোগীর সেবা, হাদিয়া প্রদান ও মুচকি হাসা ইত্যাদি। আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন এগুলো সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এমন অনেক কাজ থেকে দূর থাকতে বলেছেন যা সম্প্রীতি নষ্ট করে। ফাসাদ, ঝগড়া সৃষ্টি করে বলেই তা হারাম করা হয়েছে। যেমন গীবত, পরচর্চা, মিথ্যা, মানুষকে অবজ্ঞা, চুরি, হত্যা ইত্যাদি। এগুলো সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তায়ালা মুখের হিফাজত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

সে যা কথাই বলে না কেন তার সামনে একজন ফেরেশতা উপস্থিত আছে (যিনি সব কিছু লিখে রাখেন) *[সূরা ক্বফ : ১৮]*

কেউ যদি অশ্লীল ভাষায় কথা বলে তাহলে তা সম্প্রীতি নষ্ট করে। তাই আল্লাহ তায়ালা সেই পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন।

পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অনেক ফযিলত নিহিত আছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্প্রীতিপ্রতিষ্ঠাকে সাদাকা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রিয় নবী সা বলেন, মানুষের প্রত্যেক অঙ্গের উপর সাদাকা দিতে হয়। প্রত্যেক দিন যে দিবসে সূর্য উদিত হয় দুজনের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সাদাকাতুল্য। *[বুখারী ও মুসলিম]*

তিনি আরও বলেন, সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ক্ষমার পথ। তিনি বলেন, সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয়। তখন যে বান্দা আল্লাহর সাথে শিরক করে না

তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু দুই মুসলিম ভাইয়ের মাঝে যদি বিদ্বেষ থাকে তাহলে তাদের আমল উঠানো হয় না। বরং বলা হয়, দেখ তারা সংশোধন হয় কি না? *[মুসলিম]*

অর্থাৎ যে মুসলিম তার ভাইয়ের সাথে সম্প্রীতি রক্ষা করে না তার আমল উঠানো হয় না। অনেক মানুষের আমল বিশ বছরেও উঠানো হয় না যেহেতু সে তার ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষে লিপ্ত।

প্রতিদানের দিক থেকে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা গোলাম আজাদের ন্যায়। আনাস রা. বলেন, যে ব্যক্তি দুইজনের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক কথার বদৌলতে একটি গোলাম আজাদের সওয়াব দিবেন।

সম্পর্ক রক্ষা আল্লাহর সাথে ব্যবসাতুল্য। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আউয়্যুব রা. কে বলেন, আমি তোমাকে (উত্তম) ব্যবসার নির্দেশনা দিব না? তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন নবীজী বলেন, তুমি মানুষের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়। তারা দূরবর্তী হয়ে গেলে তুমি নিকটবর্তী কর।' তাহলেই ব্যবসার লাভ পাবে।

পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা একটি উত্তম ইবাদত। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদেরকে নামাজ রোজা সাদাকা থেকেও মর্যাদায় অধিক কোন আমলের কথা বলবো না? সাহাবায়ে কেরাম বলেন, অবশ্যই ইয়া রাসুলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, মানুষের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, সম্প্রীতি নষ্ট হালিকা (কেটে ফেলে) আমি বলছি না তা চুল কেটে ফেলে বরং তা দীন কেটে ফেলে।

পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির কারণ।
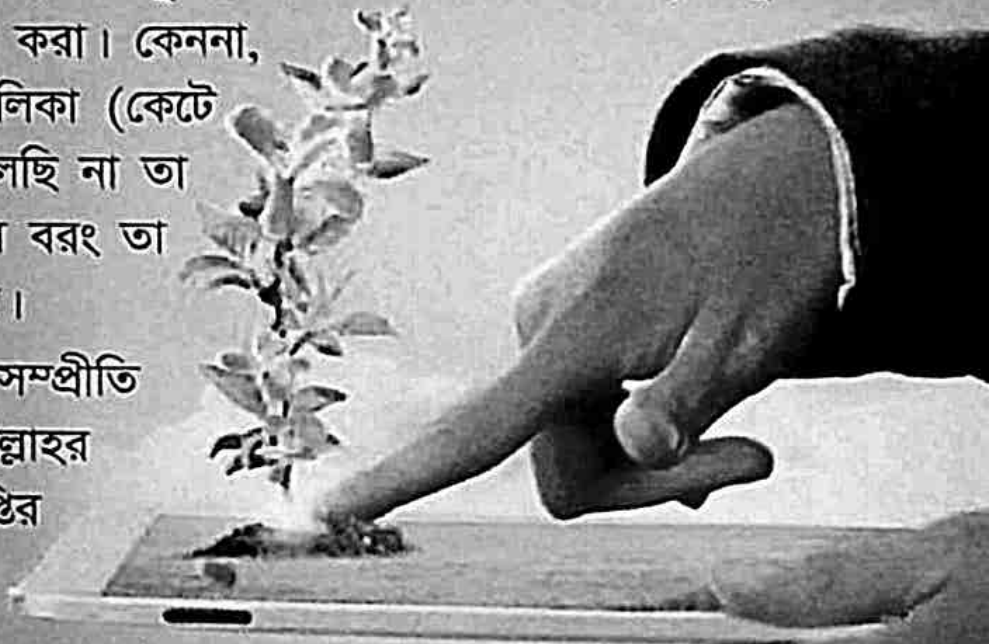
তিনি বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।

[সূরা হুজরাত : ১০]

তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করবে তার অনেক কল্যাণ মর্যাদা নেকী অর্জিত হবে। তিনি বলেন–

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

তাদের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না, হাঁ, তবে যে ব্যক্তি এরূপ যে দান অথবা কোন সৎ কাজ কিংবা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করে দেবার উৎসাহ প্রদান করে এবং যে আল্লাহর প্রসন্নতা সন্ধানের জন্যে এরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করবো।

[সূরা নিসা : ১১৪]

পারস্পরিক সম্প্রীতি না থাকা পরাজয় ব্যর্থতার কারণ। তিনি বলেন–

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মনের দৃঢ়তা ও শক্তি বিলুপ্ত হবে, আর তোমরা ধৈর্যসহকারে সব কাজ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

[সূরা আনফাল : ৪৬]

ইসলাহ গোনাহ মাফের কারণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
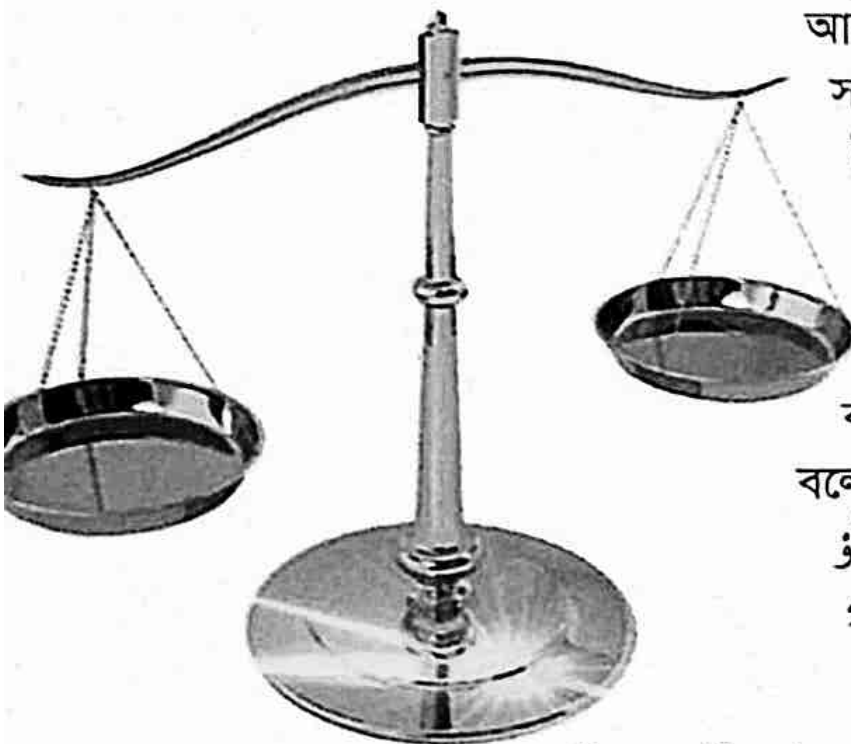
ইসলাহ উম্মতের শক্তি ও শত্রুদের ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যম। কেননা, কোন জাতি যদি পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে শত্রুরা খেয়ে ফেলবে।

ইসলাহে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা যায়। ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, মানুষের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য গমনকারী পায়ের কদম থেকে আর কোন কদম আল্লাহ নিকট অতি প্রিয় নয়। যে ব্যক্তি দু'জনের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করবে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দিবেন।

এসব আয়াত প্রমাণ করে যে, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি যে কথা, চিঠিপত্র প্রদান বা প্রদক্ষেপ গ্রহণ করুন না কেন তার জন্য বিনিময়ে উল্লেখিত সওয়াব পাবেন।

এখন কথা হচ্ছে আমরা কিভাবে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করবো? এক্ষেত্রে শরয়ী পদ্ধতি কি? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতেন? এব্যাপারে বর্ণিত হাদীস ও আয়াত কি?

সাহাবায়ে কেরাম যখন বদর যুদ্ধের পর গণীমতের মাল নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফাল অবতীর্ণ করেন। আপনি লক্ষ্য করুন কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদকে দূর করছেন। তিনি নাযিল করলেন–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
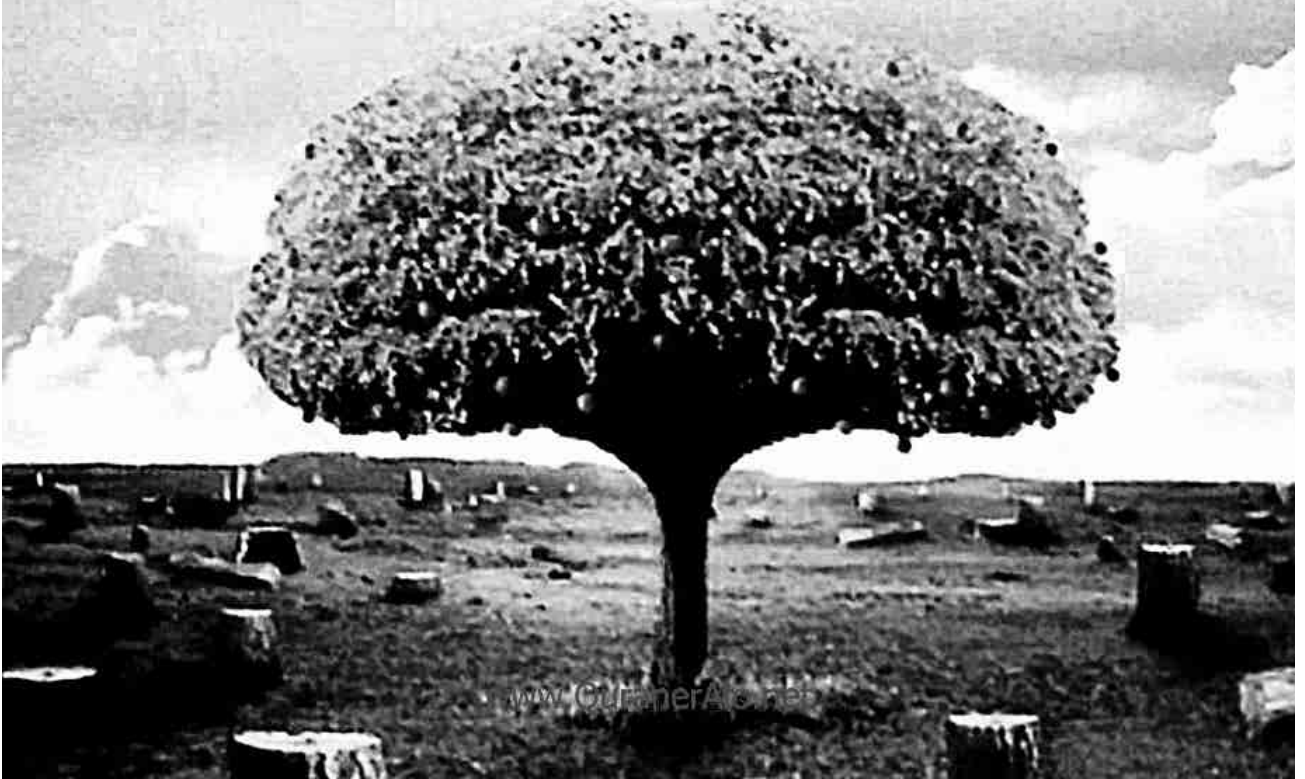
তারা আপনার কাছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন গনীমত আল্লাহ ও তার রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

[সূরা আনফাল : ১]

আনফাল যা মুসলমানরা গণিমত হিসাবে পায়। তারা এই সম্পদের বণ্টন নিয়ে বাকতর্কে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সমাধানস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা বিষয়টিকে ঘুরিয়ে এমন একটি বিষয়ের দিকে সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করলেন যা আনফাল (গণীমত) থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধন-সম্পদ, অস্ত্র সরঞ্জাম থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন–

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

অতএব তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে নাও, আর যদি মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। নিশ্চয় মুমিনরা এইরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। *[সূরা আনফাল : ১, ২]*

আলোচ্য আয়াত থেকে শুরু করে দীর্ঘক্ষণ পারস্পরিক সম্প্রীতি, বন্ধন এবং ঈমান, ইখলাস সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন।

বিতর্ককে এড়িয়ে যান। এরপর তিন পৃষ্ঠা পরে (৪১ নং আয়াতে) গণীমতের হুকুম বর্ণনা করেন যার প্রশ্ন তারা করেছিল। আল্লাহ বলেন–

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

জেনে রাখ, তোমরা যা গণীমত হিসাবে পাবে তার পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য নির্ধারিত। *[সূরা আনফাল : ৪১]*

অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, তোমাদের মূল সমস্যা যদিও গণীমতের মাল বণ্টন নিয়ে কিন্তু গণীমত ভাগবাটোয়ারা কেন্দ্র করে তোমরা আরো বড় সমস্যায় নিপতিত হয়েছ। তা হচ্ছে তোমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যাওয়া। (তাই আগে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা কর।)

কিছু সাহাবী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আহলে কুবা পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন। (আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন–

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

তাতে এমন কিছু ব্যক্তিবর্গ আছে যারা পবিত্রতা ভালবাসে আর আল্লাহ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন। *[সূরা তাওবা : ১০৮]*)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। যাওয়ার পূর্বে বিলালকে বলে গেলেন আমি আহলে কুবাকে সংশোধন করার জন্য যাচ্ছি। যদি সালাতের সময় হয়ে যায় তাহলে আযান-ইকামত দিবে এবং আবু বকর সালাত পড়াবে।' এই বলে তিনি কুবাবাসীর কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন তারা পারস্পরিক (তীর্যক কথার) পাথর ছোড়াছুঁড়ি করছে। তিনি তাদের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেন।

সুতরাং সম্প্রীতি নষ্ট কর্তনকারীর মতো। তা চুলকে কাটে না বরং ইসলাম ধর্ম কেটে ফেলে। তোমার সালাত সিয়াম হজ্ব যাকাত নষ্ট করে দিবে। কেননা, সম্প্রীতি নষ্ট হলে একজন আরেকজনের গীবত শেকায়াত করবে। হিংসা বিদ্বেষ মহাপাপ। একজন হয়ত কোন এক মজলিসে কারো গীবত করবে। তখন এই সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়বে। এভাবে সমাজ, ধর্মকে নষ্ট করে দিবে।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সমাজে অনেক লোক আছেন যারা এই মহান খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছেন। জর্ডানে কিছু লোক আছেন যারা ঝগড়া-বিবাদ মিটাতে কাজ করেন। তার মানেই এই নয় যে তা আদালতের বিকল্প। বরং এরা দ্রুত বিবাদ মিটিতে ফেলতে সহায়তা করে।

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবি মুয়িত রা. বলেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুজনের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে কোন মিথ্যাকে ভালোর দিকে সম্পৃক্ত করে (অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় নেয়) সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়।'

তাই আপনি যদি এই কাজে অগ্রসর হন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ফিরিয়ে দিতে চান, তাহলে আপনাকে কিছু বিশেষগুণে গুণান্বিত হতে হবে। যেমন, প্রত্যেকের সামনে এমনভাবে কথা বলবেন যেন সে খুশী হয়। এমন কোন কথা বলবেন না যা হৃদয়কে ব্যথিত করে এবং বিরোধ আরো বাড়িয়ে দেয়। আমরা এই ঝগড়া মিটাতে পারি আমাদের ভাইকে এই কথা বলে যে, এই বিবাদে শয়তান সন্তুষ্ট হচ্ছে।

যাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলমান তাদেরকে এভাবে সতর্ক করতে পারি, দেখুন মৃত্যু যে কোন সময় চলে আসতে পারে। তাই মুসলমানের উচিত প্রত্যেক বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

সংশোধনের দরজাই শ্রেষ্ঠ পথ। আল্লাহ বলেন–

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

সংশোধন, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। এক দ্বীনি ভাই বলেন, আমরা একটি পরিবারের মাঝে সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করছিলাম। স্ত্রীর পিতা শপথ করেছে, সে জামাই থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আমি যখন স্বামীকে নিয়ে মেয়ের বাড়িতে গেলাম, তখন পিতা লাঠি নিয়ে আমাদেরকে ধাওয়া করল। ফলে আমরা পলায়ন করলাম। এই ঘটনার কিছু দিন পর পিতা এসে আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং তাদের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা হয়।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যারা সংশোধনের জন্য যাচ্ছে তারা সরাসরি ঘরের মূল দরজায় যাবে না। (হতে পারে বিরোধী দল রাগবশতঃ আক্রমণ করে বসবে) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংশোধনের উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, তাদেরকে নিয়ে বসা এবং তাদের কথা শুনা। তাদের কাছে এমন ব্যক্তিকেই পাঠাবে যে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। যার কথার মূল্য আছে।

অনেক মানুষই তার প্রতিবেশী, ভাই, বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা উদাসীনতা করে। অবশেষে একদিন হয়তো তার মৃত্যু হয়ে যায় কিন্তু তাদের মাঝে চলমান বিরোধ থেকে যায়।

জনৈক ভাই একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। জনৈক মৃতব্যক্তিকে গোসলের পর কাফন পরানো হল। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, আমাকে তার মুখটি একটু দেখাও। তারপর কাপড় খোলা হলে সে তার কপালে চুমু দিল এবং কান্নার পাশাপাশি অঝোর ধারায় অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল। লোকেরা তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন সে উত্তর দিল, তোমরা কি জান এ কে? সে আমার ভাই। আজ ষোলটি বছর হলো কিন্তু আমরা সংঘাতে লিপ্ত আছি। আমাদের মাঝে কথা হয়না।'

লা হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এটা মারাত্মক গোনাহ। এই ধরণের ভয়ঙ্কর গোনাহ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

কুরআনে এসেছে, ইউসুফ ও তার ভ্রাতাগণের মাঝে শয়তান প্ররোচনা দেয়। এজন্য আমাদের উচিত শয়তানকে প্রশ্রয় না দেওয়া। আল্লাহ বলেন–

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

শয়তান যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।

[সূরা আরাফ : ২০০]

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজ্জাতুল বিদাতে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এই হজ ছিল বিদায় হজ। কাজেই তাতে এমন নির্দেশনাই দিবেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই শয়তান এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে যে, জাজীরাতুল আরবে তার ইবাদত করা হবে। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাতের ব্যাপারে আশাবাদী।' অর্থাৎ তোমাদেরকে শিরকে লিপ্ত করাতে না পারলেও পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও সংঘাতে লিপ্ত করাবে।

এজন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা উম্মতকে তাদের মাঝে সংঘাত যেন না হয় সে ভয় দেখাতেন।
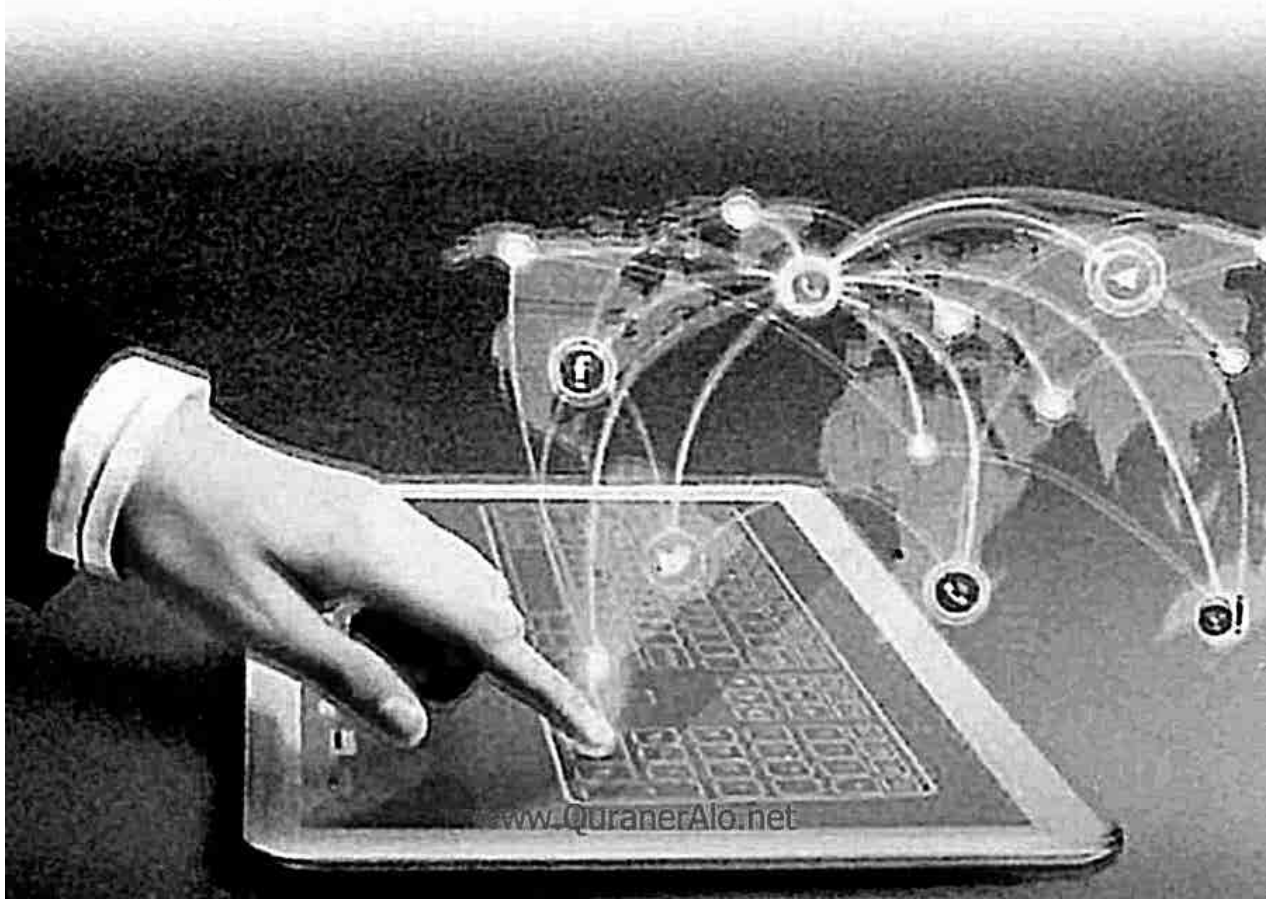
সর্বদা তাদের সম্প্রীতি রক্ষায় উৎসাহিত করতেন। সাহাবায়ে কেরামও সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতেন।

মানুষ কি চায় সুখী জীবন যাপন করতে? সে কী চায় তার জীবন সুরভিত হোক। কবি বলেন–

ان المكارم كلها لو حصلت * ارجعت جملتها الى شيئين

تعظيم أمر الله جل جلاله * والسعى فى إصلاح ذات البين

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের পর যে কাজটি করেন তাহচ্ছে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা। এই কর্মটি কত গুরুত্বপূর্ণ যে, স্বয়ং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা দুই ব্যক্তির মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীসে কুদসীতে লম্বা বিবরণ এসেছে। সেই হাদীসে আছে, কিয়ামত দিবসে দুই ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তখন একজন বলবেন, আয় রব, আপনি এর থেকে আমার উপর জুলুম নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।'

সেই হাদীসে দীর্ঘ কথোপকথনের পর শেষের দিকে এসেছে, তারপর আল্লাহ অভিযোগকারীকে লক্ষ্য করে বলবেন, আকাশের দিকে তাকাও। তখন সে আকাশে তাকিয়ে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ দেখতে পাবে। সে বিস্ময় হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, ইয়া আল্লাহ, এই প্রাসাদ কোন শহীদের জন্য? তিনি উত্তর দিবেন, যে তার মূল্য দিতে পারবে সেই তা পাবে।

বান্দা প্রশ্ন করবে, তার মূল্য কি?

তিনি বলবেন, তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দেওয়া।

বান্দা আনন্দিত হয়ে বলবে, আমি আমার ভাইকে ক্ষমা করে দিলাম।

তখন আল্লাহ বলবেন, এখন তোমার ভাইকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।' সুতরাং কতই না উত্তম হবে যদি আমরা এই সামান্য কাজটি মসজিদ-মাদরাসা ও জামিয়া এবং পাড়া-মহল্লায় করে থাকি।

শরীয়তে মিথ্যা বলা হারাম। কিন্তু সংশোধনের নিয়তে জায়েজ আছে। জনৈক আলেম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ইসলাহের ক্ষেত্রে মিথ্যাকে ভালোবাসেন আর ফাসাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সত্যকেও অপছন্দ করেন।

আমি শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. এর ফতোয়া পড়েছি। এটা অধিকাংশ আহলে ইলমের ফতোয়া। তিনি বলেন, এসব ক্ষেত্রে শপথ করা বৈধ।

আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি সমাজে সংশোধন ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ৮০% সফল হয়েছে এবং ২০% সফলতা মুখ দেখে নি।

সংশোধনকারী ধৈর্যশীল, প্রজ্ঞাবান ও হাস্যোজ্জ্বল এবং রাগ নিয়ন্ত্রণের গুণে গুনান্বিত হতে হবে। তিনি যদি দেখেন বিরোধী ব্যক্তি রাগ হয়ে গেছে তাহলে বের হয়ে যাবেন, যেন সে শান্ত হতে পারে। তার সামনে আর কোন আলোচনা করবেন না। একব্যক্তি এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস-াল্লাম এর কাছে উপদেশ চাইল। নবীজী তাকে বললেন, 'তুমি রাগ করো না। কেন ক্রোধ শয়তানের কর্ম।' অন্যত্র বলেন, লড়াইয়ে বিরোধীকে ধরাশায়ী করা কোন বীরত্বের কাজ নয়। বরং যে রাগের সময় নিজের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই প্রকৃত বীর।' [হাদীস]

তদ্রূপ যিনি সংশোধন করতে যাচ্ছেন তাকে ভাবতে হবে, তিনি কি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য? তার কথা কি গ্রহণযোগ্য হবে? যদি না হন তাহলে আরেক মুরব্বীর সহায়তা নিবেন। উভয়পক্ষের মাঝে কে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা লক্ষ্যণীয়। উদাহরণ কোন যুবতীর ক্ষেত্রে তার শিক্ষিকা যদি বেশী প্রভাব খাটাতে পারেন

তাহলে শিক্ষিকা সংশোধন করবেন।

পিতা-ছেলের মাঝে বিদ্যমান বিরোধ সবচেয়ে বেশি। দুঃখজনক যে, অনেক সন্তান মিরাস পাওয়ার জন্য তাদের পিতার মৃত্যু কামনা করে।

ইমাম ও জামাতের লোকদের মাঝে সংশোধন করতে হবে। অনেক সময় এই সংশোধন চিঠি বা ক্যাসেটের মাধ্যমেও হতে পারে।

সাহাবায়ে কেরাম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অনেক চেষ্টা করেছেন। খারেজীরা আলি রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এক স্থানে একত্র হয়। তাদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে তাদের নিকট যাওয়ার অনুমতি দিন।

আলী রা. বললেন, আমি আপনার ক্ষতির আশংকা করছি।

ইবনে আব্বাস বললেন, আমি তাদের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।' তিনি একজন সত্য সন্ধানী, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, নরম স্বভাব ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট গিয়ে তাদের সাথে কথা বললেন। তাদের উত্থাপিত সব প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিলেন। তিনি তাদেরকে ধমক দেন নি। তাদের সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছেন।

তার মাধুর্যপূর্ণ আচরণে তৎক্ষণাৎ চার হাজার বিদ্রোহী তওবা করে ফিরে আসে। আর দুই হাজার থেকে যায় যারা খারেজী নামে পরিচিত। আল্লাহ তায়ালা আলী রা.কে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন।

অনেক ক্ষেত্রে শরয়ী ইলম দ্বারা ঝগড়া মিটানো সম্ভব। তাই সংশোধনকারীকে শরয়ী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। সে শরয়ী জ্ঞানের আলোকে মানুষের হৃদয় একত্র করবে।

যে ব্যক্তির মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা ছিল আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার

প্রশংসা করেছেন। একবার তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন হাসান বিন আলীকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখলেন। হাসান রা. ছোট ছিলেন। (প্রিয়নবী মৃত্যুকালে তার বয়স পাঁচ বছর ছিল) নবীজী তাকে দেখে মিম্বর থেকে নেমে কোলে তুলে নিলেন। এমন কি তাকে নিয়ে মিম্বরে উঠলেন। অতঃপর বললেন, আমার এই নাতি উম্মতের সর্দার হবে। আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি দলের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করবেন।'

অতপর ৪১ হিজরীতে মুয়াবিয়া ও আলী রা. এর মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এদিকে আলী র. এর মৃত্যু পর হাসান রা. খেলাফতের দায়িত্ব নেন। ফলে মুসলিম বিশ্বে দু'জন খলীফা একজন মদীনায় হাসান রা. আরেকজন শামে মুয়াবিয়া রা.। কিন্তু ছয় মাস পর হাসান রা. খিলাফত থেকে পদত্যাগ করেন। তখন মুসলমানরা এক খলীফার অধীনে চলে আসে। অথচ ইতিপূর্বে তারা দুই খলীফায় বিভক্ত ছিল। সেই বছরকে 'আমুল জামাআত' বলে নামকরণ করা হয়। এই জন্যই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সর্দার বলেছেন।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের আবশ্যক বিবাদমান দলের মাঝে সংঘাত বন্ধের চেষ্টা করবে। সংঘর্ষ হওয়ার পূর্বেই মিটিয়ে দিবে সচেষ্ট থাকবে। মানুষকে ক্ষমা করার ফযিলত শুনাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

যে ব্যক্তি ক্ষমা করল ও সংশোধন করে নিল তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট। *[সূরা শূরা : ৪০]*

নতুন সমস্যা সৃষ্টির পূর্বেই ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে তৎপর হবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংশোধনের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ
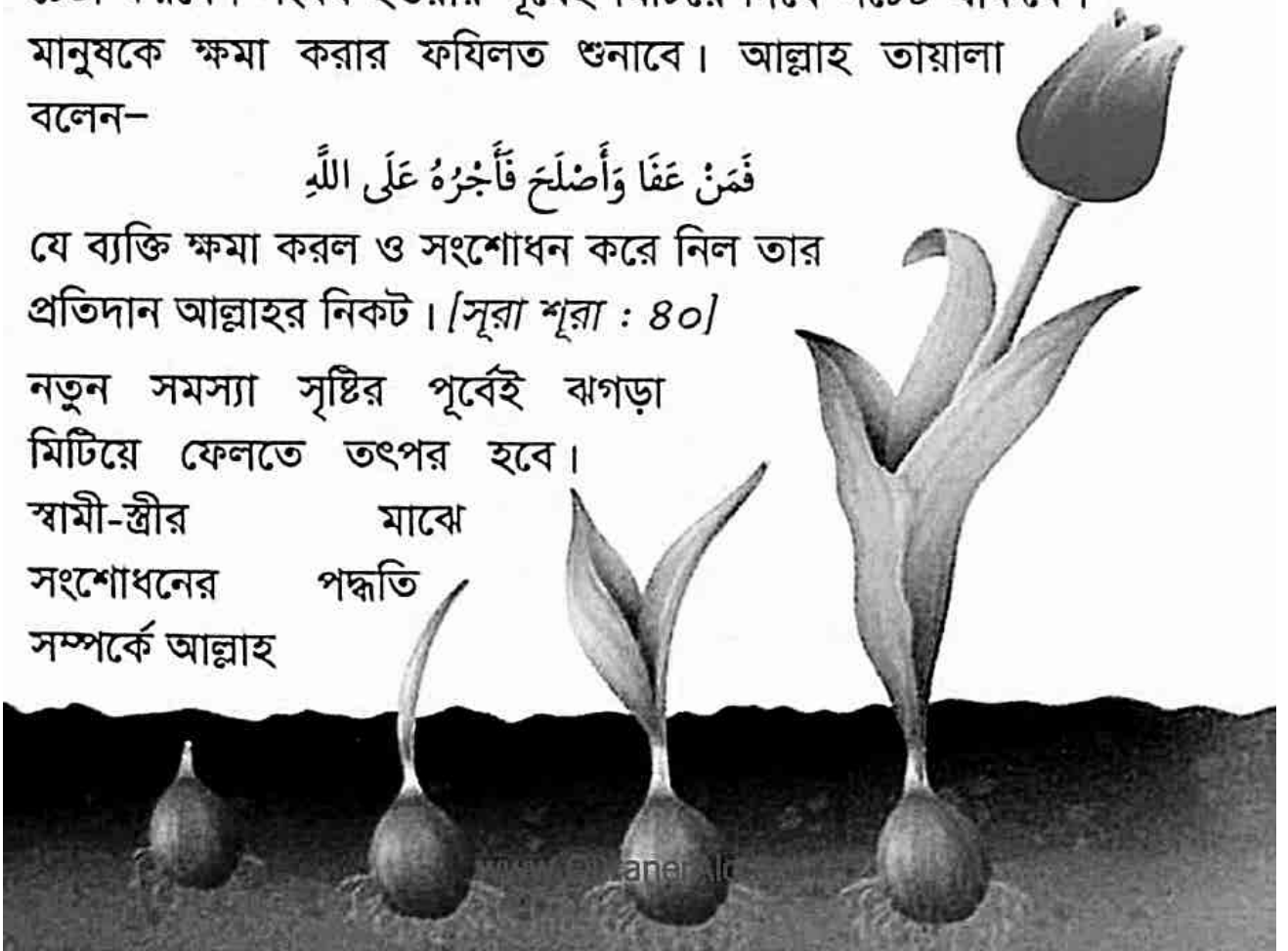
তায়ালা উত্তম পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর। *[সূরা নিসা : ৩৫]*

অর্থাৎ যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আশংকা কর তাহলে বিবাদের পূর্বেই তার সমাধানের চেষ্টা কর। (উভয় পরিবার থেকে একজন করে বিজ্ঞ বিচারক প্রেরণ করে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর। আল্লাহ তাওফিক দিবেন।

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

তবে উভয়ের পরিবার হতে একজন করে বিচারক পাঠাও; যদি তারা দুজনই মীমাংসা আকাঙ্ক্ষা করে তবে আল্লাহ তাদের উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ। *[সূরা নিসা : ৩৫]*

তাই আমরা স্বামীর তালাকের জন্য বসে থাকবো না। বরং তার পূর্বেই সংশোধন করে দিব।

আপনি যদি বন্ধুর সাথে কথা বলার সময় তার মুখ থেকে এমন কথা বের হয় যা ঝগড়া, ক্রোধ সৃষ্টি করে; তাহলে সংযত হোন এবং বিচ্ছেদের পূর্বেই আপনাদের হৃদয় একত্র করার চেষ্টা করুন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবলিস তার সিংহাসন সমুদ্রের পানির উপর স্থাপন করে। তারপর তার শীষ্যদের বিভিন্ন স্থানে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করে। যে শয়তান এসে বলে 'আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ লাগিয়ে দিয়েছি'- সেই তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হয়। তাকে বীরত্বের পুরষ্কারস্বরূপ নিজের মুকুট খুলে তার মাথায় পরিধান করিয়ে দেয়।

এজন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারে সম্প্রীতির ব্যাপারে খুবই মনোযোগী ছিলেন। একবার ফাতেমা রা. এর বাড়িতে গেলেন। দরজা কড়া নড়ার পর আলি রা. কে পেলেন না। তখন ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়?' (চিন্তা করুন, তিনি বলেন নি আমার চাচাত ভাই কোথায়, বা আলী কোথায়,) উদ্দেশ্য তাকে স্মরণ করে দেওয়া যে, তারা উভয়ে একই দাদার ঔরসে।

ফাতেমা রা. বললেন, আমার সাথে তার ঝগড়া হয়েছে। তাই তিনি রাগ করে বের হয়ে গেছেন। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলেন নি যে, 'কী! তার এত বড় স্পর্ধা! সে নবীর কন্যাকে বিয়ে করেছে। আবার রাগ করে। (দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!)' বরং তিনি আলীর খোঁজে বের হলেন। উদ্দেশ্য তাদের মাঝে সংশোধন করা। তিনি আলীকে মসজিদে পেলেন। তার চাদর মাটিতে পড়ে আছে। গায়ে মাটি লেগে আছে। তখন প্রিয় নবী তাকে এভাবে ডাকলেন, হে আবু তুরাব! উঠ হে আবু তুরাব! উঠ।' তাকে আনন্দ দেওয়ার নিমিত্ত এই নামে ডাকলেন। তারপর তার হাত ধরে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসলেন।

আমি আমার ভাই-বোনদের বলছি আপনারাও এভাবে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে অবদান রাখুন। প্রত্যেক বাড়ি, সংগঠন, মহল্লা, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সম্ভ্রান্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আছেন যাদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। সুতরাং তাদের উচিত তাদের আত্মমর্যাদা সম্মানকে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

(৬)
শরয়ী ঝাঁড়-ফুঁক

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়।

আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন? জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم • وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل • فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى • يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم • فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجود • محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا • يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

তা (কুরআন) মুমিনদের জন্য হেদায়ত ও আরোগ্যতুল্য।

[সূরা ফুসসিলাত : ৪৪]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

আমি কুরআন অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য রহমত ও আরোগ্যতুল্য।'

[সূরা ইসরা : ৮২]

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন শিফা তথা আরোগ্যকারী।

আজকে আলোচনা করবো, কুরআন কিভাবে আরোগ্য করে, কিভাবে জটিল রোগমুক্তি করে যা আরোগ্য বিধানে (ক্ষেত্রবিশেষ)

ডাক্তারগণও অপারগ হয়ে যান। আজকের আলোচনার মূল উদ্দেশ্য যেন প্রত্যেকে নিজের রোগ আরোগ্য বিধানে শরয়ী ঝাঁড়ফুক দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। নিজেই নিজের ঝাঁড়ফুক করতে পারেন। তবে এর জন্য এমন শর্ত নেই যে, লোকজনের জন্য আপনি কোন দোকান খুলে বসবেন বা বাসায় আসন গেড়ে বসবেন।

বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার যেন এতটুকু যোগ্যতা থাকে, যার ফলে প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজের শরীরে, স্ত্রী-সন্তানদের ঝাড়ফুঁক করতে পারেন। বিপদের সময় যেন নিজেদের পরিবারের আরোগ্য বিধান করতে পারেন। ফলে কোন তান্ত্রিক বা কবিরাজের কাছে দৌড়াতে হবে না।

আসুন আমরা প্রথমে কুরআনের আছর তথা প্রভাব নিয়ে আলোচনা করি। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

আমি কুরআন অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য রহমত ও আরোগ্যতুল্য।'

[সূরা ইসরা : ৮২]

কুরআন মুমিনের হৃদয় প্রশান্ত করে। বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূর করে। হতাশাগ্রস্তদের হতাশা দূর করে। তাই তো আল্লাহ বলেন–

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

বলুন, তা ইমানদারদের জন্য হিদায়াত ও শিফা। *[সূরা হা মিম সাজদা : ৪৪]*
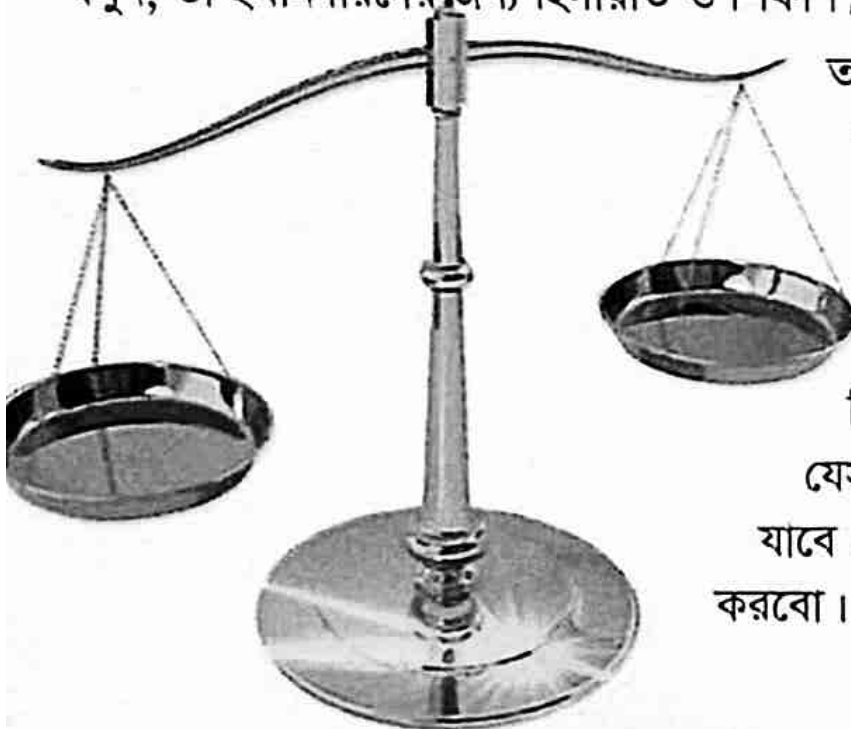
তাই আসুন শরয়ী পদ্ধতিতে ঝাড়ফুঁকের আদাব, সুন্নত ইত্যাদি জেনে নেই।

আজকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। যেসব রোগে ঝাড়ফুঁক করা যাবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

কুরআন শিফাদানকারী। আমাদের সামনে এর জ্বলন্ত প্রমাণ আছে। অনেক ব্যক্তি জটিল পীড়াগ্রস্ত হওয়ার পর কুরআন পাঠের বদৌলতে সুস্থ হয়ে গেছে।

আজকের আলোচনায় ঝাড়ফুঁককারীর মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করব না বরং আমার আলোচনার উদ্দেশ্য যেন প্রত্যেকেই সাধ্যমত ঝাড়ফুঁক করতে পারেন। ফলে কেউ যদি হাসপাতালে কাউকে দেখতে যান তাহলে তার জন্য আরোগ্য দোয়ার পাশাপাশি কিছু ঝাড়ফুঁকও করে আসবেন।

অনেক রোগ মানসিক অবসাদ থেকে হয়। আবার স্বামী-স্ত্রীর কলহ-বিবাদ নজর লাগার কারণেও হয়ে থাকে। অথচ তারা কিছুই বুঝতে পারেন না। আমার এক নিকট বন্ধু নতুন বাড়িতে উঠল। তার বাসায় কিছু প্রতিবেশী মহিলা বেড়াতে আসে। মেহমানরা বাসা থেকে চলে গেলে তার স্ত্রী স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার করা শুরু করে। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। অল্পতেই রাগ হয়ে যায়।

ভদ্রলোক বলেন, আমি স্ত্রীকে বললাম, আস আমি তোমাকে ঝাড়ফুঁক করি। ফলে ঝাড়ফুঁক করার দশ মিনিট পরে সে সুস্থ হয়ে গেল। এখন তার পূর্বের অবস্থার কিছুই মনে নেই। মূলত তার নজর লেগেছিল। প্রতিবেশী মহিলাগণ নতুন নির্মিত বাড়ি ও আভ্যন্তরিণ সুন্দর আসবাবপত্র এবং তাদের পারিবারিক সুখ-শান্তি দেখে নজর লেগে গিয়েছিল। ফলে এই অবস্থা হয়েছে।
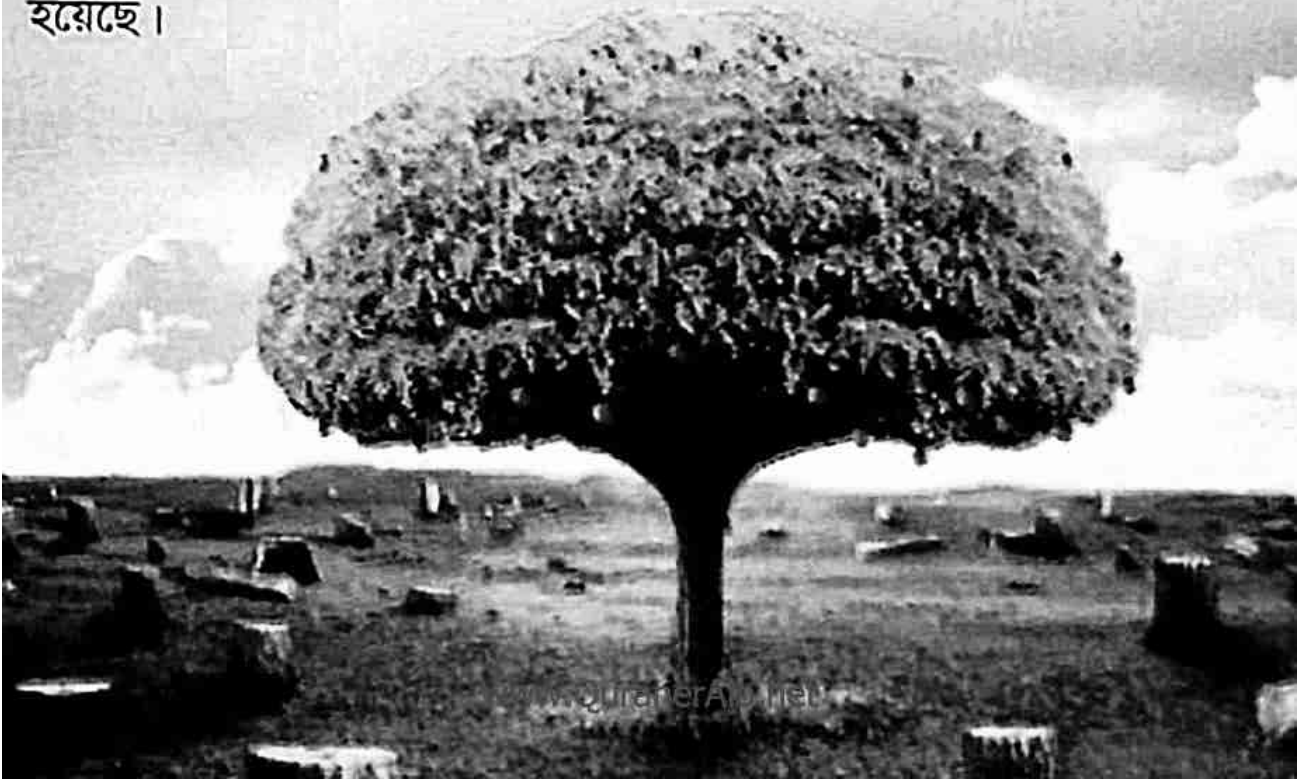
সুতরাং আমরা যদি বুঝতে পারি নজর লেগেছে তাহলে সেভাবেই আমাদের চিকিৎসা করতে হবে। এজন্য বড় কোন ঝাড়ফুঁককারীর সন্ধান করা আবশ্যক নয়।

শরয়ী ঝাড়ফুঁক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর কার্যকারিতার মূল রহস্য হচ্ছে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণের বরকত। কুরআনের সূরা দোয়া পড়ে তার নিকট আশ্রয়গ্রহণের ফলস্বরূপ তিনি রোগমুক্তি করেন। সুতরাং এই আকীদা পোষণ করতে হবে যে, পানি, তেল ও পাঠকারীর কোন বিশেষ গুণ নেই। এগুলো কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। মূলত আল্লাহর বরকতে আরোগ্য লাভ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

আমি কুরআন অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য রহমত ও আরোগ্যতুল্য।'

[সূরা ইসরা : ৮২]

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِحْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ إِحْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

তুমি আল্লাহকে হেফাজত করো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে হেফাজত করো, তাকে তোমার (বিপদে) সামনে পাবে।'

আল্লাহর রাসুলের কথার মর্ম হচ্ছে, তুমি তোমার ধন-সম্পদ, বাড়ি-ঘরে, সন্তান-স্ত্রী, দেহ-মনে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রেখে তাকে হেফাজত কর। সর্বদা তার স্মরণ কর। তিনি তোমাকে যাবতীয় বিষয়ে হেফাজত করবেন।

মানুষ রোগের সময় আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষি হয় সবচেয়ে বেশি। চাই তার নিজের রোগ হোক বা স্ত্রী-সন্তানদের। এই পরিস্থিতিতে দুআ পাঠের মাধ্যমে তুমি তাকে তোমার সাহায্যে পাবে।

তাই দৈনন্দিন জীবন যাবতীয় অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করতে হবে এবং এমন কর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে যার ফলে আমার দেহে শয়তান আছর করার সুযোগ পায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, শরয়ী ঝাড়ফুঁক কি শুধু মানসিক ও আত্মিক রোগেই আরোগ্য বিধান করে নাকি শারীরিক স্নায়ুবিক রোগেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এর উত্তর, শরয়ী ঝাড়ফুঁক উভয় রোগের ক্ষেত্রেই কার্যকরী। নিচের ঘটনার ফলে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সহিহ বুখারীতে এসেছে : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের একটি জামাতকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে যায়। তারা আরবের একটি কবিলার কাছে আতিথেয়তার আবেদন করেন। কিন্তু সেই গোত্র তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে। ফলে সাহাবায়ে কেরাম কিছু দূর গিয়ে বসে পড়েন। এদিকে গোত্রপতিকে সাপে দংশন করে। একজন এসে সাহাবীদের লক্ষ করে বলল, তোমাদের কেউ কি ঝাড়ফুঁক করতে পার? আমাদের নেতাকে সাপে কামড় দিয়েছে।'

(ইবনে হাজরের ভাষ্যমতে এরা মুসলমান ছিল না। কিন্তু ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রপাঠ জাহিলীযুগে প্রচলিত ছিল বিধায় তারা এই আবেদন করেছিল। তারা ঝাড়ফুঁকের কার্যকারিতায় বিশ্বাসী ছিল। জাহেলিযুগের অনেক মন্ত্র বর্তমান কালের জাদুকররাও পাঠ করে থাকে।)

সাহাবীদের মধ্যে আবু সাইদ খুদরী রা. বললেন, হ্যাঁ আমি ঝাড়ফুঁক করতে পারি।

কিন্তু তাকে ফুঁক দিব না যতক্ষণ না তোমরা আমাদেরকে বিনিময়স্বরূপ একটি ছাগলের পাল দিবে।

তারা বলল, ঠিক আছে যদি সুস্থ হয় তাহলে তোমরা তা পাবে।

আবু সাইদ খুদরী রা. দংশিত ব্যক্তির গায়ে সাতবার সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিলেন। এতে ঐ লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। তার এমন অনুভব হচ্ছে যে, সে কোন বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। লোকেরা সাহাবীদের প্রাপ্য দিয়ে দিলে তা নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি কিভাবে জানলে যে তা ঝাড়ফুঁক? তোমরা এই ছাগলের গোশত আহার কর এবং আমাকেও দাও। *[সহীহ বোখারী : ৫২৯৫]*

এই হাদীস প্রমাণ করে, ঝাড়ফুঁক শারীরিক যে কোন রোগে কার্যকরী।

একবার আমি জনৈক বন্ধুর মুমূর্ষ পিতাকে দেখতে যাই। হাসপাতালে গিয়ে দেখি তার দেহে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি লাগানো। তার পাশে বৃটেনের একজন নার্স বসে বই পড়ছিল। আমি রোগীর পাশে বসে তার মাথায় হাত রাখলাম এবং সূরা ফাতিহা সাতবার পাঠ করলাম। পাশাপাশি আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও নাস পাঠ করলাম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ। আমি যখন পড়তে লাগলাম তখন মেশিনের স্কিন হলুদ হতে লাগল। নার্স বই রেখে দিয়ে তড়িঘড়ি করে মেশিনের পাশে এসে বসল। সে মেশিনে টিপাটিপি শুরু করল। বন্ধুবর আব্দুল্লাহ চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'এটা কুরআনের বরকত, কুরআনের বরকত।' আমি পড়া শেষ করলাম। আমি জানি না কি ঘটেছিল।

আমরা চলে আসার সময় আব্দুল্লাহ নার্সের সাথে ইংরেজিতে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলে বের হয়ে আসল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ঘটেছে? সে বলল, অপারেশনের পর আমার পিতার রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল। এমনকি তিনি মৃত্যুর উপক্রম হয়েছেন। তারা রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য মেশিন

নির্দিষ্ট মাত্রায় সেট করেছিল। কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় নি। কিন্তু তুমি যখন কুরআন পড়ছিলে তখন রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় সত্তর থেকে আশি, নব্বই এমনকি একশত। এই দৃশ্য দেখে মহিলা আশ্চর্যবোধ করে যে, তুমি শুধু কথার মাধ্যমেই রক্তচাপ বর্ধিত করতে পারলে যা তাদের আধুনিক মেশিনেও পারে নি।

দেখুন কুরআনের কী প্রভাব! এ কারণে কাফেররাও কুরআন শ্রবণে মোহবিষ্ট হতো। আজকে আমি কুরআনের ফযিলত ও মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করব না। অন্যথায় আমি আপনাদের সাথে রাসুলের যুগে এবং বর্তমান কালে কাফেরদের হৃদয়ে যে প্রভাব ফেলেছিল তার অনেক কাহিনী বর্ণনা করতাম। কিছুদিন পূর্বে জার্মানিতে বক্তৃতাকালে আমি কুরআনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন কিছু যুবক আমাকে বলল, শায়খ, আমাদের জার্মান বন্ধুরা আরবি বুঝে না। তাদের একজন বলল, আমি জার্মান প্রতিবেশীর সাথে প্রত্যহ কাজে বের হতাম। যাওয়ার পথে (গাড়িতে) কুরআন তিলাওয়াতের সিডি চালাতাম। একদিন আমি এই কাজটি করি নি। তখন জার্মানি আমাকে বলল, আমাকে সেই মিউজিক শুনাও যা প্রতিদিন শুনাতে।

আমি বলল, এটাতো মিউজিক নয় বরং আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন। সে বলল, তাতে কোন সমস্যা নেই। আমি তা শুনতে চাই।

তখন আমি বললম, যেহেতু তুমি বুঝ না তাই তোমাকে কেন শুনাবো? সে উত্তর দিল, ‘একথা সত্য যে, আমি বুঝি না। কিন্তু তোমার সাথে যাত্রাকালে যখনই এই আওয়াজ শুনেছি তখন এমন এক প্রশান্তি অনুভব করেছি যা জীবনে কখনো অনুভূত হয়নি। এজন্য আমি প্রতিদিন তা শুনতে আগ্রহী।’ সুবহানাল্লাহ!

এজন্য আল্লাহ বলেন–

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ
خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

আমি এই কুরআনকে যদি পাহাড়ে অবতীর্ণ করতাম তাহলে তা আল্লাহর

ভয়ে প্রকম্পিত হতো। *[সূরা হাশর : ২১]*

আরেক ভাই বলেন, আমার বোনের ব্লাডক্যান্সার হয়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। তাকে আমরা একটি উন্নত হাসপাতালে ভর্তি করি। দুই সপ্তাহ সেখানে ছিল। জনৈক শায়খ (আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) এসে তিন দিন তাকে ঝাড়ফুঁক করলেন।

তাকে বাঁচানোর জন্য (রক্ত উৎপাদনের জন্য) অস্থিমজ্জার অপারেশন করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু ঝাড়ফুঁকের বদৌলতে এই রোগ থেকে পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

আরেকজন রোগী আইসিইউতে ভর্তি ছিলেন। ডাক্তারগণ বলেছেন, তার জীবনের কোন আশা নেই। তাই তারা পরিবারকে পরামর্শ দিয়েছেন যেন যন্ত্রপাতি খুলে এই বেডে আরেকজন রোগী শুয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। রোগী অক্সিজেনের মাধ্যমে শ্বাস নিত। প্রায় দেড় বছর হাসপাতালে অতিবাহিত করে। কিন্তু কোন উন্নতি হয়নি। এই দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার ফলে তার চোখ ক্রমান্বয়ে দৃষ্টিহীন হতে লাগল।

ডাক্তাররা হাসপাতাল ছেড়ে দিতে বললেও এতে তার স্ত্রী রাজি ছিলেন না। বরং তাকে এইভাবে আরো কিছু দিন রাখতে আবেদন করলেন। মহিলা প্রতিদিন স্বামীর গায়ে ঝাড়ফুঁক করার পাশাপাশি দান-সাদাকা প্রদান শুরু করেন।
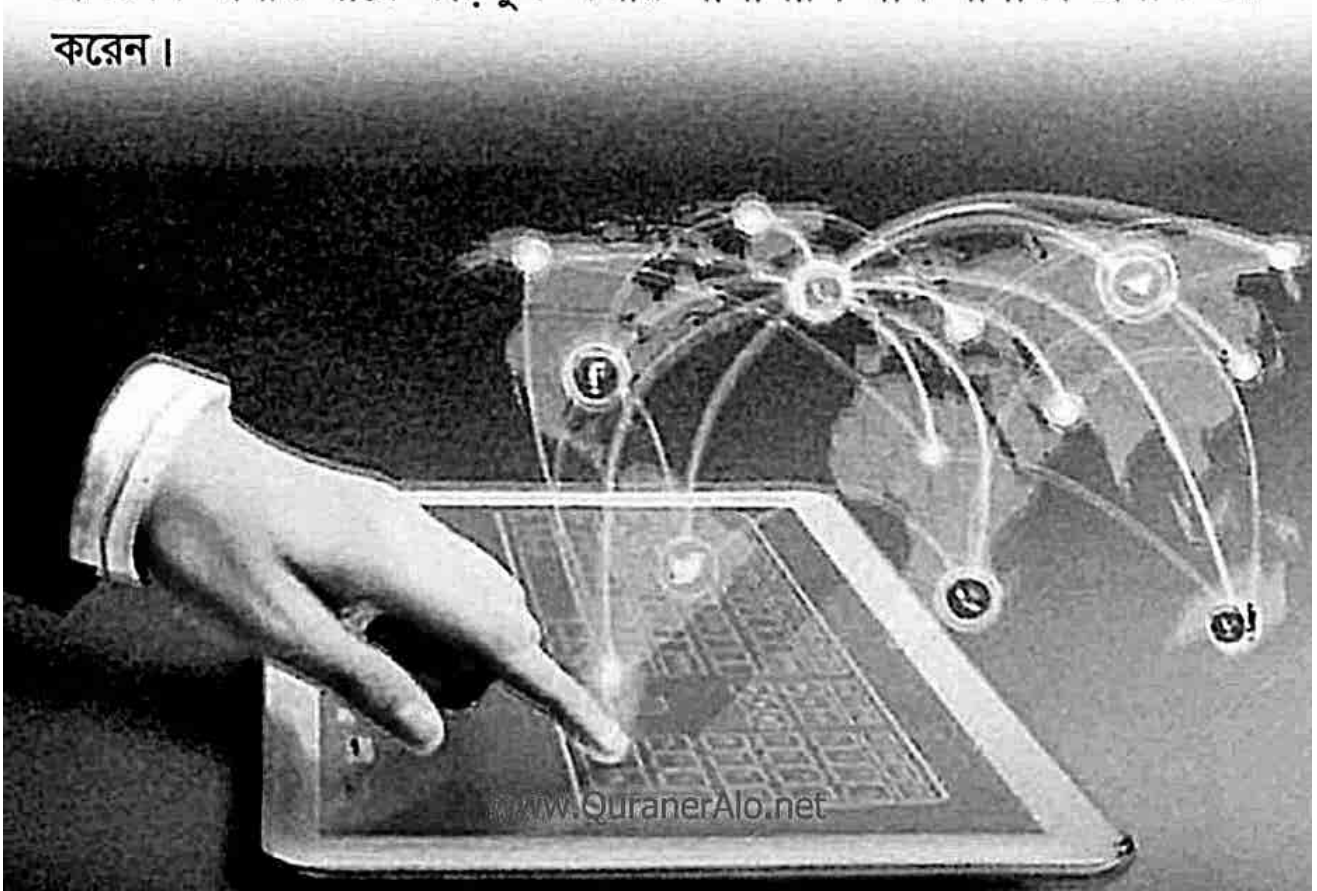
কিন্তু কী আশ্চর্য! কিছুদিন পর রোগী যন্ত্রপাতি ছাড়াই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সক্ষম হল। প্রথমে দৈনিক ২৪ থেকে কমিয়ে ১২ ঘন্টায় আসল। এর কিছুদিন পর সম্পূর্ণ মেশিন ছাড়া নিজে নিজেই শ্বাস নিতে লাগল। তার চোখ ভাল হয়ে গেল। আইসিইউ থেকে সাধারণ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

আরেকজন ক্যান্সারের রোগীকে যমযমের পানি ও তেলে কুরআন পড়ে শরীরে ব্যবহার করা হলো। যেসব অঙ্গে ক্যান্সার যেমন পেট, পিঠ ও বুকে মালিশ করতে লাগল। তার বয়স ছিল ৫৮ বছর। ছেলে পিতার গায়ে ঝাড়ফুঁক করেছে। এমন কি এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

আরেক ভাই বলেন, আমাদের প্রতিবেশী কক্ষে এক মহিলার ফুসফুসে সমস্যা ছিল। একদিন তার মেয়েরা চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে লাগল, 'আমাদের মা মরে যাবেন।' তখন আমরা তাদেরকে কুরআনের আয়াত পঠিত পানি ও তেল দেই। পরে মেয়েরা আমাদের সুসংবাদ দেয় যে, এতে তাদের মা সুস্থ হয়ে গেছেন এবং হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন।

প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনে কাইয়্যূম রহ. বলেন, 'কুরআন যাকে আরোগ করেনি আল্লাহ তাকে আরোগ্য করবেন না। কুরআন যার যথেষ্ট হয়নি আল্লাহ তার যথেষ্ট হবেন না।' এই হচ্ছে কুরআনের মাহাত্ম্য। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

আমি কুরআন অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য রহমত ও আরোগ্যতুল্য।' *[সূরা ইসরা : ৮২]*

অভিধানবিদদের মতে এখানে مِنْ অব্যয়টি تبعيض তথা কিছু বুঝানোর জন্য আসে নি। বরং জিনস তথা 'সমগ্র' বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ সমগ্র কুরআনই আরোগ্যকারী।

ইমাম ইবনে কাইয়্যুম রহ. বলেন, আমি মক্কাতে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে যাই। সেখানে কোন ডাক্তারও পাইনি। তখন আমি নিজেকে সূরা ফাতিহা দিয়ে আরোগ্য করা শুরু করলাম। এতে খুব আশ্চর্যজনক ফল পেলাম। আমি জমজমের পানিতে কয়েক বার ফুঁক দিয়ে পান করলাম। এতে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম।

সুবহানাল্লাহ! পানিতেও কুরআন পাঠের প্রভাব পড়ে। কুরআন তেলাওয়াতের ফলে পানির বিন্দুকণা পরিবর্তন হয়ে যায়। এই তথ্য কোন মুসলমান দেন নি। বরং জাপানি পানিবিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেন, তিনি পানির পাশে কুরআনের সিডি বাজিয়েছেন। এর পর পানি পরীক্ষা করে দেখেন তার বিন্দুকণার মাত্রা পরিবর্তিত হয়েছে। পাশাপাশি গান শুনিয়েও দেখেছেন। কিন্তু তাতে কোন সাড়া মিলে নি। এই হচ্ছে কুরআনের আছর। সুবহানাল্লাহ!

কেউ যদি তেলে ফুঁ দিতে চায় তাহলে তা যাইতুন তেল হতে হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যাইতুন আহার কর এবং তা তেল হিসাবে ব্যবহার কর। কেননা, তা পবিত্র বৃক্ষ থেকে উৎসারিত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (আলোকিতকারী) জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা (মুমিনদের অন্তরে) যেন একটি দীপাধার (তাক), যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আভরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আভরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা প্রজ্বলিত করা হয় বরকতময় যাইতুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমও নয়, (বরং উভয়ের মধ্যবর্তী) অগ্নি ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তৈল উজ্জ্বল আলো। *[সূরা নূর : ৩৫]*

যাইতুন তেলে দুআ পড়ে শরীরে মালিশ করলে কার্যকরী প্রভাব ফেলে। উল্লেখ্য, এই সব ঝাড়ফুঁক করার জন্য সমগ্র কুরআনের হাফিজ হওয়া আবশ্যক নয়। বরং গুরুত্বপূর্ণ সূরা মুখস্থ থাকলেই যথেষ্ট।

ঝাড়ফুঁক একটি আমলে সালিহ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের উপকার করতে সক্ষম হলে সে যেন তা করে।'

তিনি সাহাবীদের শরীরে ফুঁক দিয়েছেন। এধরণের অনেক হাদীস আছে। তিনি রোগী দেখতে গিয়ে তার মাথায় বা বুকে হাত রাখতেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করে ঝাড়ফুঁক করতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন ইয়াহুদি জাদু করে তখন জিব্রাইল আ. একজন ফেরেশতাসহ তার নিকট আসেন। একজন মাথার পাশে আরেক জন পায়ের নিকট বসেন। একজন প্রশ্ন করেন, উনার কি হয়েছে? আরেকজন বলেন, তিনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম প্রশ্নকারী বলেন, কোথায় জাদু করেছে?

অপরজন উত্তর দেন, চিরুনী ও চুলে। এরপর জিব্রাইল আ. প্রিয় নবীর শরীরে ঝাড়ফুঁক করেন। এতে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

সুতরাং বুঝা গেল ঝাড়ফুঁক একটি নেককাজ। নবীগণ ঝাড়ফুঁক করেছেন। জিব্রাইল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঝাড়ফুঁক করেছেন। নেককারগণ একজন আরেকজনের ঝাড়ফুঁক করেন।

ঝাড়ফুঁকের আদাব

ঝাড়ফুঁকের সময় আপনার হাতকে শরীরের এমন স্থানে রাখবেন যেখানে রাখলে ব্যথা লাগে না। উদাহরণত রোগীর বুকের উপর, মাথায় বা কপালে রাখবেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ঝাড়ফুকের পদ্ধতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, এমন স্থানে হাত রাখবে যেখানে ব্যথা পায় না।'

তাই শরীরে যেখানে ব্যথা আছে সেখানে রাখতে পারবো না। তারপর এই দুআ পড়বো–

وَاَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ

সুন্নত হচ্ছে, আপনি রোগীর মাথায় হাত রেখে পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَايُغَادِرُ سَقَمًا

মস্তিষ্কে শতকরা ৯০ শতাংশ জলীয় পদার্থ। আর পূর্বে আলোচনা করেছি কিভাবে পানি কুরআন পাঠে প্রভাবিত হয়। একবার আমি কুরআনের প্রভাব নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করলাম। তখন একজন ইঞ্জিনিয়ার ভাই দাঁড়িয়ে বললেন, আমার কাছে প্রমাণ আছে। আমি বিদুৎতরঙ্গ বিশেষজ্ঞ।
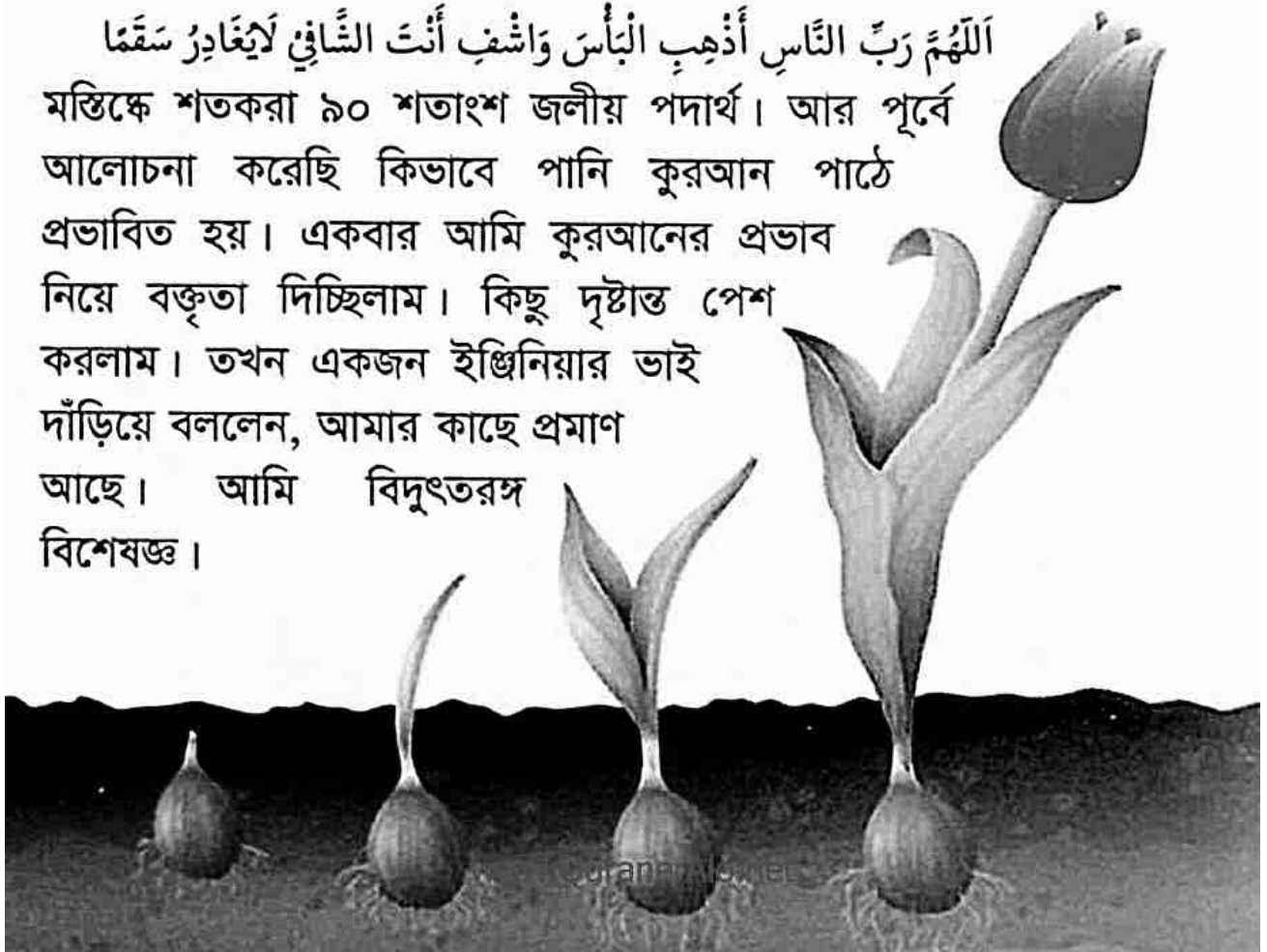
একবার আমি একটি সূক্ষ্ম মেশিন ও কিছু পানি নিলাম। পানি পরিমাপ করে দেখলাম তাতে কি পরিমাণ বিদ্যুতিক তরঙ্গ বিদ্যমান আছে। তখন স্বাভাবিক মাত্রায় পেলাম। এরপর আমি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলাম। এবার পরিমাপ করে দেখলাম তরঙ্গ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন, ক্যান্সার, হৃদরোগ, বন্ধ্যা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি। এসব রোগের অধিকাংশ কারণই হচ্ছে নজর লাগা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَكْثَرُ مَنْ يَمُوْتُ مِنْ أُمَّتِيْ بَعْدَ قَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدَرِهِ بِالْعَيْنِ

'আল্লাহর ফায়সালার পর আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক মারা যাবে নজর লাগার কারণে।' *[আল ফাতহুল কাবীর : ২৩০০]*

অনেকে গাড়ি এক্সিডেন্ট হয় কিন্তু এর প্রধান কারণ নজর। কিন্তু সবাই তা জানে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার বাগানে প্রবেশ করে বলল–

مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً

সে তার বাগান দেখে এত অহংকার করেছে যে, তাতে নজর লেগে গেছে। অতঃপর বায়ু এসে তা ভষ্মীভূত করে দেয়। ফলশ্রুতিতে সে আক্ষেপ করতে লাগল, হায় আমি কি করলাম।

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

অথচ তার বন্ধু তাকে শুকরিয়া আদায় করতে বলেছিল। ইরশাদ হয়–

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

কেন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশকালে বলো নি, আল্লাহ যা চান (তাই হয়) আল্লাহ ছাড়া কোন কোন ক্ষমতা নেই।

[সূরা কাহাফ : ৩৯]

তবে নজর লাগার বিষয়টিকে আমি প্রাধান্য দিয়ে ডাক্তারদের মতবাদকে খন্ডন করছি না। ডাক্তারদের চিকিৎসাপদ্ধতিও ঠিক আছে। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, আমাদের শরয়ী দোয়া, আযকারও পাঠ করতে হবে যেন নজর-জাদুটোনা ইত্যাদি থেকে রেহাই পাই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

'যদি তাকদীরকে কোন জিনিস অতিক্রম করতে পারতো তাহলে চোখের নজর তা করতে পারত।' *[সহীহ মুসলিম : ৫৮৩১]*

হযরত ইয়াকুব আ. যখন দুর্ভিক্ষের সময় তার সন্তানদের মিশরে খাদ্য সংগ্রহ করতে প্রেরণ করেন তখন বলেছিলেন, হে আমার সন্তানরা তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। বরং তোমরা বিভিন্ন দরজা দিয়ে (পৃথক হয়ে) প্রবেশ করবে।' *[সূরা ইউসুফ : ৬৭]*

মিসরে অনেক দুর্গ ছিল। দুর্গের অনেকগুলো দরজা ছিল। এদিকে ইয়াকুব আ. এর পুত্রদের চেহারা অবয়ব সুন্দর ছিল। পিতা তাদের উপর বদনজর লাগার আশংকা করলেন। অথচ স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, পিতা যদি তার সন্তানদের দূরবর্তী কোন দেশে প্রেরণ করেন তখন উপদেশ দেন তোমরা পৃথক হবে না। বরং একত্র থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বদনজর থেকে হেফাজতের জন্য ইয়াকুব আ. তাদের এই পরামর্শ দেন।

ঝাড়ফুঁকের শর্ত

তা কুরআন হাদীস থেকে হতে হবে। অনেকে শিরকি কথা সম্বলিত মন্ত্র পড়ে ঝাড়ফুঁক করে। অনেকে জীনকে (সাহায্যকারী হিসাবে) ডাকে। কেউ যদি কুরআনের সাথে অন্য কোন কথা মিলিয়ে দেয় তাহলে তা সম্পূর্ণ হারাম। সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, যেই ঝাড়ফুঁকে এমন কোন কথা থাকে যা বুঝা যায় না বা আল্লাহ ছাড়া জিনকে সাহায্যার্থে আহ্বান করা হয় তা সম্পূর্ণ হারাম।

আমি চাই আপনারা উম্মতের সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মিরাজ রজনীর ঘটনাপ্রসঙ্গে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই রাতে আমি একজন নবীর সাথে বিশাল একটি দল দেখলাম। আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সত্তর হাজার যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

এদিকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু বলে ঘরে চলে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম এই বিষয়ে পরস্পর কথা বলতে লাগলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, তারা সেই সমস্ত লোক যারা কোন কিছুকে অশুভ মনে করে না, ঝাড়ফুকঁ তালাশ করে না, নিজেদের দেহে দাগ কাটে না এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রাখে।' (হাদীসের) لَا يَسْتَرْقُوْنَ-র অর্থ হচ্ছে, অন্য থেকে ঝাড়ফুঁক চায় না।

সুতরাং আপনি আপনার ও রবের মাঝে কোন দ্বিতীয় মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন। সরাসরি আপনি নিজেই ঝাড়ফুঁক করবেন। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় বিনিময় ব্যতীত আপনার দেহে ঝাড়ফুঁক করে তাহলে তা বৈধ হবে। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَّنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

যে তার ভাইকে উপকার করতে সক্ষম সে যেন তা করে।

[বুখারী ও মুসলিম]

তবে উলামায়ে কেরামের মতে, আপনি যদি কাউকে বলেন, হে ভাই, আমাকে একটু ফু দাও' একথাকে মাকরূহ মনে করেন না। কিন্তু উত্তম হচ্ছে, মানুষ নিজেই নিজের ঝাড়ফুঁক করবে। কেননা, শরয়ী ঝাড়ফুঁক একটি ইবাদত।

আর আমার নিজের দোয়া অপরের দোয়া থেকে উত্তম। কেননা এক্ষেত্রে আমি নিজেই আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তার সামনে দীনতা প্রকাশ করছি। তদ্রূপ আমার পিতামাতা, স্ত্রী সন্তান ও ভাইবোনের জন্য দোয়া পাঠ বেশী কার্যকরী হবে অপর ব্যক্তির তুলনায়। কেননা, সে তো শুধু পড়েই যাবে। এই খেয়াল করবে না যে, রোগী সুস্থ হয়েছে কি না। সুস্থ হোক বা না হোক, তাতে তার কিছু আসে যায় না।

সহীহ বুখারীতে এসেছে, সাহল ইবনে হুনাইফ রা. গোসল করছিলেন। তার পাশ দিয়ে আমের বিন রাবিয়া অতিক্রম করেন। সাহল রা. এর দেহের চামড়া সুন্দর শুভ্র ও কোমল ছিল। গোসলের সময় যথাসম্ভব সতর ঢেকে রাখে। আমের রা. তার পিঠ ও পা দেখে ফেলল। তখন তিনি বলে উঠলেন, 'আমি জীবনে কখনো এমন সুন্দর চামড়া দেখিনি। এমন চামড়া কোন লুক্কায়িত কুমারী কন্যারও হয় না। যেন এটা এমন কুমারীর কোমল দেহ যাকে তার পরিবার জন্মের পর থেকে সূর্যের আলো, উষ্ণতা ও শৈত্য থেকে দূরে রেখেছে।'

এই কথা বলার পর সাহল রা. বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। তারা তাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তার নজর লেগেছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কাকে দায়ী মনে করো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আমর বিন রবিয়াকে দোষারোপ করছি। কেননা, সে তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এই বলে মন্তব্য করেছিল, 'কুমারীর দেহও এত সুন্দর নয়।' তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের এক ভাই কেন আরেক ভাইকে হত্যা করে ফেলে?

কেন তুমি (তার) মঙ্গল কামনা করলে না? তার জন্য গোসল কর।'

তখন আমের রা. গোসল করলে সেই পানি সাহল রা. এর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তখন তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। মনে হলো, তিনি যেন কোন বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

আলোচ্য হাদীসে هَلَّا بَرَّكْتَ অর্থ হচ্ছে : مَا شَاءَ اللّٰهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ কেন বললে না?

এখানে একথাও লক্ষণীয় যে, নজর লাগার বিষয়টিতে আবার অতিরঞ্জন করাও ঠিক হবে না। আমাদের জীবনে আপতিত সব বিপদকেই আমরা নজর বলে উপেক্ষা করতে পারি না। উদাহরণত কোন ছেলে পড়াশুনা ঠিকমত করে না, কিছুই মনে রাখতে পারে না। ফলে পরীক্ষায় ফেল করে। এটা কিন্তু বদনজর নয়। বরং তার মেধাহীনতা ও অলসতার ফল।

আবার কেউ ব্যবসায় লোকসানের শিকার হয়। এটাও কিন্তু বদনজরের কারণে নয়। বরং তার ব্যবসা পরিচালনার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। সুতরাং মানুষকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বদনজর লাগার কিছু আলামত

বদনজর লাগার কিছু আলামত আছে। যেমন তার শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বের হবে। ঠান্ডা পরিবেশেও তার দেহ থেকে ঘাম ঝরে। সে বেশি বেশি ভুলে যায়। অবসাদ, অলসতা তাকে আচ্ছন্ন করে। শরীরে ব্যথা অনুভবের পাশাপাশি বায়ু নির্গত হয়। উভয় পার্শ্ব, বুকের নিচে চুলকানি সৃষ্টি হয়। এই সব লক্ষণে ঝাড়ফুঁক করা হলে পরবর্তীতে কান্না ব্যতিত চোখ থেকে অশ্রু ঝরে। এটা অনেক সময় জাদু বা জিনের আছরের কারণেও হয়ে থাকে।

সুতরাং কেউ বদনজরে আক্রান্ত হলে নিম্নের আয়াতসমূহ পাঠ করে ফুঁ দিতে হবে। আয়াতগুলো হচ্ছে :

সূরা মুলকের প্রথম আয়াত–

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এবং সূরা মুলকের ৪নং আয়াত–

يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

সূরা কলমের শেষ আয়াত–

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

সূরা ইউসুফের ৬৭নং আয়াত–

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

এছাড়াও সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস, আয়াতুল কুরসী, সূরা ফাতিহা এবং আয়াতে শিফা পাঠ করবে। আয়াতে শিফা হচ্ছে সূরা ইসরার ৮২নং আয়াত–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

এইসব আয়াত পড়ে নিজের উপর ফুক দিবে। উদাহরণত নিজের হাতে ফুঁক দিয়ে সারা শরীরে মোছে দিবে। অথবা বুকের উপর ফুঁক দিবে। আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করবে। নিজে পড়তে না পারলে আরেকজন পড়বে।
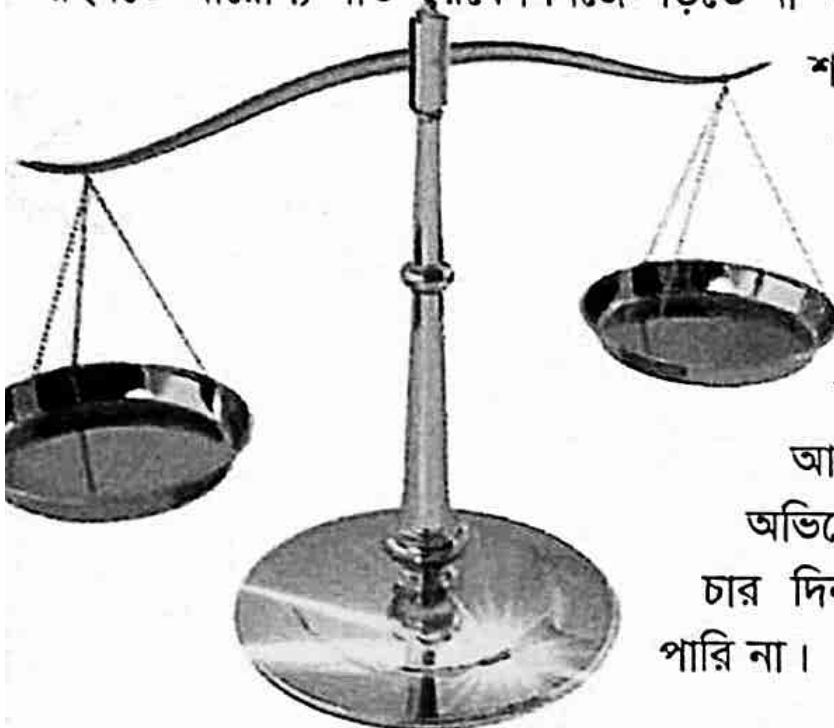
শরয়ী ঝাড়ফুঁক যে কোন লোকের উপর করতে পারেন। একবার আমি ইউরোপের কোন এক দেশে ছিলাম। সেখানে নামাজের পর এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে অভিযোগ করল, শায়খ, আমি চার দিন ধরে একটুও ঘুমাতে পারি না।

দশ মিনিট ঘুমালে ভীত বিহ্বল হয়ে জাগ্রত হয়ে যাই।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিন ধরে এই অবস্থা? সে উত্তর দিল চার বছর ধরে। কিন্তু চার দিন ধরে একটুও ঘুমোতে পারছি না।

তখন সে আমার পাশে বসল। আমি তার মাথায় হাত রাখলাম এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করে ফুঁক দিলাম। পরের দিন সে এসে হাসিমুখে বলল, 'আজকের রাতেই কেবল আমি আট ঘণ্টা লাগাতার ঘুমাতে পেরেছি।'

আল্লাহ্ মহান!

আমি সে দেশ থেকে চলে আসার সময় সে একটি ব্যাগ নিয়ে আমার সামনে এসে অনুরোধ করল, এই ব্যাগে আমার স্ত্রী তার মালিকানাধীন সমস্ত স্বর্ণ-অলংকার রেখে আপনাকে উপহার দেওয়ার জন্য বলেছে। আপনার দোয়ার বদৌলতে যখন সে আমার শান্তিতে ঘুম প্রত্যক্ষ করল, তখন খুশী মনে সব স্বর্ণ-অলংকার আপনাকে দেওয়ার জন্য এই ব্যাগে ভরে দিয়েছে।' কিন্তু আমি কিছুই গ্রহণ করি নি। চিন্তা করুন, একটি পরিবার কত খুশী হয়েছে। অথচ লোকটি সামান্য পাঁচ মিনিটও ঘুমাতে পারে নি। এভাবে আমরা অপর ভাইকে খুশী করতে পারি।

তেলে ফুঁক দিলে যাইতুন তেলে দিতে হবে। ইন্টারনেটে শিফা ওয়েবসাইট এই তেল বিনামূল্যে বিতরণ করে। তারা জমজমের পানিও বিতরণ করে।

তেলে ঝাড়ফুঁক করার নিয়ম হলো, প্রথমে মুখ তেলের পাত্রের কাছে নিবে।

তারপর সূরা ফাতিহার চার আয়াত পড়ে ফুঁ দিবে। তারপর ৫-৬ আয়াত পরে ফুঁ দিবে। সর্বশেষ ৭ নং আয়াত পড়ে ফুঁ দিবে। এভাবে সূরা ফাতিহা সাত বার পড়বে। তারপর আয়াতুল কুরসী পড়ে ফুঁ দিবে। আয়াতুল কুরসী সম্ভব হলে সাত বার পাঠ করে ফুঁ দিবে। এরপর সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস পড়ে ফুঁ দিবে। সম্ভব হলে প্রত্যেকটি সাত অথবা তিনবার পড়ে পড়ে ফুঁ দিবে। এরপর এই তেল রোগী শরীরে ব্যবহার করবে।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো বদনজর ও জাদুর কারণে সৃষ্ট রোগে পড়া যাবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এই আয়াতগুলো কেন নির্বাচন করা হলো। এর উত্তর হলো, এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা আছে। আমি এই আয়াতগুলো যখন বদনজরের ক্ষেত্রে পড়েছি তখন খুব বেশি উপকার পেয়েছি। কাউকে জিনে ধরলে সে ক্ষেত্রে সূরা সাফফাতের প্রথম অংশ পড়া যেতে পারে।

সুবহানাল্লাহ! মুসলিমের জীবনে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি, ক্ষতি সম্ভাবনা নেই। তবে বর্তমানে আমাদের যে বেহাল দশা তা ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকার কারণে। মানুষ যদি কোন আশ্চর্য বস্তু বা দৃশ্য দেখে 'মা-শাআল্লাহ তাবারাকা তায়ালা' পড়ে তাহলে তাতে বদনজর লাগবে না।

তাই আমাদের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের সাথে লেগে থাকতে হবে। এমনকি যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হই তা দুআ পড়ে সংশোধন করে নিব।

শরয়ী যিকির আযকার আল্লাহর হুকুমে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধায় তিনবার নিম্নের দুআ পড়বে তাকে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। দুআটি এই–

بِاسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তুমি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস ও মুওয়াওওযাতাইন তিনবার করে পড় তোমার সকল কিছুর জন্য যথেষ্ট হবে।'

অদ্রূপ সাইয়্যেদুল ইসতিগফার পড়লেও লাভ হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারা শেষ দুই আয়াত পড়বে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে (সকল বিপদাপদ থেকে)

অন্যত্র বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ কালে নিম্নের দুআ পড়বে সে সেখান থেকে প্রস্থান করার আগ পর্যন্ত কোন কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। দুআটি এই–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

এইসব দুআ, আযকার মানুষকে সুরক্ষা দিবে। ব্যক্তিগতভাবে নিজের চিকিৎসা করার জন্য পানি বা তেলে ফুঁক দিয়ে সেই তেল বুকে মালিশ করতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এতে উপকার অবশ্যই হবে। এমনকি বন্ধা নারী-পুরুষ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিও সুস্থ হতে পারবেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন কোন রোগ নেই যার প্রতিষেধক আল্লাহ নাজিল করেন নি।' অর্থাৎ প্রত্যেক রোগেরই চিকিৎসা আছে। তাই আপনি আক্রান্ত স্থানে ফুঁ দেওয়া তেল ও পানি ব্যবহার করতে পারেন।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(৭)
অপরকে খুশী করুন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم * فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

ইতিপূর্বে আমি মসজিদের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেছি। মসজিদে কিতাবাদি সংগ্রহ, পাঠাগার স্থাপন, ছাত্রদের মাঝে বইপত্র বিতরণ করে সমাজে অবদান রেখে যাওয়ার কথা বলেছি।

এছাড়াও রাতে বন্ধ হয়ে যাওয়া হোটেল থেকে ফেলে দেওয়া অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহ করে বুভুক্ষ ফকির-মিসকিনদের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা করেছি।

আজকের উদ্যোগটা হবে শুধুমাত্র আত্মিক উদ্যোগ। এটা করতে সামান্য টাকা-পয়সা, ধন সম্পদের প্রয়োজন নেই। আপনার কোন কষ্টও করতে হবে না। এই অভিযোগ করতে পারবেন না যে, 'দেখুন ভাই, আমি হোটেলে যেতে লজ্জা পাই। সুতরাং আমার পক্ষে এই উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব নয়।' অথবা কাউকে একথা বলতে হবে না, 'ভাই আমাকে অতিরিক্ত খাবারগুলো দিয়ে দেন।'

তদ্রূপ মহিলাগণ এই অনুযোগ করতে পারবেন না যে, 'আমি মসজিদে যেতে পারছি না। তাই আমার পক্ষে এই কাজ সম্ভব নয়।' বরং আজকের কাজটি যে কেউ করতে পারেন। সেই সহজসাধ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে, অপর ভাইকে খুশী করা। সুতরাং আসুন অপরকে খুশী করতে তৎপর হই। শুধুমাত্র মুসলিমদের সাথেই নয় বরং সকল মানুষের সাথে সৌজন্যবোধ প্রদর্শন করতে হবে।

এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে পেলাম যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রহমতের বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং পবিত্র কুরআন-হাদীসে যে ইহসান (অনুগ্রহ) প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে তা শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং কাফেরদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।

[সূরা আম্বিয়া : ১০৭]

অর্থাৎ আপনি রহমতস্বরূপ পৃথিবীর সকল মুসলিম-অমুসলিম প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ

এমনকি জড় পদার্থের জন্য। কোন গবেষক যদি প্রিয় নবীর আচার- ব্যবহার গবেষণা করেন, তাহলে দেখতে পাবে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দয়া ও মহানুভবতা শুধু মুসলিমদের সাথে খাস ছিল না। বরং সবার সাথেই উত্তম আদর্শিক ব্যবহার করেছেন।

একবার জনৈক ইয়াহুদি তাকে খাবারের দাওয়াত দিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুশী করার জন্য তার ডাকে সাড়া দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মনে এই চিন্তা উদ্রেক হয়নি যে, আমি কাফেরের ঘরে যাবো না। তাকে খুশী করলেই কি না করলেই বা কি আসে যায়।'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুচ্ছ প্রাণীকে খুশী করতে তৎপর ছিলেন। একবার তিনি এমন দুই লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যারা দুটি উটের উপর সাওয়ার হয়ে কথা বলছিল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

لَاتَتَّخِذُوْا الدَّوَابَّ كَرَاسِيَّ

প্রাণীকে চেয়ার হিসাবে গ্রহণ করো না। *[মুসনাদে আহমাদ : ১৫৬৫০]*

কেননা, এতে বাকহীন প্রাণীর কষ্ট হয়। কথা যদি বলতেই হয় তাহলে নেমে কথা বল। কেননা, বাহনের বোঝা কম হলে পশু খুশী হয়। কিন্তু সে তা মুখে প্রকাশ করতে পারে না। তাই সে মুখে বলবে না, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন্যবাদ।' বরং অনুভূতিতে আনন্দ প্রকাশ করবে। তদ্রূপ সে যখন খাদ্য-পানীয় পায় তখন আনন্দ, উল্লাস ও তৃপ্তি অনুভব করে।

আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কিভাবে অপর ভাইকে খুশী করবো। এব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস কি কি? এই কর্মের প্রতিদানই বা কি? অপরের সাথে কৌতুক-রসিকতার সীমা কতটুকু?

উল্লেখ্য, অনেক লোক হাসি ঠাট্টা করে জেলখানায় গেছে। অনেক অতিরঞ্জন হাসি-তামাশা হত্যা, ঝগড়া-বিবাদের মত অন্যায় কাজে লিপ্ত করেছে। তাই আমাদের জানতে হবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটুকু হাস্য রসিকতার অনুমতি দিয়েছেন। হাসি তামাশার কোন পদ্ধতি বৈধ? এবং তার সীমা রেখাই বা কতটুকু?

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সহমহির্মার জন্য হাসি ঠাট্টা করতেন। কখনো বা ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে, কখনো দাওয়াতি কাজ হিসাবে, কখনো তারবিয়াতের নিমিত্তে, কখনো বিপদগ্রস্তকে সহমর্মিতা জানাতে, কখনো বহিঃবিশ্বে ইসলামি সংস্কৃতি প্রচারের নিমিত্তে। এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা অপর ভাইকে আনন্দ দানের নিমিত্ত অনেক কিছু করতে পারি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আনন্দ-ফুর্তি, আন্তরিকতা মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

আল্লাহই হাসান এবং কাঁদান। *[সূরা নজম : ৪৩]*

ইসলাম হাসি ও আনন্দে পরিপূর্ণ একটি ধর্ম

হাদীসে এসেছে–

تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ صَدَقَةٌ

'তোমার ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসা সাদাকা।'

[ফাতহুল কাবীর : ৫২৮০]

وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى قَلْبِ أَخِيْكَ سُرُوْرًا

'আল্লাহর নিকট উত্তম আমল হচ্ছে, তোমার ভাইয়ের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করানো।'

[ফাতহুল কাবীর : ২০৮৫]
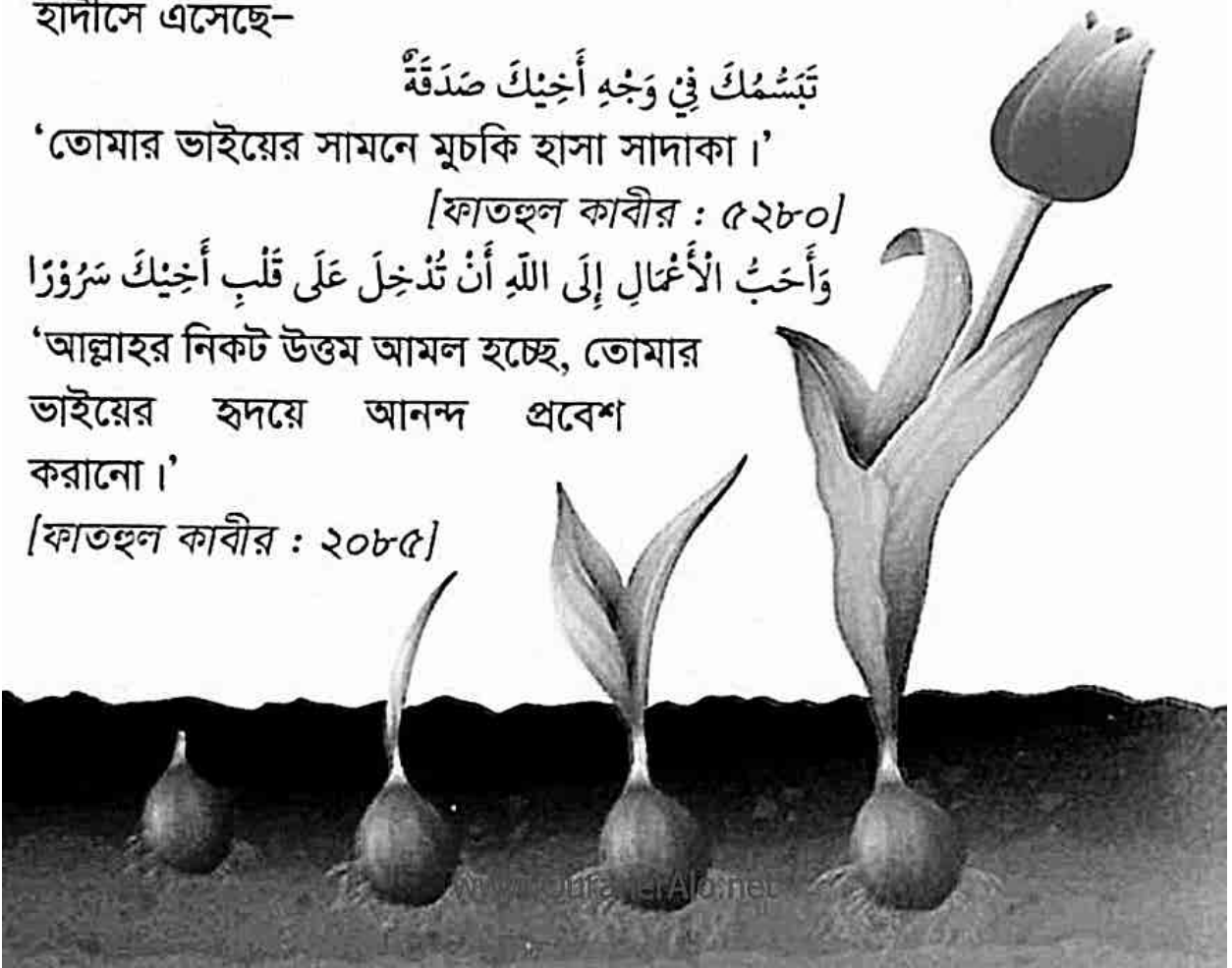
অপরকে আনন্দিত করা বিষয়ক অনেক হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনটি কাজ আল্লাহর নিকট খুব প্রিয়। তোমার মুসলিম ভাইকে খুশী করা। তার ঋণ আদায় করে দেওয়া। তাকে রুটি আহার্য হিসাবে দেওয়া।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফরজ আদায়ের পর আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে কোন মুসলিম ভাইকে খুশী করা।

ইমাম তাবরানী রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে অন্য মানুষের উপকার করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সৃষ্টিজীব আল্লাহর পরিবারতুল্য। যে সৃষ্টিজগতের প্রতি বেশী কল্যাণকামী সে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়।

হযরত আয়েশা রা. থেকে হাদীসে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইকে আনন্দিত করল, আল্লাহ তাকে বিনিময়স্বরূপ জান্নাত প্রতিদান দিয়েই খুশী হবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইকে আনন্দিত করল, আল্লাহ তায়ালা তার এই কর্মের বদৌলতে দুনিয়াতে এমন একটি সৃষ্টিজীব তৈরী করে দিবেন যে তার দুনিয়ার জীবনে আপতিত বিপদাপদ দূর করে রাখবে। অধিকন্তু কিয়ামত দিবসে তার নিকটবর্তী থাকবে। যদি তার উপর কোন বিপদ আসতে দেখে তখন বলবে, 'সাবধান, তোমার কোন সুযোগ নেই। ফিরে যাও।' সে দুনিয়ার বিপদাপদকে দূরে রাখবে এবং আখেরাতের বিপদকেও।

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষ যদি এই প্রত্যাশা করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বিপদাপদ থেকে দূর রাখুক, তার সন্তানদের রোগমুক্ত রাখুক, তার জান-মাল হিফাজত করুক। তাহলে তার উচিত অপর ভাইকে খুশী করা। তাকে যথাসম্ভব সাহায্য, সহযোগিতা করে এমন সুন্দর জীবন উপহার দেওয়া যা সে নিজের বেলায় পছন্দ করে। কোন ধরণের স্বার্থপরতা প্রশ্রয় দিতে পারবে না। তার অবস্থান নিচের কবির ন্যায় স্বার্থপর হতে পারবে না যে বলেছে–

اذا بت ريانا فلا نزل القطر

আমি একা পরিতৃপ্ত, সিঞ্চিত থাকলেই যথেষ্ট। অন্যরা তৃষ্ণায় মারা গেলেও তাতে কিছু আসে যায় না।

বরং তাকে এই কবির আদর্শ গ্রহণ করতে হবে যে বলেছে–

لو انى حييت فى الخلد فردا لما * احببت فى الخلد انفرادا
فلا هطلت على ولا بأرض * سحائب ليس تنتظم البلادا

র্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে একা জান্নাতে বেশ করাবো। তখন আমি উত্তরে বলবো, না প্রভু, আমার সাথে অন্যান্য ানুষদেরও প্রবেশ করান।' তিনি যদি আমাকে বলেন, 'তোমার ক্ষেতে শুধু বৃষ্টি বর্ষিত হবে।' তাহলে আমি বলবো, না প্রভু, আপনি সকলের ক্ষেতেই বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

স্মর্তব্য যে, মানুষের অন্তরে হাসি ফুটানো দুনিয়ার সর্বোত্তম কাজ। ফরয কর্মের পর আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় একটি কর্ম। এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার শিক্ষণীয় ও নির্ভরযোগ্য ঘটনা আছে। ৫০ বছরের এক ব্যক্তি দূরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

চিকিৎসকরা তার চিকিৎসায় নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। তারপর জনৈক শায়েখ তাকে পরামর্শ দিলেন, তুমি কোন গরীব পরিবারের দেখ-ভালের দায়িত্ব নাও।

কথামতো লোকটি দরিদ্র পরিবারের খোঁজ করতে করতে এমন এক মহিলার সন্ধান পেলেন যার সাথে তিনটি ইয়াতিম শিশু আছে।

লোকটি কর্মচারীকে মহিলার বাসায় পাঠালেন। কর্মচারীরা সকাল থেকে তার বাসা উন্নত খাবার-দাবার, আসবাবপত্রে পূর্ণ করতে লাগল। এমনকি আসরের আযানের পূর্বে দরিদ্র বিধবা মহিলার ঘর উন্নতমানের সব কিছুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কর্মচারী প্রত্যাবর্তনকালে মহিলাকে এই দোয়া করতে শুনল, 'আয় আমার রব! যে ব্যক্তি আমার হৃদয় আনন্দে ভরে দিয়েছে তুমি তার হৃদয় আনন্দে ভরে দাও।'

এদিকে কর্মচারী আসরের আজানের পর মালিকের বাসায় ফিরে আসল। কর্মচারী ফিরে এসে দেখল তার শয্যাশায়িত রুগ্ন মালিক আনন্দচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। মালিক কর্মচারীকে মহিলার দুআর সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

সে উত্তর দিল, আসরের আজানের সময় মহিলা দুআ করেছিল। মালিক বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি অনুভব করলাম যেন কোন ফেরেশতা আমার বক্ষ আসরের আজানের সময় মুছে দিচ্ছে। তারপর তখনই সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম যা তুমি এখন দেখছো।

এই কাহিনী প্রমাণ বহন করে অপরকে খুশী করার গুরুত্ব কত বেশী। এক ওমানি শিশুকে নিয়ে আমেরিকায় চিকিৎসার জন্য যাওয়া হল। ডাক্তাররা তার কলিজা পরিবর্তন করে দিয়েছে। তার পাকস্থলীতে সমস্যা ছিল। কিন্তু দোয়া ও দান সাদাকার বদৌলতে সে পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করে। এটা দেখে ডাক্তারগণও আশ্চর্য হয়ে যায়।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, শায়খ, এগুলো বিজ্ঞানসম্মত নয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এগুলো তো সমর্থন করে না।

আমি বলবো, হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক আছে। আমরা শিক্ষিত সমাজ। ভার্সিটির ডক্টরগণ এমন সাধু দরবেশ নন যে, যা শুনেন তা-ই মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিবেন। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে অনেক সময় এমন অনেক কিছু আপনার সামনে প্রকাশ পাতে পারে যা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। সেটা শরীয়তের দলিল দ্বারা সমর্থিত। আপনি যদি শরীয়তে বিশ্বাসী হোন তাহলে দুর্লভ ব্যতিক্রম বিষয়টিকেও সমর্থন করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, দুআ আশ্চর্য কার্যকারিতা সৃষ্টি করে। তাই কেউ সেই ব্যক্তির ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারবে না যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল কিন্তু যখন দুআ কবুলের সময় দুআ করা হয় তখন সে সুস্থতা লাভ করে।

যেই সত্তা পাদ্বয়কে অবস হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনিই পুনরায় বলেছেন, 'আবার চল।' যেই সত্তা ব্রেনকে পাগল হওয়ার জন্য বলেছেন তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন 'সুস্থ মেধার অধিকারী হতে।' যেই সত্তা চোখকে অন্ধ হতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনিই চক্ষুষ্মান হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই করেন।

কাজেই আপনি মনে করবেন না, কেউ যদি আপনাকে বলে 'আল্লাহ আপনাকে খুশী করুক যেভাবে আপনি আমাকে খুশী করেছেন'-এটা অনর্থক কথার বাহুল এবং সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই নয়। হতে পারে তার দুআ আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন।

আপনি হয়ত গ্যাস স্টেশন (ফিলিং) থেকে গাড়িতে গ্যাস ভরলেন। তারপর কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিল কত এসেছে? সে বলল, উনিশ রিয়াল। আপনি তাকে বিশ রিয়াল দিলেন। এতে সে খুশী হলো। আপনার এই এক রিয়ালের সাথে আরো কয়েকজনের

রিয়াল মিলে পরিশেষে পঞ্চাশ/একশত রিয়াল পূর্ণ হবে। এই বখশিশে কর্মচারীটি খুশী হবে। নিঃসন্দেহে এটা এমন এক মহৎ কর্ম যার প্রতিদান আপনি প্রত্যাশা করেন না।

মাঝেমধ্যে হাসপাতালে গেলে অনেক নার্সকে দেখি গাইনি বিভাগের সামনে দাড়িয়ে থাকে। অনেক সময় গর্ভবতী মহিলা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে থাকেন। সন্তান ভূমিষ্ট হলে দৌড়িয়ে গিয়ে মোবাইলে স্বামীকে সুসংবাদ দেয়। তারা এক্ষেত্রে (আগে সুসংবাদ প্রদান নিমিত্ত) পুরষ্কার, বোনাস প্রত্যাশা করে। তারা কিন্তু প্রতিদানের প্রত্যাশায় অপরকে খুশী করাল। আর আপনি যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, বিনা প্রতিদান ও কোন রকম কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা ব্যতীত অপরকে খুশী করাবেন তখন নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হিসাবে গণ্য হবে।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা স্বভাবজাত প্রকৃতি অনুযায়ী। অবস্থার পরিপেক্ষিতে হাসি ও আনন্দ যেমন আছে, তেমনি আছে কান্না ও বিষাদ।

ইবনে আব্বাস রা. একজন বিদ্বান সাহাবী ছিলেন। তার কাছে সাধারণ লোকেরা ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতো। লোকজন অতিরিক্ত মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে মানসিক চাপে পড়ে যেতেন। তখন তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে গল্প, কবিতা শোনাও যেন মানসিক প্রশান্তি লাভ করি।' তাই আসুন আমরাও আমাদের ভাইদের মানসিক আনন্দ দেই।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য লোকদের আনন্দ দান নিমিত্ত যেসব কৌতুক করেছেন, আমরা সেগুলো স্মরণ করতে পারি।

জাবের বিন সামুরা রা. বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামায পড়ে সূর্য উদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে জিকির করতেন। সাহাবায়ে কেরামও বসতেন। তারা কখনো জাহিলিয়াতের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ স্মরণ করে হাসা হাসি করতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন। তিনি তাদের ধমক দিয়ে বলতেন না, সাবধান! মসজিদে হাসছো? তাও আবার জাহিলিয়াতের গল্প বলছো? তোমরা কেন মসজিদের কোণায় বসে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ, কান্নাকাটি করছে না?

সাহাবায়ে কেরাম কিছু সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে বসতেন। আবার তাদের দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যেতেন। তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতেন, কাউকে একই অবস্থায় সর্বদা চাপিয়ে রাখা সঙ্গত নয়।

হযরত হানযালা রা. একবার এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে।' প্রিয়নবী সা বললেন, কি হয়েছে? তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমরা আপনার দরবারে থাকি তখন আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়। এমন কি আমরা যেন জান্নাত-জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখছি। কিন্তু এখান থেকে ফিরে সাংসারিক জীবনের মায়াজালে লিপ্ত হয়ে যাই। স্ত্রী-সন্তানদের সাথে হাস্য রসিকতায় লিপ্ত হই। তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই।' তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

يَا حَنْظَلَةُ ! سَاعَةً سَاعَةً

অর্থাৎ কিছু সময় ইবাদতে আর কিছু সময় আত্মিক বিনোদনে ব্যয় কর। *[তিরমিজি : ২৫১৪]*

এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য।
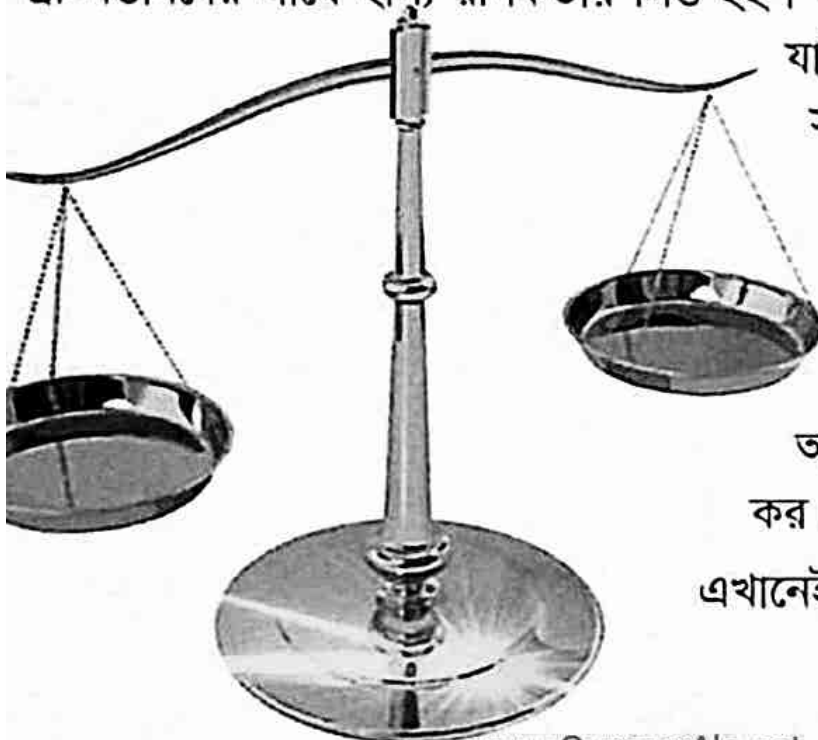
পবিত্র কুরআনে এসেছে–

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ

তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান। *[সূরা নাজম : ৪৩]*

হযরত হানযালা রা. মনে করেছিলেন, সর্বদা হৃদয়ে আল্লাহভীতি বিদ্যমান থাকতে হবে। ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকতে হবে। চব্বিশ ঘন্টা জান্নাত-জাহান্নামের ফিকিরে থাকতে হবে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে বলেন, 'হে হানযালা! তোমরা আমার নিকট যে হালতে থাক সর্বদা যদি এই হালতে থাকতে তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত।'

অর্থাৎ তোমরা ফেরেশতায় রুপান্তরিত হয়ে যেতে। সুতরাং তোমরা মানুষ। কাজেই তোমাদের হাসি ও আনন্দ করা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের সাথেও রসিকতা করতেন। চাচা আব্বাসের সন্তান কাসির, উবাইদুল্লা ও আব্দুল্লাহকে মাঝে মধ্যে এক জায়গায় থামাতেন। তারপর তিনি দূরে চলে গিয়ে বলতেন, যে দৌড়িয়ে আগে আমার কাছে আসতে পারবে সে এই এই (পুরস্কার) পাবে

চিন্তা করুন, শিশুদের বলছেন, কে আমার কাছে আগে আসতে পারবে? বাচ্চারা তখন কি করবে? নিশ্চয়ই তারা দৌড়াবে। এমনকি তার উপর গিয়ে পড়বে।
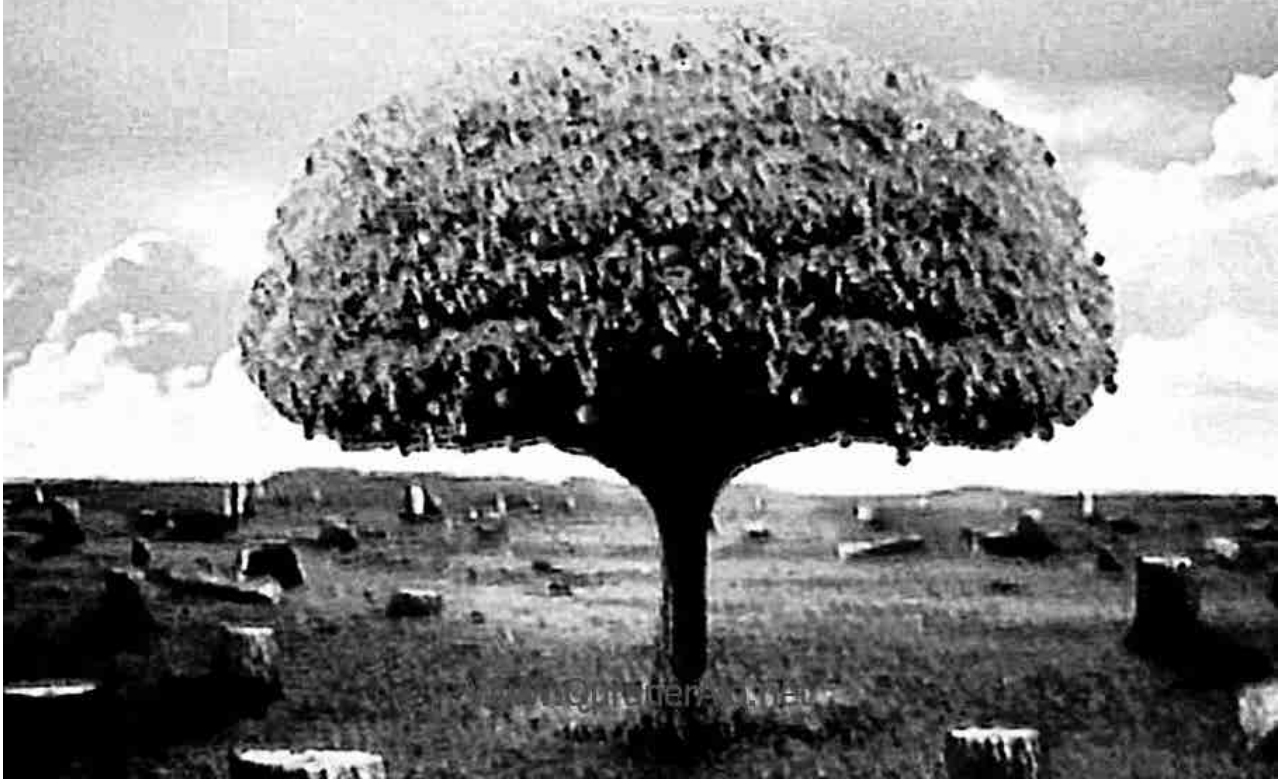
হাদীসে বর্ণিত আছে, বাচ্চারা কতকে তার কাঁধে চড়তো আবার কতকে তার পিঠে উঠে বসত। তিনি তাদের সাথে খেলাধুলা করতেন। অথচ এই মনে করতেন না যে, 'আমি একজন নবী, বাচ্চাদের সাথে হাসি তামাশা করবো!!'

তিনি নবী ছিলেন ঠিক, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে মানবিক বৈশিষ্ট্য পিতৃস্নেহ বিদ্যমান ছিল।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রসিকতার কারণ

অনেক সময় তিনি তার সামনের ব্যক্তিকে তারবিয়্যাত দেওয়ার নিমিত্ত রসিকতা করেছেন। তাকে রসিকতার ছলে উপদেশ দিয়েছেন। হাদীসে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

কতিপয় ভাইয়ের মহৎউদ্যোগ

আমি এমন কতিপয় ভাইয়ের নাম জানি যারা শ্রমিকদের হৃদয়ে আনন্দ প্রদানে কাজ করে যাচ্ছেন। একটি রেঁস্তোরা তাদের সাথে সহায়তা করে। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অনেক সাধারণ শ্রমিক আছে যারা দামী শরবত পানীয় ও মিষ্টির নাম শুনেছে। কিন্তু কখনো তার স্বাদ আস্বাদন করে নি। অথবা কখনো বড় কোন হোটেলে প্রবেশ করেনি। এসব দ্বীনি ভাইয়েরা সেই হোটেল মালিকের সাথে সমঝোতা করে এই কাজে এগিয়ে এসেছেন। হোটেলে এনে অনেক শ্রমিককে বিনামূল্যে উন্নত পরিবেশে দামি খাবার পরিবেশন করেন। অধিকন্তু সামান্য শ্রমিকদের তাদের মূল্যবান গাড়িতে উঠাতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তারা শ্রমিকদের নগদ টাকা পয়সা দেওয়ার পরিবর্তে এই কাজ করেন। তারা উত্তর দিয়েছেন, এসব সাধারণ লোক যেন এমন অভিজাত হোটেল ও গাড়িতে প্রবেশ করে তাদের মনের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে। এটা তাদের অধিক আনন্দ উপহার দিবে নগদ টাকা পয়সা দেওয়া থেকে। আর বাস্তবে দেখাও গেছে যে, এর ফলে শ্রমিকরা অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করেন।

এখানে আমার আরেকটি ঘটনা স্মরণ হয়ে গেল। জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমি মসজিদে যাওয়ার পথে জনৈক ঝাঁড়ুদারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম। আমার কাছে দামী আতর ছিল। আমি বললাম, ওহে আল্লাহর বান্দা, আসো। তোমার নাম কী? তার নাম বললে আমি বুঝতে পারলাম সে অমুসলিম। আমি তার গায়ে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলাম। এভাবে তিন চারদিন এমন সৌজন্য ব্যবহার করলাম। পরিবর্তীতে সে মুসলমান হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! এই সামান্য কাজটি তার ইসলাম কবুলের মাধ্যম হয়েছে আতরের মূল্য খুবই নগণ্য। কিন্তু এটিই তার হৃদয় আনন্দে ভরে দিয়েছে

আমি দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি, সাধারণ শ্রমিকরা এইসব অভিজাত দামি গ দেখে মনে মনে চিন্তা করে, এই গাড়ি ষাট হাজার রিয়ালে। আর আম। মাসিক বেতন মাত্র এক হাজার রিয়াল। এমন একটি গাড়ি ক্রয় করতে আমার ষাট মাস লাগবে। ইস! যদি আমার এমন একটি গাড়ি থাকতো!

ষাট মাসকে বার দিয়ে ভাগ দিলে ৫ বছর হবে। আচ্ছা ৪ বছরই ধরলাম। এখন এই শ্রমিকের দিকে যদি দামী গাড়ির মালিক পথিমধ্যে জানালা খুলে দৃষ্টিপাত করে। তার সাথে হাসি মুখে কথা বলে। তাকে একটু গাড়িতে করে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। তাহলে নিঃসন্দেহে তার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠবে।

তদ্রূপ আমাদের পারিবারিক জীবনেও একজন আরেক জনকে খুশী করা উচিত। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে হাসি মুখে সালাম দেওয়া। তার সাথে আন্তরিক কোমল ব্যবহার করা। সন্তাদের সাথে খেলাধুলা করা। তদ্রূপ স্ত্রীর দায়িত্ব যথাসম্ভব স্বামীকে খুশী করে রাখা।

স্মর্তব্য যে, হৃদয়ের প্রভাব, আত্মিক প্রতিক্রিয়া কখনো মুছে যায় না। যিনি ভালো কাজ করেন তিনি সমাজে কখনো বিস্মৃত হোন না। কা'ব বিন মালিক রা. গযওয়ায়ে তাবুকে অংশগ্রহণ করেননি। চল্লিশ, পঞ্চাশ দিন সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, এমনকি তার পরিবার-পরিজন তাকে বর্জন করেছিলেন। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তওবা কবুলের সুসংবাদ আসল তখন সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এই ব্যক্তির হৃদয়ে সুসংবাদ দিয়ে আনন্দ দেওয়ার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। এক সাহাবী পাহাড়ে উঠে চিৎকার করলেন, হে কা'ব, তওবা কবুলের সুসংবাদ গ্রহণ করো।

গ'ব বলেন, আরেকজন ঘোড়ায় চড়ে আসলেন। তখন আমার পরিধেয় ৷দর ব্যতীত তাকে দেওয়ার মতো কিছুই পেলাম না। কিন্তু তাও খুশিতে তাকে পরিয়ে দিলাম। আরেকটি চাদর ধার করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম। সর্বপ্রথম মসজিদে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি খুশীতে আমাকে জড়িয়ে ধরেন।

কা'ব রাযি. বলেন, 'এই দৃশ্য আমি কখনো ভুলবো না।' চিন্তা করুন, সামান্য অকৃত্রিম ভালোবাসা তার হৃদয়ে কি পরিমাণ আনন্দ দিয়েছে।

অনেক সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন অপরকে বিভিন্নভাবে খুশী করেছেন। যেমন যাইনুল আবেদীন রহ. অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে মদিনার দরিদ্রদের বাসায় প্রত্যহ খাবার পাঠিয়ে দিতেন। তিনি যখন মারা গেলেন লোকেরা জানতে পারল, তিনি এই ভাল কাজটি করতেন।

কা'ব রা. এর ঘটনা প্রমাণ করে, সাহাবায়ে কেরাম অপরকে খুশী করাকে ইবাদত ও নৈকট্যপ্রাপ্তির মাধ্যম মনে করতেন। অর্থাৎ তাসবীহ-তাহলীল পাঠ, ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ নামাজ, দান-সাদাকা যেমন ইবাদত তদ্রূপ অপর ভাইকে খুশী করাও ইবাদত। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ দেয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের প্রতিদান দেওয়া ছাড়া সন্তুষ্ট হবেন না।

তিনজন সাহাবি, কাব' বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়া, মুরারা বিন রাবি তারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সমাজকে তাদের বয়কট করতে নির্দেশ দিলেন। ৫২ দিন পর্যন্ত কেউ তাদের সাথে কথা বলল না। ফলে তাদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে গেল। এমনকি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, আপন স্ত্রী পরিত্যাগ করে চলে গেল। অতঃপর وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ আয়াত অবতীর্ণ হয়ে তাদের তওবা কবুলের ঘোষণা আসে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাজ পড়ে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন। কা'ব রা. তাদের সাথে নামায পড়েন নি। তিনি বাড়ির ছাদে নামায পড়েছিলেন। প্রিয় নবী যখন تَابَ عَلَيْهِمْ পড়লেন, তখন এটা বয়টন সমাপ্তি ও পূর্বের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘোষণা ছিল।

ওমর রা. বলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে এই সুসংবাদ দিতে উঠেপড়ে লেগে গেলেন। একজন ঘোড়ায় চড়লেন। আরেকজনের ঘোড়া ছিল না। তিনি পাহাড়ে উঠে চিৎকার করলেন, 'ওহে কা'ব, তুমি তওবা কবুলের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' অথচ তিনি জানেনও না কোথায় কা'ব আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল যেন সুসংবাদটি আগে পৌঁছে।

এদিকে কা'ব সুসংবাদদাতাকে পরিধেয় চাদর ব্যতিত দেওয়ার মতো কোন কিছুর মালিক ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাও দিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!

এ জন্যই ইসলামে অপরকে আনন্দ, খুশী করার জন্য অনেক ইবাদতের প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন تَعْزِيَةٌ [তাযিয়া] তথা মৃতপরিবারকে সান্তনা প্রদান, রোগীর সেবা শুশ্রূষা, প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়া ইত্যাদি। আমরা মৃতকে জীবিত করতে পারবো না ঠিক, কিন্তু তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে পারি। যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। একবার তিনি বললেন, একজন জান্নাতি ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট চাষাবাদ করার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন আল্লাহ বললেন, আমি যা দিয়েছি তাতে কি সন্তুষ্ট নও? কিন্তু সে আবদার করল, আমি ফসল ফলাসে চাই। তখন আল্লাহ তাকে চাষাবাদের অনুমতি দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন এক বেদুইন বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি কুরাইশ অথবা আনসারী হবে। কিন্তু আমরা কৃষক নই।' তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসি দিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন এই লোকটি রসিকতা করতে চাচ্ছে। তখন তিনি তার সাথে রসিকতা করতেন।
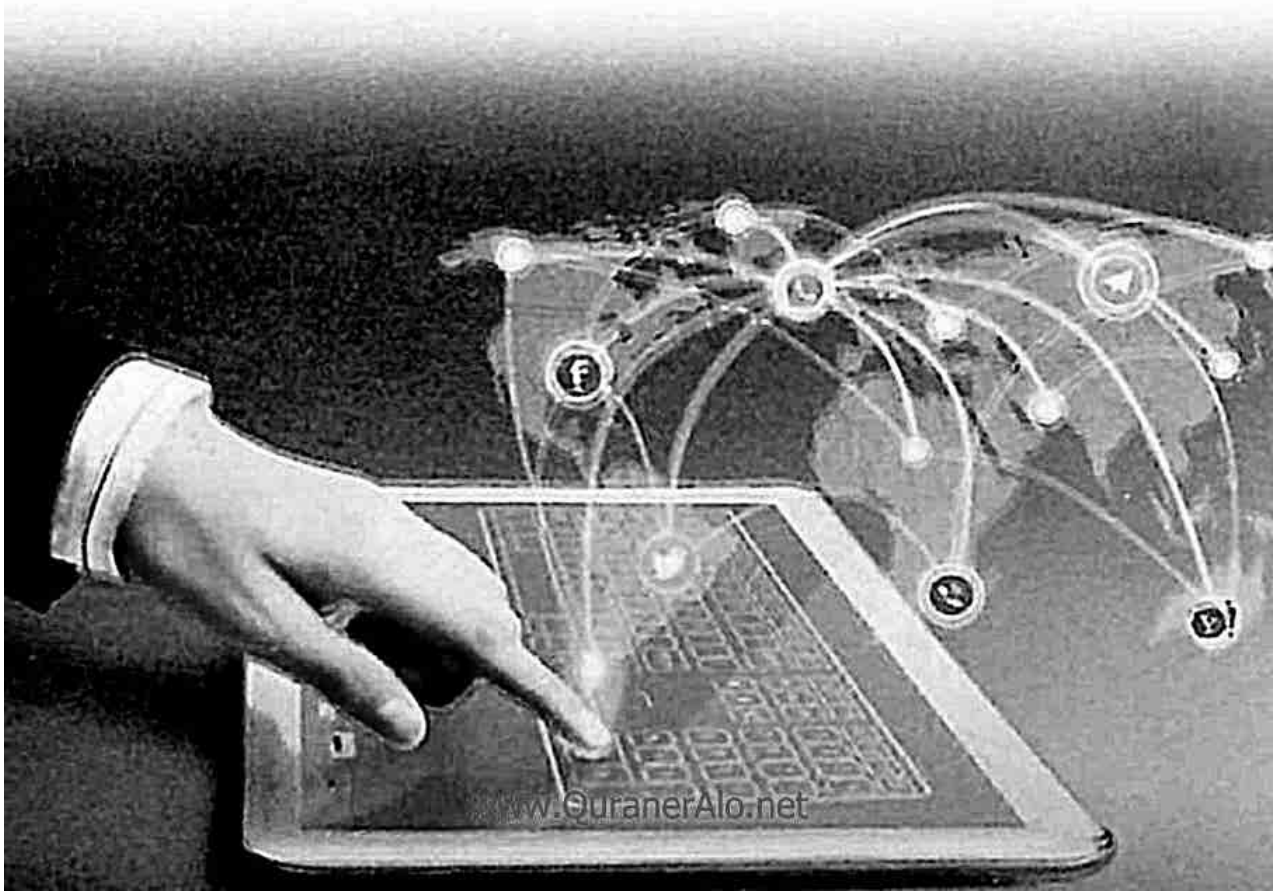
সাহাবি আওফ বিন মালিক রা. একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসলেন। তিনি তখন তাবুক যুদ্ধে তাবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি এসে তাবুতে প্রবেশ করার নিমিত্ত বললেন أَأَدْخُلُ আমি কি প্রবেশ করবো? নবীজী বললেন, أُدْخُلْ প্রবেশ করো। তিনি বললেন, أَأَدْخُلُ كُلِّيْ আমি কি পুরাই প্রবেশ করবো? তিনি এটা হেসে বলেছিলেন। তখন নবীজী হেসে বললেন, كُلُّكَ পুরোই প্রবেশ করো।

একব্যক্তি ইমাম শাবীকে জিজ্ঞাসা করল, মুহরিম ব্যক্তি কী (প্রয়োজন হলে শরীরের) চামড়া ঘঁষতে পারবে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ পারবে।' সেই লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, কতটুকু পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, হাড্ডি প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত।

ইমাম শা'বী আরেকদিন বলেন, তুমি যদি সাহরী করার মতো কিছুই না পাও তাহলে তোমার আঙুল চুষে হলেও সাহরীর সুন্নত পালন করবে। তখন এক লোক প্রশ্ন করলো, কোন আঙুল চুষবে? তখন তিনি পায়ের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এই আঙুল।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আমি যদি কাপড় খুলে নদীতে গোসল করতে নামি তখন কি কিবলামুখী হতে পারবো? তিনি উত্তর দিলেন, বরং তুমি তোমার কাপড়ের দিকে মুখ করো যেন তা চুরি না হয়ে যায়।

চিন্তা করুন, এই হচ্ছে জীবন শৈলী। প্রশ্নকারীকে আনন্দ দিচ্ছেন আবার তার প্রশ্নের উত্তরও হয়ে যাচ্ছে। এতে শায়েখের সাথে প্রশ্নকারীর ঘনিষ্ঠতা হচ্ছে ফলে সে সামনে স্বাচ্ছন্দে আরো প্রশ্ন করতে পারবে।

সুতরাং অন্যকে আনন্দিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদতমূলক কাজ। এই কর্মের ফলাফল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত।

অপরকে খুশী করার কিছু সাধারণ পদ্ধতি

১। হাদিয়া উপহার দেওয়া। হাদিয়া অনেক দামি হতে হবে এমন কোন কথা নেই। আপনি যদি কোন বন্ধুর বাসায় যান, আর তার সন্তানাদি থাকে, তাহলে কিছু খাবার, খেলনা নিয়ে যান। এটা তাদের আনন্দিত করবে।

২। মানুষের সাথে মুচকি হাসুন। হাদীসে এসেছে–

تَبَسُّمُكَ فِيْ وَجْهِ اَخِيْكَ صَدَقَةٌ

তোমার ভাইয়ের সামনে হাসা সাদাকা।

৩। অপর ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করুন।

৪। উত্তম কথা সাদাকা। তাই উত্তম কথা বলুন।

৫। বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ খবর নিন।

ইসলামি ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অতীতে মুসলিম সমাজে মসজিদের পাশে অনেক (ওয়াকফকৃত) আওকাফ তথা সহায়তা কেন্দ্র (কেয়ার সেন্টার) ছিল। সেখানে শুধু অসুস্থ ও গরীবদের জন্য وقف مؤنس المرضى والغرباء নামে ওয়াকফকৃত বিশেষ একধরণের মারকায ছিল। এই মারকাযে নিয়মিত কিছু ক্বারী সাহেবান ও সাধারণ ধর্মীয় বইপাঠক থাকতেন। তাদের বেতন-ভাতা নির্ধারিত ছিল। এরা অসুস্থ ব্যক্তির আপনজন ছিলেন না। এদের কাজ ছিল অসুস্থ ব্যক্তির সামনে ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত এবং দিনের অবসর সময়ে শুধু কুরআন তিলাওয়াত বা অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন রোগীগণ সারা রাত কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পারেন।

বিছানায় শায়িত অবস্থায়ও ধর্মীয় পুস্তকপঠন শুনে শুনে ইসলামী জ্ঞানার্জন করতে পারেন। ফলশ্রুতিতে রোগীগণ রোগযন্ত্রণা ও বিষণ্ণতার কথা ভুলে যেতেন এবং আনন্দিত উপভোগ করতেন। (চিন্তা করুন, আমাদের ইসলামী সভ্যতা কত উজ্জ্বল! পূর্ববর্তীগণ মানবতার জন্য কত কিছুই না করেছেন।)

৬। আপনি শরীয়তের মাসআলা মাসায়িল, যিকির আযকার শিক্ষা দিয়ে অপরকে খুশী করতে পারেন।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশে প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(৮)
ফজরের সালাতের গুরুত্ব

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে,

মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন? জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم * فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

আজকে একটি বিশেষ নামাযের প্রতি জুলুম নিয়ে আলোচনা করবো। তাহচ্ছে ফজর সালাত, যার প্রতি আমাদের অতিমাত্রায় অবহেলা উদাসিনতা লক্ষ্য করা যায়। এমন কি এই সালাতের জামাতে এক কাতার বা সামান্য কিছু বেশী মুসল্লী উপস্থিত হন।

তারা প্রত্যেকেই কি হাসপাতালে শয্যাশায়িত? তারা সকলেই কি কাজ করতে করতে ক্লান্ত? না বরং তারা উদাসীন অলস। কিছুদিন পূর্বে একটি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানে এক হাজার ছাত্র উপস্থিত ছিল। তাদের সামনে ফজরের সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করলাম। তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, কখন ফজরের জন্য আজান দেওয়া হয়?

আল্লাহর শপথ, কেউ বলতে পারল না। কেউ বললো, পৌনে ছয়টায়। আরেকজন বলল, তিনটায়। তৃতীয় জন বলল, আমি জানি না।

এই প্রশ্নের জবাব মাত্র পনেরজন দেওয়ার জন্য হাত উত্তোলন করে।

এক হাজারের মধ্যে মাত্র ২৫ জন জামাতের সাথে ফজর নামায পড়েছে। হায় কত উদাসিনতা!

আজকে ফজর সালাত নিয়ে আলোচনা করবো। তার তাৎপর্য, গুরুত্ব ও কিভাবে জাগ্রত হবো এ বিষয়ে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ফজর সালাত ত্যাগকারীর ব্যাপারে কি ধমক দিয়েছে- তাও আলোচনা করবো। ফজরের সালাত ঈমানের মানদণ্ড, জগতের প্রতিপালকের ভালাবাসার মানদণ্ড-এ বিষয়েও আলোচনা করবো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

ফজরের তেলাওয়াতে (ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হন। *[সূরা ইসরা : ৭৮]*

হ্যাঁ, তা হচ্ছে ফজরের সালাত যাতে ফেরেশতারা উপস্থিত হন। একদিনে মুমিনরা রুকু সেজদারত অন্যদিকে আমলসমূহ উত্তোলন করা হচ্ছে।

আজকে ইয়াতীম ফজরের সালাত নিয়ে আলোচনা করবো যা স্বল্প উপস্থিতি কারণে বিলাপ করে। ঘুমন্তদের দুর্ভাগ্য প্রত্যক্ষ করে আক্ষেপ করে। আসুন ফজর সালাত জামাতের সাথে আদায় করতে সচেষ্ট হই। আমি শুধু পুরুষদের অবহেলা নিয়েই আলোচনা করবো না। বরং অধিকাংশ মহিলা-গণও এক্ষেত্রে অতিমাত্রায় উদাসীনতা দেখান। তারা সময় অতিক্রম হওয়ার পর সালাত আদায় করেন।

প্রত্যেক জিনিসকে তার যথাসময়ে আদায় করতে হয়। উদাহরণত কেউ যদি হজ্বের সব কিছুর মালিক হয়। হজের সময়ও আসে। কিন্তু তার ব্যবস্থাপনা, ভীড়ের আতঙ্ক, দুর্গন্ধ ভীতির কারণে সে হজ আদায়ের জন্য গেল না।

অতঃপর সে অতিরিক্ত ফযিলতের আশায় রমযান মাসে হজ আদায় করার জন্য গেল। সে সব কিছুই করল। আরাফাতে অবস্থান করল। খুব বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করল। তার এই ইবাদত কি কবুল হবে?

উত্তর, না। কেননা, হজের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মাস। আল্লাহ বলেন–

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ

(হজের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট মাসসমূহ) এখন আপনাদের কি অভিমত যে ব্যক্তি সকাল ৮টায় সালাত আদায় করে অথচ আজান হয়েছে ভোর ৫টায়। প্রিয় সুধি! আল্লাহ এটাকে صَلَاةُ إِسْتَيْقَاظُ [ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সালাত] বলে নামকরণ করেন নি। বরং صَلَاةُ الْفَجْرِ [ফজরের সালাত] বলে নাম করেছেন। যেমন যোহরের সময় صَلَاةُ الظُّهْرِ [যোহরের সালাত] আসরের সময় صَلَاةُ الْعَصْرِ[আসরের সালাত] মাগরিবের সময় সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়ের সালাতকে صَلَاةُ الْمَغْرِبْ [মাগরিবের সালাত] বলে নামকরণ করেছেন। যখন রাত নেমে আসে এবং চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়, সে সময়ের সালাতকে صَلَاةُ الْعِشَاءِ বলে নামকরণ করেছেন।

তদ্রূপ ফজর সালাতকে صَلَاةُ الْفَجْرِ নামে নামকরণ করেছেন যে সময়টি সবার নিকট الْفَجْر বলে পরিচিত। আরব এই সময়কে (উষালগ্ন) ফজর বলে ডাকতো। কিন্তু এই সময়টা সূর্য উদয়ের পর ভিন্ন নাম ধারণ করে। কাজেই ভিন্ন সময় পড়লে তা ত্রুটিপূর্ণ হবে। এজন্য আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অপরিহার্য। *[সূরা নিসা : ১০৩]*

নামাযের নয়টা শর্ত আছে। যেমন– ১। কিবলামুখী হওয়া। ২। সতর ঢাকা ৩। সর্বপ্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া ইত্যাদি।

কিন্তু সকল শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে সময় উপস্থিত হওয়া। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য শর্ত বর্জন করে শুধু مَوْقُوتًا (সময়) শর্তটি উল্লেখ করেছেন। কেননা, এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। (কেননা, সময় না আসলে সালাতই ফরজ হয় না।) এজন্য যদি কেউ প্রশ্ন করে, আমি যোহর সালাত আদায় করবো। কিন্তু পানি পাচ্ছি না। পানি আসরের সময় পাওয়া যাবে। এখন কি পানি দ্বারা অজু করে আসরের সময় পড়া উত্তম হবে নাকি বর্তমানে ঠিক সময়েই তায়াম্মুম করে পড়বো?

উত্তরে বলবো, বরং তুমি সঠিক সময়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করো। সে যদি বলে আমার পানিও নেই এবং মাটিও নেই (যা দিয়ে তায়াম্মুম করবো) তাই আসরের সময় পড়তে অনুমতি দিন।' উত্তরে বলবো, বরং তুমি অজু তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় কর। যেহেতু ওয়াক্ত শর্তটি পাওয়া গেছে।

যদি বলে, আমার নিকট সতর ঢাকার মত কাপড় নেই। গাড়ি পৌঁছবে তিন ঘণ্টা পরে। ততক্ষণে সালাতের সময় শেষ হয়ে যাবে। আমি বলবো, তুমি নগ্ন দেহেই সালাত আদায় কর। যদি বলে, আমি কিবলা চিনি না। উত্তরে বলবো, নিজের মন যে দিকে প্রাধান্য দেয় সেদিকে ফিরেই সালাত আদায় করো। কিন্তু তারপরও গুরুত্বপূর্ণ হলো নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করবে। এতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ তায়ালা সালাতকে কত গুরুত্ব দিয়েছেন।

আপনি দেখবেন, অধিকাংশ মানুষ ফজর সালাতকে বিলম্ব করে। এই সালাত নিয়েই তাদের বড্ড উদাসীনতা। সঠিক টাইমে সালাত আদায় করে এমন লোক খুব কমই আছে।

আজকে আমি সবাইকে লক্ষ্য করে বলছি।
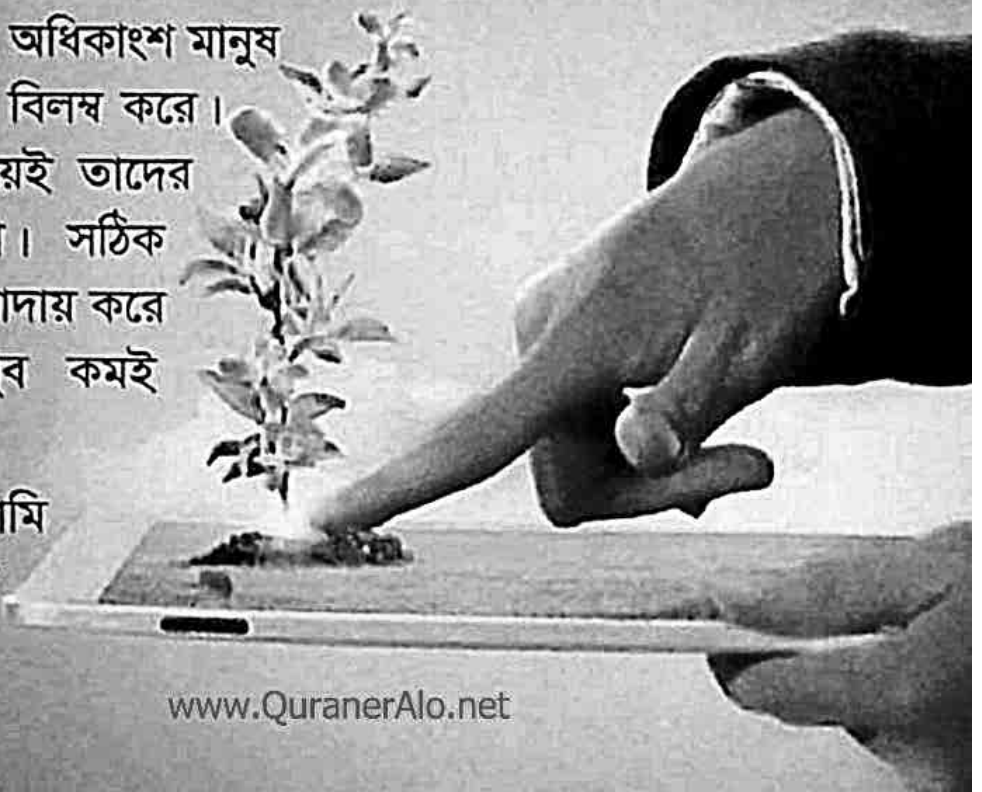
আমার বক্তব্য শুধু জামাতের সাথে সালাত আদায় ওয়াজিব প্রসঙ্গেই নয়। বরং আমাদের মা বোন কন্যাদেরকেও সঠিক সময়ে সালাত আদায় করার জন্য আহ্বান করছি।

আক্ষেপের বিষয় যে, অনেক পরিবারের কোন সদস্যই সাড়ে ছয়টার আগে জাগ্রত হয় না। অথচ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাতকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অসংখ্যা হাদীস আছে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি জামাতে ইশার সালাত পড়বে, সে যেন অর্ধরাত্রি কিয়াম করল। আর যে জামাতে ফজরের সালাত পড়ল সে যেন পূর্ণ রাত্রি (ইবাদতে) কিয়াম করল। কেন তিনি এশা ও ফজরের সালাতকে একত্র মিলালেন? এশার সালাত আমাদের জন্য সহজ। কিন্তু ফজরের সালাত কঠিন।

অথচ আমাদের পূর্ববতী আরবদের পুরনো নিত্য-অভ্যাস ছিল, তারা ফজর সালাতের পর ঘুমাতেন না। সূর্য উদয়ের পর বিছানায় শুয়ে থাকতেন না। কেউ হয়তো ব্যবসা নিমিত্ত বাজারে যেতেন কেউ বা ক্ষেতে চাষাবাদ করতে বের হতেন। আবার কেউ রাখালবৃত্তি করতেন। সারা দিন কঠোর পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় ফিরে আসতেন। এভাবে তাদের সারা দিন অতিবাহিত হতো।

মাগরিবের পর এক দেড় ঘন্টা পড়ে এশার সালাত হয়। তারা সেই সালাতের অপেক্ষায় থাকতেন। কর্ম, ক্লান্তির বিবেচনায় তাদের জন্য এশার সালাত তুলনামূলক কষ্টকর ছিল। যেহেতু ফজর ও এশার সালাত তাদের জন্য কষ্টকর ছিল তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উৎসাহ প্রদান নিমিত্ত উপরের হাদীস বর্ণনা করেন।

এ ধরণের আরেকটি হাদীস হচ্ছে–

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

যে ফজরের সালাত আদায় করলো সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল। সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদেরকে তার জিম্মাদারি সম্পর্কে তলব না করেন। তাহলে তাকে পাকড়াও করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। *[মুসলিম]*

আল্লাহর জিম্মায়- এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হেফাজতে আছে। এই হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, জামাতের সাথে ফজর সালাতে লাভ হলো সে আল্লাহর হেফাজতে থাকে। ফলে কেউ তার ক্ষতি করতে চাইলে আল্লাহ তা প্রতিরোধ করবেন।

তৃতীয় হাদীস : যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজর সালাত পড়ল সেটা কিয়ামত দিবসে নূর হিসাবে থাকবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যারা রাতের অন্ধকারে মসজিদে যায়, তাদেরকে কিয়ামতের দিবসে পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।' (হাদীস)

অর্থাৎ ফজরের আযানের সময় যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকে আর যে ব্যক্তি ঘুমে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও জাগ্রত হয়ে কনকনে শীতে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওজু করে তারপর অন্ধকারে একা হেঁটে মসজিদে যায়- এই দুই ব্যক্তি এক সমান নয়। সে যে জাগ্রত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আকাশ থেকে তা দেখেছেন। (কাজেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।)
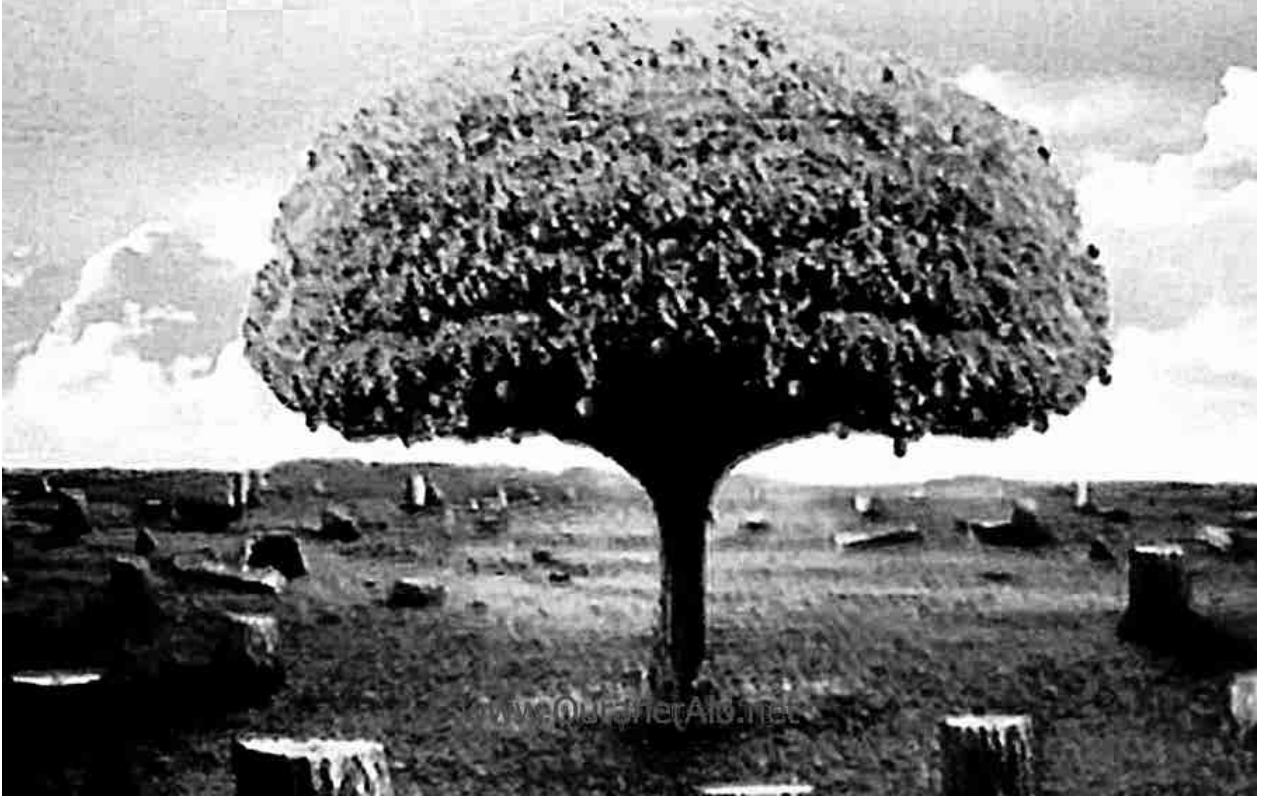
অনেক মহিলা সূর্য উদয়ের পর ঘুম থেকে উঠে। আবার অনেক মহিলা ভোর রাতেই উঠে যায় এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে ওজু করে নামায পড়ে। অথচ তার নিদ্রার প্রাবল্য ছিল। এই দুই শ্রেণী আল্লাহর নিকট সমান নয়।

হাদীসে আরো এসেছে, প্রিয় নবী সা বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করে তাকে জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডার সালাত পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (বুখারি, মুসলিম) দুই ঠান্ডা বলতে ফজর ও আসরের সালাত বুঝানো হয়েছে। কেননা এই সালাত সূর্যের তেজ শীতল হওয়ার পর পড়া হয়।

ফজরের সালাতের ফযিলত সম্পর্কিত হাদীস

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ফজর সালাত পড়বে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তোমাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না যে সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং অস্তগমনের পূর্বে সালাত আদায় করেছে। (মুসলিম)

সুতরাং যে এই মর্যাদা বুঝবে সে এই গণীমত কুড়াতে তৎপর হবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছেন যে, তাতে ফেরেশতারা উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, তোমাদের নিকট ফেরেশতাদের একদল রাতে আসে আরেক দল দিনে আসে। তারা ফজর ও আসরের নামাযে একত্রিত হয়। তারপর যারা রাত্রি যাপন করেছিল তারা চলে যায়।

তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (অথচ তিনি সবই জানেন) তোমরা কিভাবে আমার বান্দাদের থেকে প্রত্যাবর্তন করেছ? অথবা কিভাবে তোমরা আমার বান্দাদের গিয়ে পেয়েছ? তখন ফেরেশতারা বলেন, আমরা তাদের থেকে এসেছি এমতাবস্থায় যে, তারা সালাত পড়ছে। আবার তাদের কাছে এমতাবস্থায় গিয়েছি যে, তারা সালাত পড়ছে। (বুখারী)

এই হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে, ফেরেশতাদের একটি দল ফজরের সময় আকাশ থেকে দুনিয়ার জমিনে অবতীর্ণ হয় এবং তারা আসরের সময় চলে যায়। আসরের সময় প্রস্থানের সময় আরেক দল আকাশ থেকে নতুন করে আসে। তারা আসর থেকে পরের দিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত অবস্থান করে। ফজরের সময় তারা চলে যায় আবার নতুন দল আসে।

প্রথম দলকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কিভাবে আমার বান্দাদের দেখেছ? ফেরেশতারা বলেন, হে প্রভু! আমরা তাদের কাছে এমন সময় এসেছি যখন তারা সালাত (ফজরের) পড়ছে। আবার তাদেরকে ছেড়ে এসেছি যখন তারা সালাত (আসরের) পড়ছে।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় দলকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কেমন হালতে পেয়েছো? ফেরেশতারা বলেন, হে প্রভু! আমরা তাদের কাছে এমন সময় এসেছি যখন তারা সালাত (আসরের) পড়ছে। আবার তাদেরকে এমন সময় ছেড়ে এসেছি যখন তারা সালাত (ফজরের) পড়ছে।

গভীরভাবে চিন্তা করুন, যদি আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করেন আর তারা উত্তর দেন যে, আমরা তাদের কাছে এসেছি যখন তারা ঘুমন্ত ছিল আর তাদের থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি যখন তারা ফিল্ম, খেলা দেখায় লিপ্ত ছিল। তারা ফজর আসর কিছুই পড়েনি। তাহলে এর পরিণাম তো অত্যন্ত ভয়াবহ!

এজন্যই আল্লাহ তায়ালা ফজরের قُرْآنٌ সালাতকে (কুরআন) বলে নামকরণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

ফজরের সালাত পড়। কেননা, ফজরের পাঠে (সালাতে) উপস্থিত হয়। *[সূরা ইসরা : ৭৮]* অর্থাৎ ফেরেশতাগণ তাতে উপস্থিত থাকেন।

হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত পাবন্দীর সাথে আদায় করবে, সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের প্রভুকে স্পষ্ট দেখবে যেমন এই চন্দ্রকে দেখছো। দর্শনে কোন ত্রুটি হবে না। সুতরাং সূর্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করো। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন–

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

সুতরাং সূর্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করো।

[সূরা তাহা : ১৩]

আখেরাতে আল্লাহর দিদার এমন একটি নিয়ামত যা প্রত্যেক মুমিন প্রত্যাশা করবে। আল্লাহ তায়ালা জান্নাতীদের যাবতীয় প্রয়োজন আশা পূর্ণ করার পর বলবেন, হে জান্নাতবাসী! আমি তোমাদের সাথে একটি ওয়াদায় আবদ্ধ যা এখন পূর্ণ করতে চাই। তখন জান্নাতীগণ বলবেন, হে প্রভু, আপনি কি আমাদের চেহারা শুভ্র করেন নি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি। আপনি কি আগুন থেকে নিস্কৃতি দেন নি? (এরপরও আর কি দাবী থাকতে পারে?)

তখন আল্লাহ উত্তর দিবেন, অবশ্যই। তবে আজকে আমি তোমাদের প্রতি চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। সুতরাং আর কখনো রাগ করবো না। তখন তিনি তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে পর্দা উন্মোচন করবেন। জান্নাতীরা সেদিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে। যতক্ষণ তারা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে ততক্ষণ জান্নাতের অন্য কোন নেয়ামতের

প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। সুতরাং জান্নাতে সর্বোৎকৃষ্ট নেয়ামত হচ্ছে 'আল্লাহর দিদার' (দর্শন) প্রাপ্তি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে ঘুমন্ত থাকে তখন শয়তান ঘাড়ের পশ্চাতদেশে তিনটি গিঁট দেয় যেন সে ঘুম থেকে উঠতে না পারে। অতঃপর যখন সে ঘুম থেকে উঠে যায় এবং আল্লাহর নাম নেয় তখন একটি গিঁট খুলে যায়। এরপর যখন অজু করে তখন আরেকটি গিঁট খুলে যায়। এরপর যদি সালাত আদায় করে তাহলে তৃতীয় গিঁটটিও খুলে যায় এবং সে প্রাণবন্ত ও উদ্যমী হয়ে উঠে। (পক্ষান্তরে ঘুমিয়ে থাকলে) তার হৃদয় খাবাসাতপূর্ণ ও অলস হয়ে যায়। [বুখারি ও মুসলিম]

এই হাদীসের অর্থ হচ্ছে, আপনি যখন ঘুমান তখন ইবলিস এসে আপনার মাথায় গিঁট দেয়। যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতে পারেন। এই গিঁটের ফলে জাগ্রত হতে পারেন না।

ফজরের মাহাত্মের কারণে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে কসম খেয়েছেন তিনি বলেন–

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

শপথ ফজরের এবং দশ রাত্রির। *[ফজর : ১-২]*

এখানে ফজর দ্বারা ফজরের সালাত অথবা সময় উদ্দেশ্য। দশ রজনী দ্বারা দশ যিলহজ্ব উদ্দেশ্য।

ফজরের সালাতে উদাসীনতা নেফাকীর আলামত

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী ফজরের সালাতে উদাসীনতা করা মুনাফিকের আলামত। প্রিয় নবী সা বলেন, মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার সালাতের চেয়ে অধিক কষ্টকর আর কিছু নেই। অথচ তারা যদি জানত এই দুই সালাতে কি পরিমাণ পুণ্য নিহিত আছে তাহলে তারা হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও ছুটে আসত।

একদিন তিনি ফজর সালাত শেষে মুসল্লির পরিমাণ কম দেখলেন।

তিনি প্রশ্ন করলেন, অমুক অমুক কি নেই? সাহাবাগণ রা. উত্তর দিলেন, না। অমুক অনুপস্থিত। অমুক অনুপস্থিত। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই সালাত মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর।

অনেক ভাই অভিযোগ করেন, আমি ফজর নামাজ পড়তে পারি না। তা আমার জন্য অনেক কষ্টকর। যদিও আমি চেষ্টা করি জাগ্রত হতে, কিন্তু পারি না।' এই ব্যক্তির প্রতি আমার প্রশ্ন, যদি তাকে কোম্পানির মালিক ফোনে বলে 'তোমাকে আমি ফজরের আজানের সাথে সাথে ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় গাড়ি নিয়ে এখানে উপস্থিত দেখতে চাই। (কেননা, আমি ভোর পাঁচটায় জরুরী কাজে যাবো) বিনিময়ে তুমি প্রতিদিন ৫০০০ রিয়াল পাবে। কিন্তু যদি একদিনের জন্যও সঠিক সময়ে না আসতে পারো তাহলে তোমার সারা মাসের বেতন কেটে দিবো।'

এই ড্রাইভার কি কখনো অনুপস্থিত থাকবে। বরং মাসিক দেড় লক্ষ রিয়ালের আশায় রাতে ঘুমাবেই না। রাত চারটার সময় ক্লান্ত হয়েও যদি বাসায় ফিরে তারপরও বলবে মালিকের ড্রাইভিং করার পোনে এক ঘণ্টা বাকি আছে। কাজেই সে যথাসময়ে পৌছার সুব্যবস্থা করে রাখবে।

কিন্তু এই ব্যক্তিই আপনার কাছে এসে বলবে, 'আমি ফজরের জন্য জাগতে চাই কিন্তু পারি না।' বস্তুত সে মিথ্যুক।
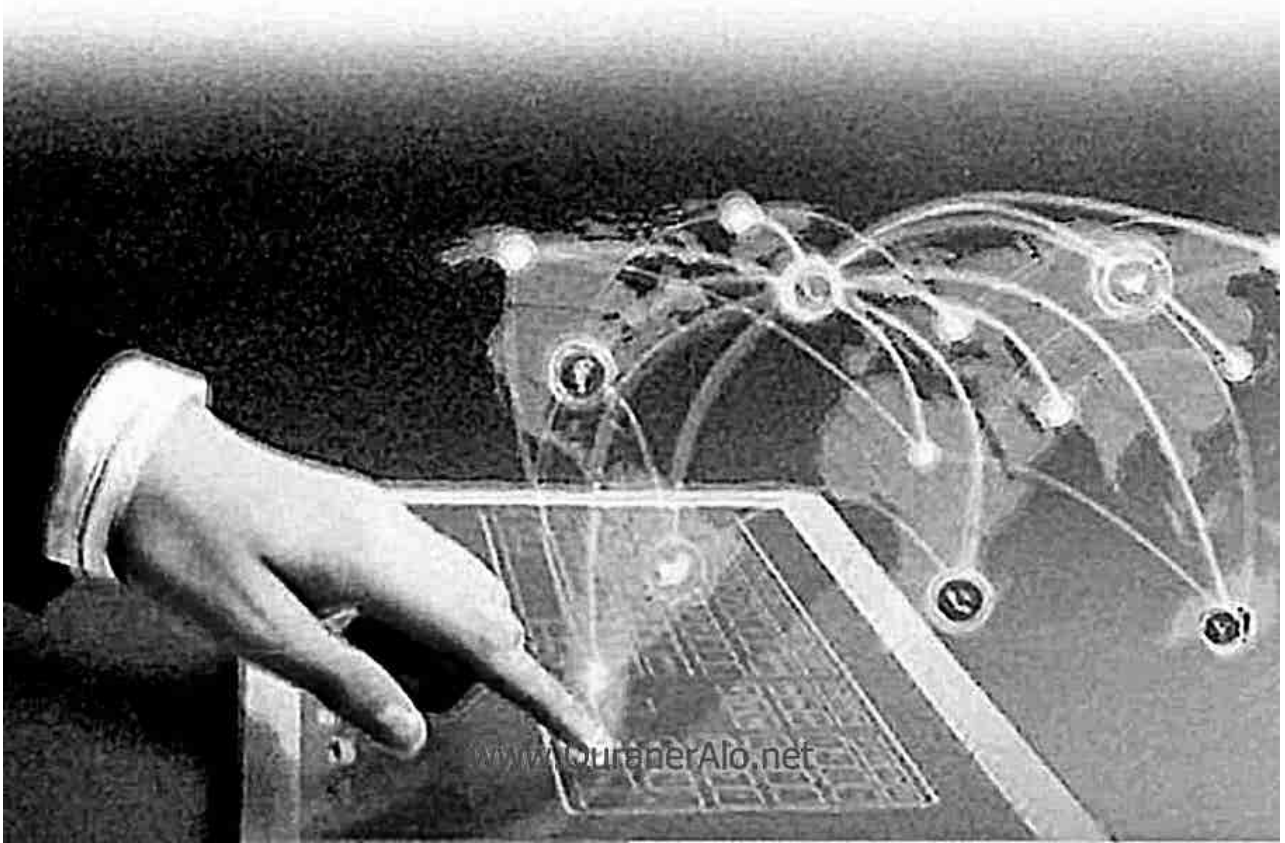
কেননা, আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে সাধ্যাতীত কোন কর্ম চাপিয়ে দেন না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দেয়। (বুখারী)

আমি এসব হাদীস উল্লেখ করছি যেন আমার ভাই-বন্ধুগণ সতর্ক হতে পারেন। আপনি যদি ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করেন তাহলে আপনি আল্লাহর জিম্মায় চলে যাবেন। এই নামাজ বান্দা ও রবের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করে। বান্দা নির্ভীক হয়। তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না।

কথিত আছে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একব্যক্তিকে হত্যার জন্য জল্লাদকে হুকুম করলেন। জল্লাদ এসে দেখল আটক ব্যক্তির চেহারা হাস্যোজ্জ্বল। তখন জল্লাদ জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজকে ফজর নামাজ জামাতের সাথে পড়েছো? সে উত্তর দিল : হ্যাঁ, আল্লাহ মহান, জামাতের সাথে পড়েছি।

জল্লাদ বলল, তাহলে তো আমি তোমাকে হত্যা করতে পারবো না।

সে বলল, হাজ্জাজ তোমাকে হত্যা করার হুকুম করেছে। (আর তুমি পারবে না- এ কেমন কথা)

জল্লাদ বলল, আমি শুনেছি প্রিয় নবী সা বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করল, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। সে আল্লাহর হেফাজতে থাকবে। সুতরাং আমি কিভাবে তোমাকে হত্যা করতে পারি?

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার কিছু মাধ্যম

আপনি যথা সময়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে নিম্ন পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

১। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম কিছু যিকির আযকারের শিক্ষা দিয়েছেন যা যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠতে সহায়তা করে। সুতরাং সেগুলো পাঠ করে ঘুমাতে যান।

২। এলার্ম ঘড়ি অন করে রাখুন। ফলে যথাসময়ে উঠতে পারবেন।

৩। আপনার পাশের বন্ধুকে বলে রাখবেন যেন ভোর রাতে জাগিয়ে দেয়।

৪। যেসব ভাই আল্লাহর রহমতে যথাসময়ে উঠতে পারেন তাদের দায়িত্ব অপর ভাইকে জাগিয়ে তুলা। এতে তারা সওয়াব পাবেন।

৫। মসজিদের খাদেমের সাথে আলোচনা করে রাখতে পারেন। সে আপনাকে ফজরের আজানের পর ফোনে যোগাযোগ করে জাগিয়ে দিবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন এবং ভয় করতেন যে, তিনি জাগ্রত হতে পারবেন না। তখন অন্য কাউকে জাগানোর দায়িত্ব দিয়ে দিতেন।

এক সফর থেকে ফিরে এসে দেখলেন সাহাবায়ে কেরাম খুব ক্লান্ত। তারা ঘুমাতে চাইলে বিলালকে ফজরের সময় জাগিয়ে দেওয়া দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ক্লান্তির কারণে বেলালও ঘুমিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তারা সূর্যের আলোয় জাগ্রত হয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। (হাদীস)

এই হাদীসের শিক্ষা হচ্ছে জাগানোর জন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে।

ইসলামে ফজর সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন–

আমরা যখন কাউকে ফজরের নামাজে দেখতে পেতাম না তখন তার ব্যাপারে নেফাকির ধারণা করতাম। মনে করতাম এই ব্যক্তি মুনাফিক। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, এই নামাজ মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর। সুতরাং বুঝা গেল এই সালাত ঈমানের মানদণ্ড।

৬। যে ব্যক্তি নিশ্চিত যে, সে ঘুম থেকে উঠতে পারবে না। সে তার খাটের পাশে কয়েকটি ঘড়ি রাখবে। কিছু পার্থক্য করে এলার্ম টাইম সেট করবে। ফলে ধারাবাহিক রিং তাকে জাগতে বাধ্য করবে।

৭। ফজরের সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে।

৮। এটাও জানতে হবে যে, এই সালাত তরক করা মুনাফিকের আলামত।

৯। এটাও খেয়াল রাখতে হবে, এই সালাত বর্জনের ফলে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। বুখারী শরীফের হাদীসে সামুরা ইবনে জুনদুব থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (মিরাজ রজনীতে) আমার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসেন। তারা আমাকে জাগ্রত করলে আমি তাদের সাথে চললাম।

(দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনার পর উম্মতের উপর আপতিত শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন) আমরা এমন এক ব্যক্তির পাশে ছিলাম যে শোয়া ছিল, পাশে আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। এতে শায়িত ব্যক্তির মাথা ফেটে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং (আঘাতের প্রচণ্ডতায়) পাথর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এরপর দাঁড়ানো লোকটি আবার নতুন করে পাথর আনতে গেলে আহত ব্যক্তির মাথা আবার আগের মতো ঠিক যায়। তখন প্রহারকারী শায়িত ব্যক্তির সাথে আগের মতোই ব্যবহার করতে থাকে।

আমি বললাম–
সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?

জিব্রাইল আ. বললেন, সামনে চলুন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, যাকে পাথর দ্বারা প্রহার করা হচ্ছে সে ঐ ব্যক্তি যাকে কুরআন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এবং ফরজ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকতো। তার মাথায় এজন্য প্রহার করছে যেহেতু ঘুমের স্বাদ মাথায় অনুভব হতো।)

(বুখারী)

এই শাস্তির কথা শুনলে নামাজ না পড়ে থাকতে পারবে না। সকলেই ভয় পাবে।

১০। তাড়াতাড়ি ঘুমাতে হবে। তাহলে শেষ রাতে উঠতে পারবে।

১১। পবিত্রতা অর্জন তৎপর থাকতে হবে।

১২। ফজরের সালাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ও আগ্রহ থাকতে হবে।

১৩। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে ফজরের সালাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার তাওফিক কামনা করতে হবে।

১৪। জাগ্রত ব্যক্তি ঘুমন্ত ব্যক্তির চেহারায় মৃদু হালকা পানি ছিটিয়ে দিবে। হাদীসে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম হালকা পানি ছিটিয়ে দিতেন। পরিবারের প্রধানকর্তা অন্যান্য সদস্যদের জাগাতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। হাদীসে এসেছে- 'তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল জিম্মাদার এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আল হাদীস) তাই পিতার দায়িত্ব সন্তানকে জাগিয়ে দেওয়া। পিতার অনুপস্থিতিতে বড় ভাই এই দায়িত্ব পালন করবেন। অধিকন্তু স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনকে জাগিয়ে দিবেন।
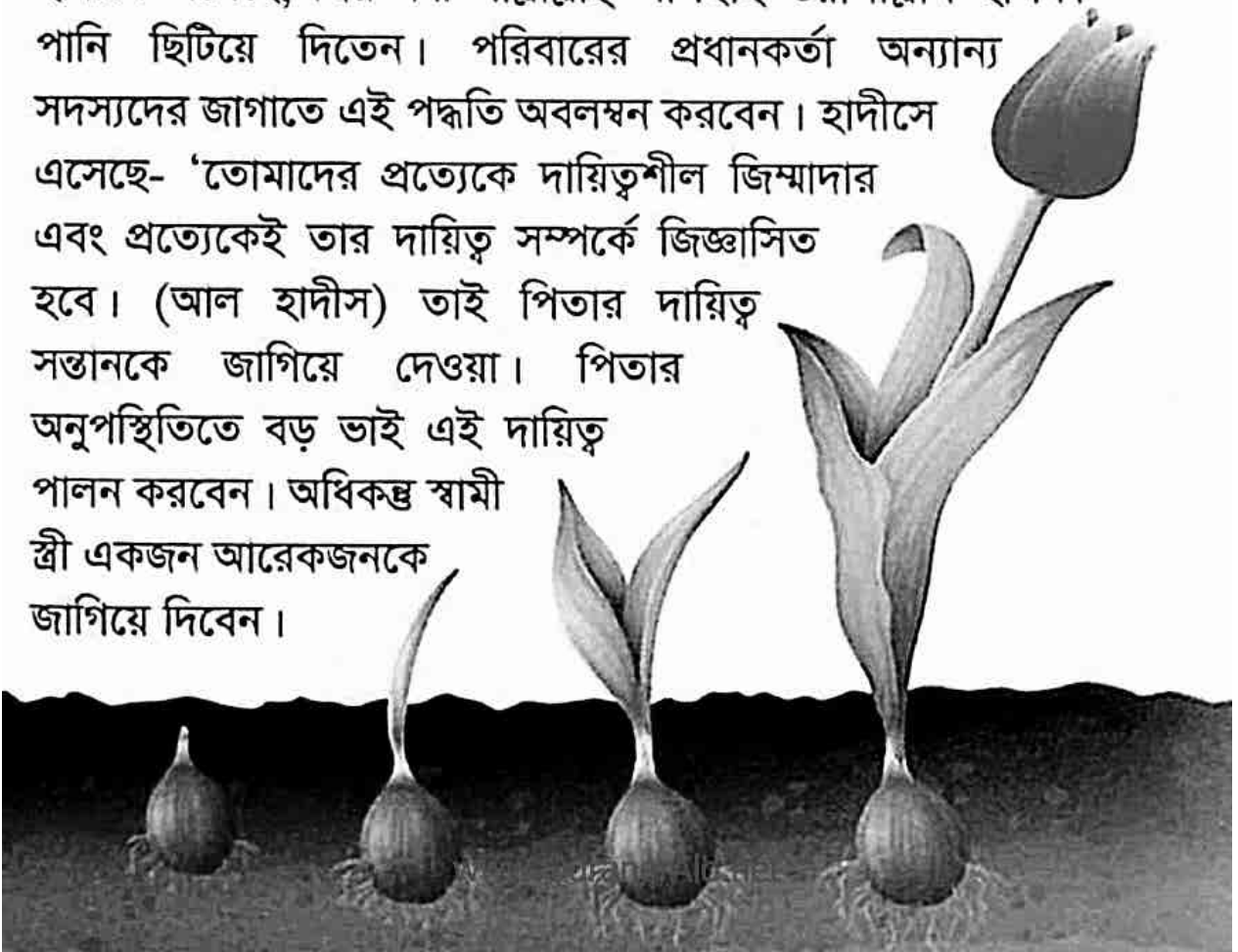
হাদীসে এসেছে, তোমাদের যে কেউ মুনকার তথা অসৎ কাজ দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে।' ফজর সালাত না পড়ে শুয়ে থাকা নিঃসন্দেহে মুনকার তথা গোনাহ কাজ। তাই আমাদের তা প্রতিহত করতে হবে।

১৫। একাকি ঘুমাবে না। ভাই বন্ধুদের সাথে ঘুমানো চাই। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকি ঘুমাতে নিষেধ করেছেন।

১৬। জাগ্রত হওয়ার সময় হিম্মত সাহস থাকতে হবে। অলস ব্যক্তির মতো ঘুম থেকে উঠবে না।

১৭। ঘুমানোর সময় সুন্নাতের অনুসরণ করবে। ডান পার্শ্বে ঘুমাবে এবং ডান কবজি ডান গালের নিচে রাখবে। আসর ও মাগরিবের পর ঘুমাবে না।

১৮। ফজরের সালাতের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা জানতে হবে। ফজর সালাতে অনেক স্বাস্থ্গত উপকার আছে। সুবহানাল্লাহ! সকাল বেলা পরিবেশ সুস্থ সুন্দর থাকে। প্রকৃতি ও পরিবেশ ওজোন গ্যাসে পরিপূর্ণ থাকে যা আমাদের মানসিক দৈনিক সুস্থতা লাভে সহায়তা করে। এভাবে শরীরে হরমোন বৃদ্ধি পায় যা কর্মে শক্তি জোগায়। রক্ত চাপ বেড়ে যায় ফলে কাজ করতে ভালো লাগে।

১৯। সালাতকে এতো ভালোবাসবে যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবেসেছেন। এই সময়কে কষ্টকর মনে করবে না। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে ইনশাআল্লাহ ফজর সালাত আমরা সঠিক সময়ে আদায় করতে পারবো।

এটা সবার স্মরণ থাকা উচিত যে, ইয়াহুদিদের পরাজয় এবং

মুসলিমদের হৃত শক্তি ফিরিয়ে আনার মৌলিক পদ্ধতি হচ্ছে জামাতে উপস্থিত হয়ে মসজিদে সালাত আদায় করা।

অভিশপ্ত ইয়াহুদিরা জানে, মসজিদে জামাত এবং মুসল্লিদের সংখ্যাধিক্য মুসলিম জাতির শক্তি ও দুর্বলতা পরিমাপক মানদণ্ড।

অভিশপ্ত ইসরাইলের সাবেক নেতৃবৃন্দ বলেছে, ইসরাইল ও ইয়াহুদিরা ততদিন নিরাপদে থাকবে যতদিন পর্যন্ত ফজর সালাতে মুসলমানদের মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা জুমার সালাতের সমান না হবে। কাজেই জামাতের সাথে সালাত পড়ার গুরুত্ব আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

ইয়াহুদিরা জুমার সালাতের সময় চ্যানেলে আরবি ভাষায় অশ্লীল ফিল্ম প্রচার করে। যেন লোকেরা জুমা সালাত পড়তে না যায়। তারা ভালো জানে, মুসলমানরা দ্বীনের সাথে যতটুকু সম্পর্ক রাখবে, সালাতে যে পরিমাণ লেগে থাকবে ও আন্তরিকতা দেখাবে, সালাতের জন্য যে পরিমাণ জাগবে, তা তাদের জাগরণ ও শক্তির প্রতীক হবে।

স্মর্তব্য যে, ব্যক্তি ‘হায়্যায়ালাস সালাহ’ ডাকে সাড়া দিতে পারে না সে ‘হায়্যায়ালাল জিহাদ’ এ কিভাবে সাড়া দিবে? যে ব্যক্তি বিছানা ও ঘুমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না সে কিভাবে অস্ত্র হাতে মুসলিম জাতির আত্মমর্যাদা রক্ষা করবে? কিভাবে মসজিদে আকসাকে মুক্ত করবে?

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(৯)
প্রতিবন্ধিতা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন। আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়।

আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি

ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم * فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে ক্রন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

আজকে আমি এমন এক মানবশ্রেণি নিয়ে আলোচনা করবো যারা উচ্চ মনোবলের অধিকারী। যারা তাদের দৈহিক অক্ষমতা, শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশ্বের দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমি এমন এক শ্রেণির লোকদের ব্যাপারে আজকে কথা বলবো যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিবন্ধিতার মসিবত দিয়ে পরীক্ষা করছেন। তাদের মধ্যে অনেকে পায়ে চলতে পারেন না। অনেকে হাত-পা নড়াচড়া করতে পারেন না।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তদ্রূপ কিভাবে তারা সমাজ ও উম্মাহর খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন- সে বিষয়েও আলোচনা করবো।
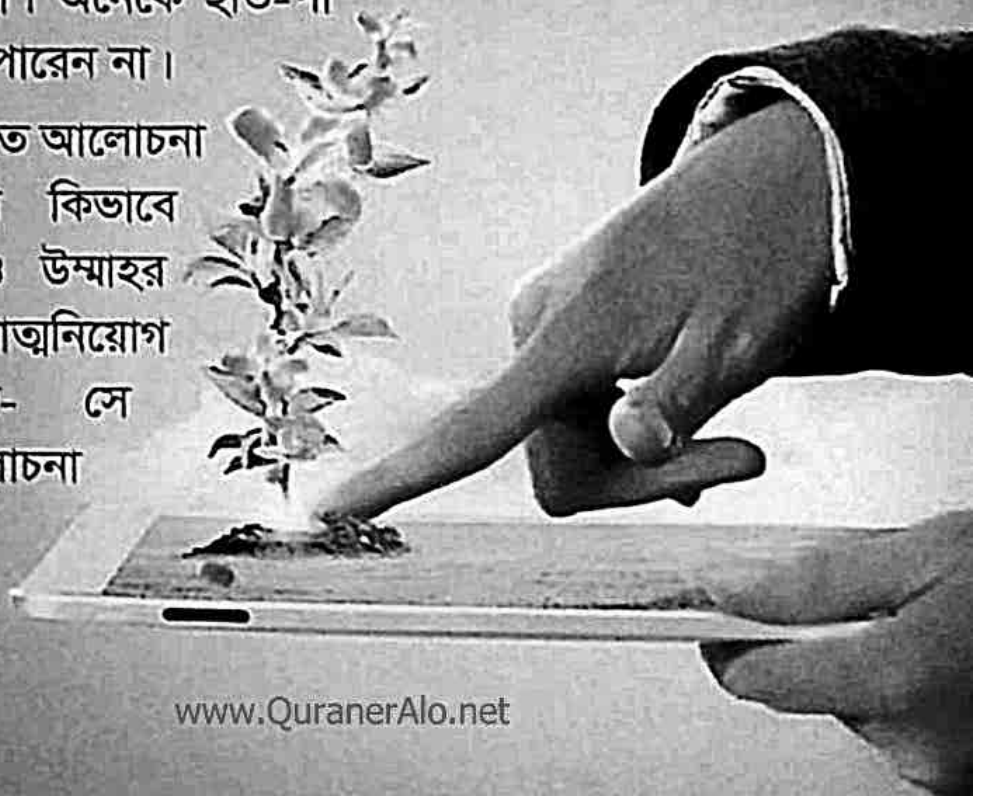
তারা এমন এক শ্রেণি যাদের দেখে আমরা সুস্থরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। এই পৃথিবীর বুকে এধরণের লোকসংখ্যা প্রচুর। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১০% প্রতিবন্ধী। অনেক উন্নত দেশে ১৫%। এই হার সৌদিতে যেমন, ইউরোপেও তেমন। সৌদিতে ৪ থেকে ৫ % সুদানে ৫ থেকে ৭ শতাংশ মরক্কোয় ৩ থেকে ৫ শতাংশ, জর্ডানে ২ শতাংশ। মিসরে একই রকম। এই জরিপ প্রমাণ করে, বিশ্বের বিশাল এক সমাজ প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ

সমাজে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধী লক্ষ্য করা যায়। হাত-পায়ের প্রতিবন্ধী, অনুভূতির প্রতিবন্ধী যেমন বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতা, ব্রেন তথা মানসিক প্রতিবন্ধী, হার্টের প্রতিবন্ধিতা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশু। এছাড়াও আছে অর্ধাংশ অবশ ও হাড় বিকলাঙ্গ শিশু। এসব প্রতিবন্ধিতার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কখনো জন্মের সময় মস্তিষ্কে, হৃদয়ে আঘাত লাগার কারণে হয়। অনেকে জন্মগত বিকলাঙ্গ। এছাড়া অন্যান্য কারণও রয়েছে। যেমন এক্সিডেন্ট, পাহাড় ধ্বস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পারমানবিক ও রাসায়নিক বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি।

আজকে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। আরো আলোচনা করবো সাহাবীযুগের প্রতিবন্ধীদের নিয়ে। প্রতিবন্ধিতা কি তাদের সফলতা থেকে বাধা দিয়েছে? ইতিহাসে সেই সব সফল প্রতিন্ধীদের সংগ্রামী জীবন নিয়ে আলোচনা করবো যারা হয়েছেন মুজাহিদ, বিজ্ঞ আলিম, বিজ্ঞানী, ডাক্তার।
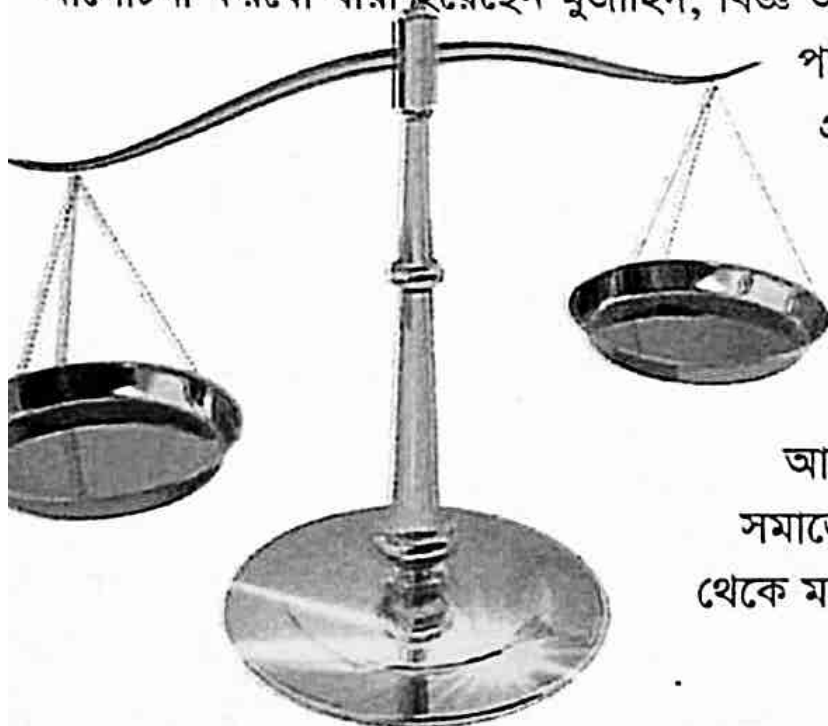
পাশাপাশি সমাজে বিদ্যমান প্রতিবন্ধীদের সাথে আমাদের দায়িত্ব ও আচার-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো।

শুরুতে এটা জানা আবশ্যক যে, আমাদের সমাজে শারীরিক প্রতিবন্ধী থেকে মানসিক প্রতিবন্ধী বেশী।

আমার সাথে বন্ধুবর আহমদ শাহরীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি একজন প্রতিবন্ধী মানুষ। এক্সিডেন্টের কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। শুধু মাথা নড়াচড়া করতে পারতেন।

যদি আমি ছুড়ি দিয়ে তার হাত-পায়ে আঘাত করি তবু তিনি কোন অনুভব করবেন না। কিন্তু দেখা যাবে রক্ত ঠিকই গড়িয়ে পড়ছে। অথচ তার কোন অনুভূতি শক্তি নেই।

তা সত্ত্বেও তিনি এখন মাস্টার্স ডিগ্রীধারী একজন বিদ্বান ব্যক্তি। অথচ মাধ্যমিক ক্লাশে পড়াকালীন রোগে আক্রান্ত হন। তিনি মসজিদে ধারাবাহিক দরস দেন। মানুষকে শরয়ী ঝাড়ফুঁক করেন। এই বক্তিকে আমি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, 'আমি সেই ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী মনে করি না যে নিজের হাত-পা নড়াচড়া করতে পারে না। বরং প্রকৃত প্রতিবন্ধী সে-ই, যে ফজরের আজান শুনে কিন্তু মসজিদে সালাত পড়ার জন্য বের হয় না।'

তার জন্য ছোট মেশিন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা থুতনী দিয়ে লড়াতে হয়। সেটা দিয়ে তিনি হুইল চেয়ারকে ডানে-বামে নিয়ে যান।

স্মর্তব্য, এ ধরণের লোকদের দৃশ্য আমাদের মত সুস্থ সবল মানুষের জন্য উপদেশতুল্য। আল্লাহ আমাদের দৈহিক ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সমাজের কল্যাণে কোন অবদান রাখতে সচেষ্ট নই।
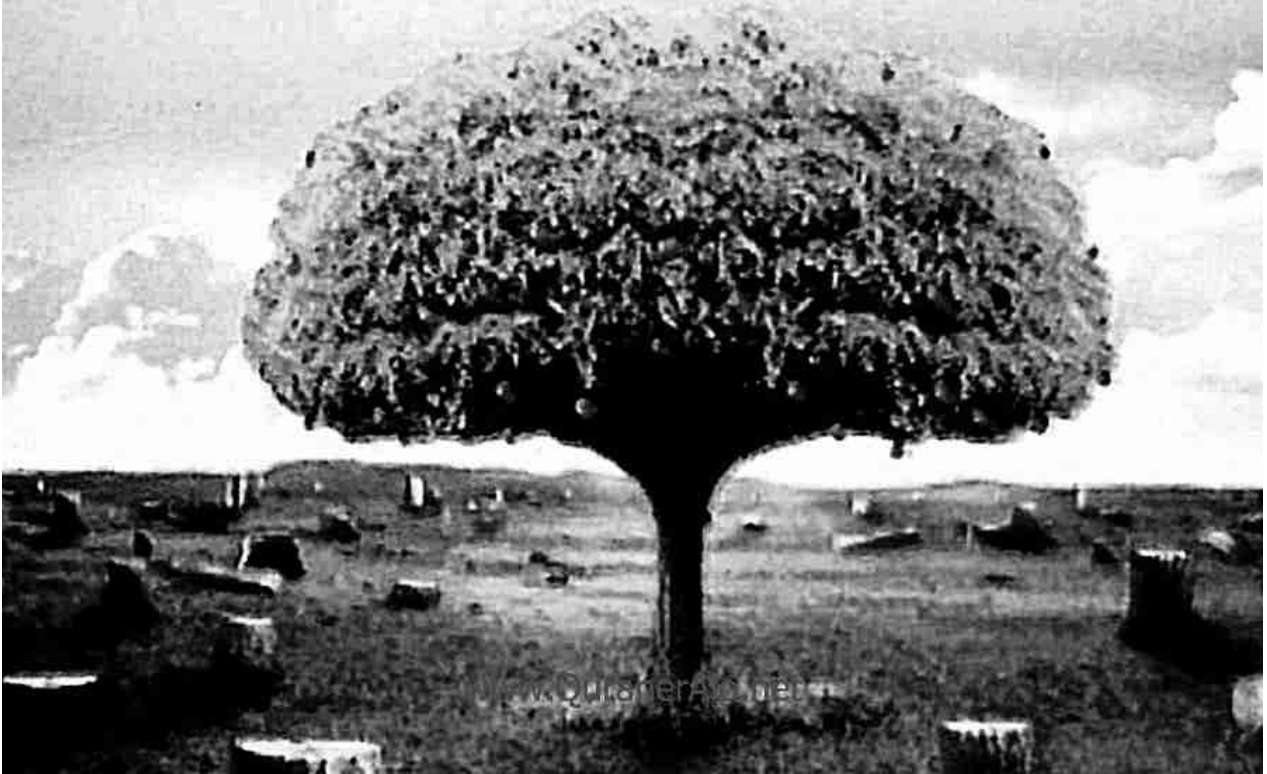
একজন সুস্থ ব্যক্তি যখন দেখে, এই অক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজে সংস্কারমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। জুমার খুতবা দিচ্ছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হচ্ছেন। অথচ সে অক্ষমতার রোগে আক্রান্ত। তখন তার বিবেকে এই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া চাই, আমি সমাজের জন্য কী করলাম? আমার হিম্মত কত ছোট! এই প্রতিবন্ধীর হিম্মত খুব উচ্চ ও মজবুত।

আমি এমন অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি যারা বিশ বছর ধরে নাক দিয়ে খাবার খাচ্ছেন। মুখ দিয়ে খাবার খেতে পারেন না। তা সত্ত্বেও তারা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

প্রতিবন্ধিতা আল্লাহ তায়ালার একটি পরীক্ষা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে পরীক্ষানিমিত্ত আক্রান্ত করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

আমিই তাদের মধ্যে জিবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি। *[সূরা যুখরুফ : ৩২]*

হাদীসে এসেছে, আল্লাহ যখন কাউকে পছন্দ করেন, তখন তাকে পরীক্ষায় লিপ্ত করেন।

অন্য হাদীসে এসেছে, মুমিনের জীবনের উপর দিয়ে বালা মুসিবত পড়তেই থাকে এমনকি এক পর্যায়ে তার কোন গুনাহ থাকে না।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. বলেন, আমাদের জীবনে বিপদাপদ না থাকলে আমরা কিয়ামত দিবসে নিঃস্ব সহায়-সম্বলহীনভাবে উপস্থিত হতাম।

সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম। তারপর নেককার ব্যক্তিবর্গ। ব্যক্তি তার ধার্মিকতা অনুপাতে বিপদের মুখোমুখি হয়।

ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিবন্ধীদের সাথে বিভিন্ন জাতি নানারকম আচার ব্যবহার করেছে। রোমানরা মানসিক প্রতিবন্ধীদের ধনীদের আত্মপ্রশান্তি ও প্রবোধ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতো। গ্রিকরা তাদের পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করতো না। ফলে তাদেরকে হত্যা করে ফেলতো।

বর্তমান যুগেও এই নৃশংসা বিদ্যমান আছে। ইউরোপে বসবাসকারী জনৈক সৌদি ডাক্তার আমার সাথে যোগাযোগ করে জানালেন, শায়খ! এখানে চিকিৎসকদের মাঝে একটি বিশেষ গোপনীয় নীতি আছে। হাসপাতালে যদি এমন দুরারোগ্য ব্যাধিআক্রান্ত কোন মুমূর্ষ রোগী আসেন যার জীবনের আশা নেই। তখন ডাক্তারগণ রোগীর খাবারের সাথে এমন মেডিসিন পদার্থ মিশিয়ে দেয় যা তার যন্ত্রণাকে সাময়িক লাঘব করে কিন্তু তাকে মেরেও ফেলে। সেই আহার্য গ্রহণের কিছুক্ষণ পরই সে মারা যায়।

তারা এই অনৈতিক কাজ করলেও আমার কিছুই করার শক্তি নেই। আজকে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত একজন মুসলিম রোগী এসেছেন। তিনি ইউরো অনেক দিন থাকেন। ডাক্তারগণ তাকেও সেই মৃত্যুদানকারী ঔষধ ? করাতে যাচ্ছে। সুতরাং আমি কি তার পরিবারকে এ ব্যাপারে অবগত কা দিব?

আমি তার প্রশ্নের কারণে এতটুকু বিস্ময়ান্বিত হয়নি যতটুকু হয়েছি ইউরোপীয়দের মানবতাবিরোধী নৃশংসতা দেখে। হায়! কোথায় মানবতা!! তারা আপনাকে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার উপযুক্ত মনে করে না। তাদের মতবাদ অনুযায়ী, আজকের পর আপনি আর হাঁটতে পারবেন না, চাকুরী করতে পারবেন না।

সন্তানদের সাথে জীবন যাপন করতে পারবেন না। (তাই আপনাকে জীবিত রেখে লাভ কী?)

কিন্তু আপনি তো আল্লাহর যিকির করতে পারবেন। আপনার যবান তো চালু আছে। দুআ-ইস্তেগফার পাঠ করতে তো কোন প্রতিবন্ধিতা নেই। আপনি আপনার প্রভুর সাথে সম্পর্ক রাখতে তো সক্ষম। (তাহলে তারা কেন আপনাকে মেরে ফেলতে চায়?)

খ্রিস্টান যুগে অনেকে প্রতিবন্ধীদের আল্লাহর পুত্র মনে করতো। আবার মধ্যযুগে তাদের উপর বর্বরতা চালানো হতো। প্রতিবন্ধীদের রাস্তায় ফেলে রাখা হতো। মোটকথা, প্রতিবন্ধীদের সাথে যুগে যুগে মানুষ নানান ধরণের আচার-ব্যবহার করেছে।

আব্বাসী খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক মানসিক প্রতিবন্ধীদের সেবা যত্ন ও শিক্ষাদানের জন্য সর্বপ্রথম একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান চালু করেন। যা ৮৮ হিজরী ৭০৭ খ্রিস্টাব্দের কথা। আজ থেকে ১৩০০ বছর পূর্বে। তারপর অন্যান্য খলীফাগণও বাগদাদে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও আশ্রয় নিকেতন চালু করেন। সেখানে তাদের সেবা যত্ন ও শিক্ষাদান করা হতো।

আজকে আমি প্রতিবন্ধীদের প্রসঙ্গে কথা বলছি। হয়ত আল্লাহ আমাদের উপকৃত করবেন। অনেকে প্রতিবন্ধীদের ত্রুটিপূর্ণ মানুষ মনে করে। অথবা এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয় যার দেখাশোনা ও পরিচর্যা করা উচিত। বস্তুত ধারণাটি ভুল। কেননা, যার সামান্য বিবেক বুদ্ধি আছে, তার অভ্যন্তরেও বহৎ প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। সে সঠিক তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার ফলে একদিন বিখ্যাত কবি, লেখক, জ্ঞানী, আলেম হতে পারে।

তবে তারা আমাদের সমাজ থেকে একটু সহায়তার মুখাপেক্ষি। আপনার একটু আন্তরিকতা, খোঁজ-খবর এবং সান্ত্বনামূলক কথা তাদের জীবন পাল্টে দিবে।

মানুষ জন্মগতভাবেই দুর্বল। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا
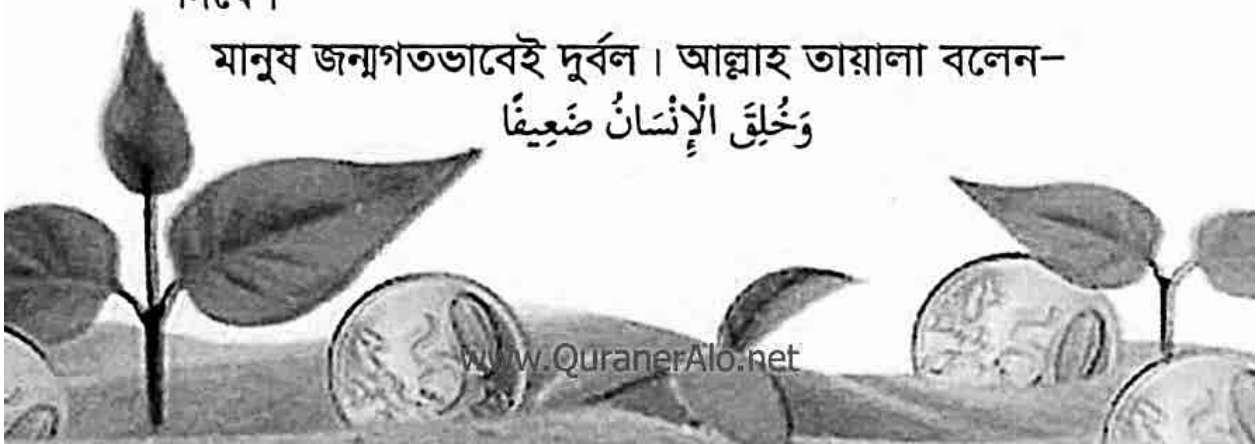
মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। *[সূরা নিসা : ২৮]*

আজকে যারা সুস্থ আছেন তারা যে কোন মুহূর্তে আপন শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারেন। হয়ত পাহাড় থেকে পড়ে যেতে পারেন। গাড়ি এক্সিডেন্ট হতে পারে। আমি একটি পঙ্গু হাসপাতালে রোগীদের খোঁজ-খবর নিয়েছি। সেখানে অনেক রোগী শুধুমাত্র মাথা বা হাত নাড়াতে পারেন। তারা আমাকে বলেছেন, তারা এক সময় সুস্থ ছিলেন। কিন্তু কালের দুর্বিপাকে তাদের এই অবস্থা হয়েছে।

শায়খ আহমদ ইয়াসিন রহ.। ফিলিস্তিনের সংগ্রামী মুজাহিদ। ১৬ বছরের কিশোর সমবয়সীদের সাথে খেলাধূলা করছিলেন। হঠাৎ মেরুদণ্ডের হাড়ে আঘাত লেগে এক চতুর্থাংশ অবস হয়ে যায়। (কিন্তু তিনি প্রতিবন্ধী হয়েও উম্মাহর জন্য কত কাজ করে গেছেন।)

সুতরাং যে কোন মুহূর্তে আমি এই বিপদে পতিত হতে পারি। কাজেই মানুষের উচিত সর্বদা আল্লাহর কাছে সুস্থতা কামনা করবে।

আমি প্রিয় বন্ধুদের এই বার্তা পাঠাতে চাই যে, আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসেন বলেই বিপদে ফেলেন। তাই বান্দার ঈমান মজবুত করে অধিক কাজ করা চাই। যারা এখনো বিপদে পড়েন নি তাদের উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تُطِيلُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُوْمِ

'তোমরা কুষ্ঠরোগীর প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টি দিও না।' অর্থাৎ আমরা যেন রাস্তাঘাটে হাটে বাজারে তার প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টি দিয়ে তাকে অবজ্ঞা না করি। বরং আমাদের দৃষ্টি হতে হবে স্নেহপূর্ণ, দয়ার্দ্র এবং তাদের সাথে ভদ্রতার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ কথা বলতে হবে।

জনৈক প্রতিবন্ধী বাজারে হাঁটছিলেন। তিনি পাদ্বয় লোহায় ভর করে রেখেছিলেন।

কেননা তিনি পক্ষাঘাত রোগী ছিলেন। পাশ দিয়ে এক মহিলা বাচ্চা নিয়ে অতিক্রম করছিল। শিশুটি মাকে প্রশ্ন করল, তার কেন এমন হয়েছে? তখন মা উত্তর দিল, সে তার মায়ের কথা শুনতো না।

সেই প্রতিবন্ধী বলেন, শায়খ, মহিলার উত্তরটি যেন আমার হৃদয়ে আঘাত করে। আমি শিশুকে চিৎকার করে বলতে চাইলাম, দেখ, 'এটা আল্লাহর পরীক্ষা। আমাকে আল্লাহ ভালোবাসেন।' (তাই পরীক্ষায় ফেলেছেন) সুতরাং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে।

লেবাননের বন্ধুবর ফাদি, যার অর্ধাংশই অবস। কিন্তু তিনি তা সত্ত্বেও প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। তিনি তার জীবনের সাফল্য সম্পর্কে বলেন, "যে ব্যক্তি জীবনকে ভালোবাসে এবং হৃদয়ে উচ্চ আশা পোষণ করে তার উচিত কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা করবে। তাকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কাঙ্খিত লক্ষ্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ব্যতীত সহজে অর্জন করা যাবে না। যেমন তিক্ততা ব্যতীত মিষ্টতার স্বাদ অনুভব করা যায় না।

আমি নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে করি না। বরং নিজেকে অন্যান্য সুস্থ মানুষের মতোই মনে করি। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রতিবন্ধিতা আমাকে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে।
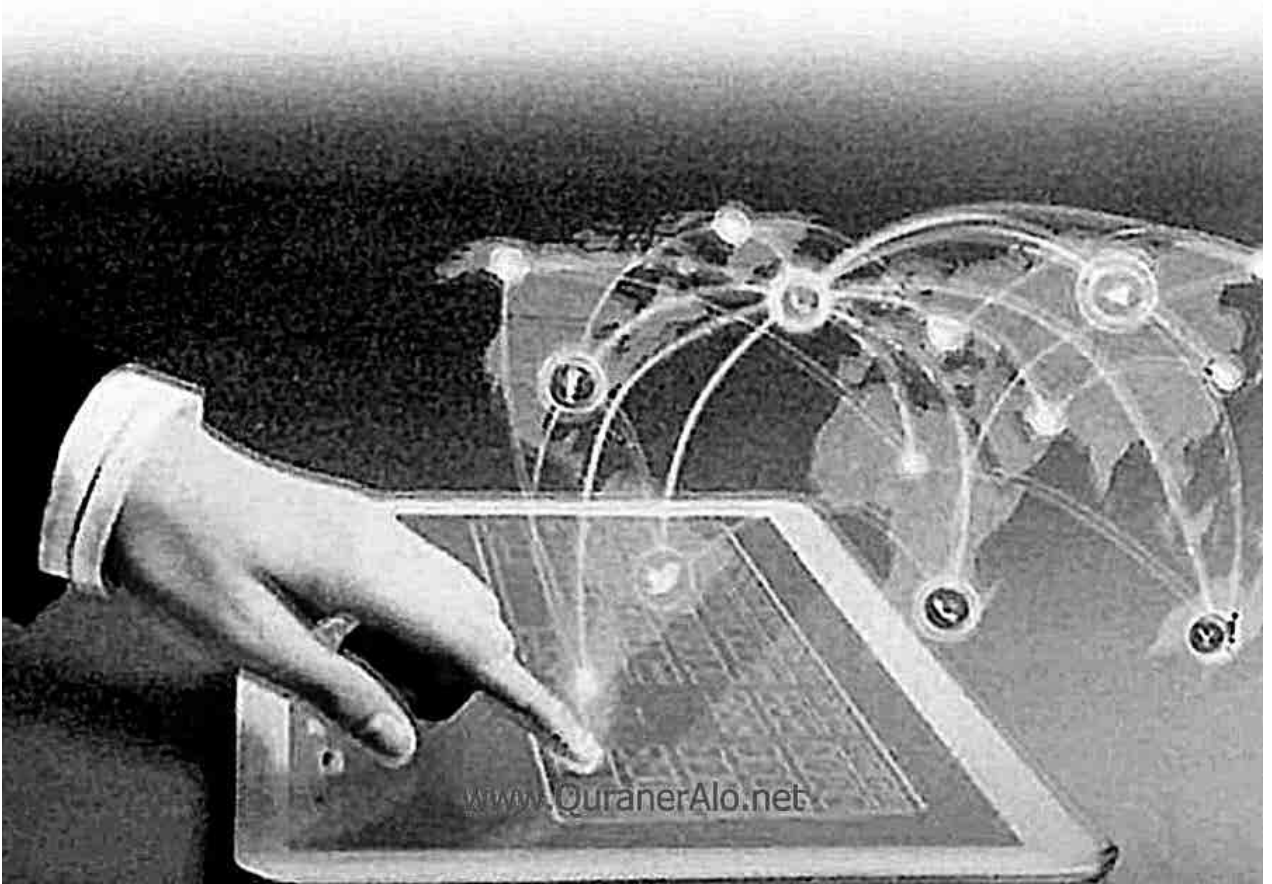
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আমার কাঙ্খিন স্বপ্নের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এই প্রতিবন্ধিতা থেকেও অনেক উর্ধ্বে। আমি বড় সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি। সুতরাং নিজের জীবনের প্রতিষেধক আমি নিজেই ছিলাম। কোন ব্যক্তি যদি একই স্থানে বসে থাকে তাহলে সে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। তাই প্রতিবন্ধিতার দিকে না তাকিয়ে, আমি আমার চিন্তা-চেতনাকে বিশাল লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিয়োজিত করলাম। অথচ এই প্রতিবন্ধিতা আমার জীবন নাশ করে দিতে পারতো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সংকীর্ণতা থেকে বের হতে প্রশস্ত দিগন্তে দৃষ্টিপাত করা।

জন্মের কিছূ দিন পরই আমার এই রোগ হয়। এখন আমি বিভিন্ন সামাজিক প্রোগ্রামের উপস্থাপক। দম্পত্তি, বয়োজ্যেষ্ঠদের মানসিক চিকিৎসায় কাজ করি। আমি মধ্যপ্রাচ্যে এমন একটি সংগঠনের দায়িত্বশীল যারা প্রতিবন্ধীদের সামাজিক গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। যেন প্রতিবন্ধীরা নিজেদের অসহায় মনে না করে অন্যদের সাথে সমান তালে কাজ করে যেতে পারে।"

আজকে আমি প্রতিবন্ধীদের সম্বোধন না করে সমাজকে সম্বোধন করছি। কেননা, আমি মনে করি প্রধান প্রতিবন্ধিতা আসে সমাজ থেকে। সমাজই তার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের প্রতিভা ধ্বংস করে দেয়। এসব প্রতিবন্ধী ভাইয়ের চিন্তা-চেতনা শক্তি আছে। তারা শিক্ষা গ্রহণ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। বিবাহ করতে চায়।

আমাদের সাথে মিশতে চায়। বক্তৃতা দিতে চায়। তাই আমাদের মানসিক সংকীর্ণতা দূর করতে হবে।

তাদের প্রতি দৃষ্ঠিভঙ্গি বদলাতে হবে। তারা আমাদের সমাজেরই অংশ। তারা আমাদের মতোই মানুষ।

আবারো বন্ধুবর ফাদির কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেন, 'মানুষের যে পরিমাণ শক্তিই ছিনিয়ে নেওয়া হোক না কেন তার উচিত বাকি শক্তির যথার্থ ব্যবহার করা।' উদাহরণত তার পা যদি না থাকে তাহলে তো হাতদ্বয় আছে। তোমার ১০০ ভাগ যদি শক্তি থাকে। তারপর ৫০% কমে যায় তাহলে বাকি ৫০% ব্যবহার করো। বাকী ৫০% কেও নিঃশেষ করে দিও না।

তিনি প্রতিবন্ধীদের সাথে আমাদের ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষাদানকালে বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুকে অসহায়, দুর্বল বলবেন না। বরং এভাবে বলুন, তুমি যদিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার নিকট দুই হাত আছে যা দিয়ে তুমি কম্পিউটার চালাতে পার। তুমি দক্ষ উপস্থাপক হতে পারো। প্রখ্যাত লেখক, আলেম হতে পারো। তোমার যদি হাত পা অবস হয়ে থাকে, তাহলে স্মৃতিশক্তিতো আছে। তা দিয়ে তুমি বড় মুফতী, ধর্মবিশেষজ্ঞ হতে পার। আমাদের ভাই আহমদ শাহরী টেলিপরামর্শ দিয়ে থাকেন। অথচ তিনি পঙ্গু। তিনি জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

সুতরাং শরীর বড়-ছোট কোন গ্রহণযোগ্য বিষয় নয়। মুনাফিকরা দৈহিক অবয়বে সাহাবীদের তুলনায় অনেক সুন্দর ছিল। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন–

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ
خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ

আপনি যখন তাদের দেখেন তখন তাদের দেহ (অবয়ব) আপনাকে আশ্চর্যান্বিত করে।

[সূরা মুনাফিকুন : ৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. একবার গাছে উঠলেন। ঘটনাক্রমে বাতাস এসে তার কাপড় উড়াতে লাগল। তাতে তার চিকন পাদ্বয় দৃশ্যমান হলে সাহাবায়ে কেরাম হাসতে লাগলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এই চিকন পাযুগল দেখে হাসছো? আল্লাহর শপথ, তার হাশরের মিযানে উহুদ পাহাড় থেকেও ভারি।

সুতরাং বিশাল দেহ, শারীরিক শক্তিমত্তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং সফলতার পূর্বশর্ত নয়। বরং মানসিক মনোবল, হিম্মত ও সাফল্যের জন্য প্রচেষ্টাই দেখার বিষয়।

আমাদের সামনে তিনজনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত আছে। শায়খ আহমদ ইয়াসিন (ফিলিস্তীন) শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. (সৌদি) তিনি অন্ধ ছিলেন। শায়খ আব্দুল হামিদ। এদের সাফল্যমন্ডিত জীবনের আলোকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, প্রতিবন্ধী মানুষও অন্যান্য মানুষের ন্যায় জীবনে সফল হতে পারবে।

একবার জনৈক যুবক এসে আমার কাছে অভিযোগ করল, তার প্রধান সমস্যা হচ্ছে সে মানুষের সাথে কথা বলতে গেলে কথা আটকে যায়। তখন আমি তাকে বললাম, তোমার কথা সঠিক নয়। তুমি আমার সাথে সাত মিনিট ধরে কথা বলছো অথচ তোমার জিহ্বা সাবলীল, কোন জড়তা নেই। সুতরাং তুমি চেষ্টা কর এমনভাবে কথা বলতে যেন তোমার কোন জড়তা নেই।

আপনার পরিবারে প্রতিবন্ধী যদি শিশু হয় তাহলে তার দুরবস্থা অপরের কাছে বর্ণনা না করে বরং তার প্রশংসা করুন। তার সাথে আন্তরিক ব্যবহার করুন। সে যদি কখনো বলে, আব্বু আমি বন্ধুদের সাথে মাঠে খেলতে পারি না। তাহলে তাকে বলবেন না 'তুমি ভবিষ্যতে খেলতে পারবে।'

বরং তাকে এভাবে বলুন, দেখ, আল্লাহ তোমাকে অনেক মেধা দিয়েছেন যা তোমার বন্ধুদের দেন নি। মানুষের হৃদয়ে তোমার স্নেহ মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি আবার এই বিপদও দিয়েছেন। (সুতরাং ব্যথিত হয়ো না। বরং তোমার সাধ্যের কাজ তুমি করে যাও।)

এভাবে কোম্পানির মালিক ও সমাজের ধনী ব্যক্তিবর্গের নৈতিক দায়িত্ব প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী কর্মক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়া।

আমাদের সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয় কোম্পানিসমূহের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের সময় এই বিধান রেখেছে যে, যদি কেউ একজন প্রতিবন্ধী কর্মচারী নিয়োগ দেয় তাহলে সে তিনজন সুস্থ কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে বলে গণ্য হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোম্পানীগুলোকে প্রতিবন্ধী নিয়োগে উৎসাহিত করা। এরা কম্পিউটার, রিসিপশন (অভ্যর্থনা) বা এধরণের সহজ কাজ করতে পারবে। তাছাড়া কাজে ব্যস্ততার ফলে সে মানসিক অবসাদ থেকে নিস্কৃতি পাবে। পাশাপাশি যিনি তাকে সাহায্য করছে তিনিও আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন।

সুতরাং আমার আহ্বান, যেসব ভাই-বোন প্রতিবন্ধিতার বিপদে লিপ্ত হয়েছেন তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী সমাজে অবদান রাখতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী আমলের হিসাব নিবেন। প্রতিবন্ধীকে জিজ্ঞাসা করবেন না, কেন তুমি জিহাদে বের হলে না। কেননা, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিবন্ধী পঙ্গু, রোগী ও অন্ধের কোন কৈফিয়ত নেই।

তাহলে তাকে বলবেন না 'তুমি ভবিষ্যতে খেলতে পারবে।'

বরং তাকে এভাবে বলুন, দেখ, আল্লাহ তোমাকে অনেক মেধা দিয়েছেন যা তোমার বন্ধুদের দেন নি। মানুষের হৃদয়ে তোমার স্নেহ মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি আবার এই বিপদও দিয়েছেন। (সুতরাং ব্যথিত হয়ো না। বরং তোমার সাধ্যের কাজ তুমি করে যাও।)

এভাবে কোম্পানির মালিক ও সমাজের ধনী ব্যক্তিবর্গের নৈতিক দায়িত্ব প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী কর্মক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়া।

আমাদের সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয় কোম্পানিসমূহের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের সময় এই বিধান রেখেছে যে, যদি কেউ একজন প্রতিবন্ধী কর্মচারী নিয়োগ দেয় তাহলে সে তিনজন সুস্থ কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে বলে গণ্য হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোম্পানীগুলোকে প্রতিবন্ধী নিয়োগে উৎসাহিত করা। এরা কম্পিউটার, রিসিপশন (অভ্যর্থনা) বা এধরণের সহজ কাজ করতে পারবে। তাছাড়া কাজে ব্যস্ততার ফলে সে মানসিক অবসাদ থেকে নিস্কৃতি পাবে। পাশাপাশি যিনি তাকে সাহায্য করছে তিনিও আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন।

সুতরাং আমার আহ্বান, যেসব ভাই-বোন প্রতিবন্ধিতার বিপদে লিপ্ত হয়েছেন তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী সমাজে অবদান রাখতে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী আমলের হিসাব নিবেন। প্রতিবন্ধীকে জিজ্ঞাসা করবেন না, কেন তুমি জিহাদে বের হলে না। কেননা, পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিবন্ধী পঙ্গু, রোগী ও অন্ধের কোন কৈফিয়ত নেই।

আল্লাহ তায়ালা বোবাকে বলবেন না কেন তুমি খুতবা দেওনি।

অন্ধকে বলবেন না 'কেন তুমি শিশুকে আগুন থেকে উদ্ধার করলে না?' কিন্তু তিনি প্রতিবন্ধীকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন সে অনুপাতে দায়িত্ব সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করবেন।

প্রকৃত প্রতিবন্ধী কারা?

পূর্বে আমি বলেছি, প্রতিবন্ধী সেই ব্যক্তি নয় যে বিছানায় শুয়ে থাকে বা হুইল চেয়ারে সারা জীবন বসে কাটিয়ে দেয়। বরং প্রকৃত প্রতিবন্ধী সেই ব্যক্তি যে ফজরের নামাজ পড়ে না। এই ব্যক্তি তার হিম্মত ও ঈমানি শক্তিতে প্রতিবন্ধী।

প্রকৃত প্রতিবন্ধী ঐ ব্যক্তি যে ভালোভাবে পড়া-লেখা করে না। জ্ঞান পিপাসু নয়। এটা তার চিন্তা-চেতনা ও মেধার প্রতিবন্ধিতা। প্রকৃত প্রতিবন্ধী সেই দুঃখবাদী ব্যক্তি যে তার জীবনকে শুধুই অন্ধকার দেখে। তার দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা নেতিবাচক। এটা তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবন্ধিতা। যে ব্যক্তি গোনাহ বর্জন করতে পারে না, এটা তার ইচ্ছাশক্তির প্রতিবন্ধিতা।

তাই বুঝা গেল চেয়ারে বসে থাকলেই প্রতিবন্ধী নয়। বরং প্রকৃত প্রতিবন্ধী ঐ ব্যক্তি যে জীবনে সফলতার মুখ দেখেনি। সমাজ সংস্কার করে অবদান রেখে যেতে পারে নি। এই ব্যাপারে আমাদের সামনে অনেক জীবন্ত নমুনা আছে। কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করা হলো।

আবান ইবনে উসমান ইবনে আফফান রহ. বধির, কুষ্ঠরোগী এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঈমানি শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অনেক উর্ধ্বে ছিল। তিনি তাবেয়িদের মধ্যে প্রথম কাতারের ফকীহ ধর্মবিশেষজ্ঞ ছিলেন। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান তাকে ৭৬ হিজরী ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মদীনার গর্ভনর হিসাবে নিয়োগ দেন।

সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস রা. যখন পারস্য অভিযান পরিচালনা করেন তখন রুস্তম মুসলমান প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে ইচ্ছা পোষণ করে।

তখন সাদ রা. রাবয়ী ইবনে আমির রা. কে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। অথচ তিনি প্রতিবন্ধী ছিলেন। তার এক পা আরেক পা থেকে ছোট ছিল। তিনি রুস্তমের অভিজাত দরবারে গিয়ে বর্শায় ভর করে দাঁড়ালেন।

রুস্তম তাকে বলল, তোমরা চাইলে আমরা তোমাদের ধন-সম্পদ, খাবার-দাবার, উন্নত পোষক দিতে পারি। তবে তোমাদের চলে যেতে হবে।

প্রতিনিধি সাহাবী বললেন, না তা হবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার বান্দাদের বান্দার ইবাদত থেকে একক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রেরণ করেছেন। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে আখেরাতের প্রশস্ততা এবং বিভিন্ন ধর্মের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন।

রুস্তম বলল, আমাদেরকে একমাস সময় দাও। আমরা চিন্তা করে দেখি।

রাবয়ী রা. বললেন, না আমরা তিন দিন তোমাদের সময় দিলাম। হয়তো আমাদের প্রস্তাব মেনে নিবে অথবা আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

রাবয়ী ইবনে আমির রা. যখন কথা বলছিলেন তখন রুস্তম এক সৈন্যকে ইঙ্গিত করল তাকে হত্যা করে ফেলার জন্য। তখন তিনি এটা বুঝে ফেললেন। তিনি প্রতুৎপন্নমতিত্বের সাথে কৌশল অবলম্বন করে বললেন, হে বাদশা! আমার সাথে আরো দশজন আছে, যারা আমার থেকে অনেক উত্তম। আপনি তাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। (উনার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া) রুস্তম খুশী মনে রাজি হলে তিনি বের হয়ে চলে আসলেন। (রুস্তম ভেবে ছিল হয়তো তিনি বাকী দশজনকেও দরবারে নিয়ে আসবে। ফলে সে সবাইকে একসাথে হত্যা করতে পারবে।)

চিন্তা করুন, একজন পঙ্গু প্রতিবন্ধী মানুষের মেধা কেমন! তিনি প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে যুদ্ধে

প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে।

আমর ইবনে জামুহ রা. কে দেখুন। তিনি খুব পক্ষাঘাতগ্রস্থ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বদর যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনিও বের হলেন। তখন তার সন্তানরা তাকে বাধা দিল। উহুদের ময়দানে আসলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমর! আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নি–

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّ لَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ

প্রতিবন্ধীর কোন দোষ নেই। *[সূরা নূর : ৬১]*

তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আমার পঙ্গুত্ব নিয়ে জান্নাতে যেতে চাই। পরিশেষে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন। জনৈক সাহাবী তার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, যখন তিনি এক হাত খোয়ালেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এরপর অবশিষ্ট হাত দিয়েই এমন যুদ্ধ করলেন যা দুই হাতধারীও পারবে না। (সুবহানাল্লাহ!)

জনৈকা ছাত্রী কথা বলতে পারতো না। কিন্তু সে লিখে লিখে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছে। সে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বার অর্জন করতো।

সুতরাং ইসলাম ধর্ম আমাদের থেকে এই শক্তি, তেজোপনাই প্রত্যাশা করে। ইসলাম চায় আল্লাহ আপনাকে বিপদে ফেলবেন আর আপনি ধৈর্য ধরে সামনে এগিয়ে যাবেন। এজন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন–

أَنَا بَرِيٌّ مِّنَ الْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ

কেননা, মৃতের সাথে পকেট ছিড়া, জামা ফাড়া, চুল ছিঁড়ে ফেলা, চিৎকার করার কোন সম্পর্ক নেই। বরং এক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ ও তার জন্য দোয়া করতে হবে।

তদ্রূপ প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রেও হাতপা গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না। বরং সাধ্যমত চেষ্টা করে যেতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সেসব মুনাফিক যারা সাহাবায়ে কেরামদেরকে জিহাদে যেতে বাধা দিত তাদের প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন–

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا

এদেরকে তিনি প্রতিবন্ধী বলে নামকরণ করেছেন। অথচ তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিবন্ধী ছিল না। কিন্তু তাদের হিম্মত তাদেরকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে দিয়েছে। ফলে তাদের এমন শক্তি নেই যে, তারা যুদ্ধে যাবে। এমনকি অন্যকে পাঠানোর সাহসও নেই। *[সূরা আহযাব : ১৮]*

জার্মানিতে প্রতিবন্ধীর জন্য সার্বিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। সেদেশে প্রত্যেক অফিস, কোম্পানিতে শর্ত আছে, কারো যদি দশজন শ্রমিক থা তাহলে একজন প্রতিবন্ধী থাকতে হবে। এই নিয়ম আমাদের মুস দেশসমূহেও থাকতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে ইসলামিক, ঈমানি এ কুরআনের আলোকে।

প্রতিবন্ধীদের উন্নতিকল্পে কিছু পদক্ষেপ

ইতিপূর্বে প্রতিবন্ধীদের সার্বিক দেখ-ভাল ও তত্ত্বাবধানে পরিবারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা সামান্য চেষ্টা করলেই তাকে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ও সফল ব্যক্তিরূপে গড়ে তুলতে পারি। তবে তার জন্য নিম্ন পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

এক. আমরা তার দায়িত্ব নেওয়া পাশাপাশি উপযোগী পেশার সুব্যবস্থা করে দিতে পারি।
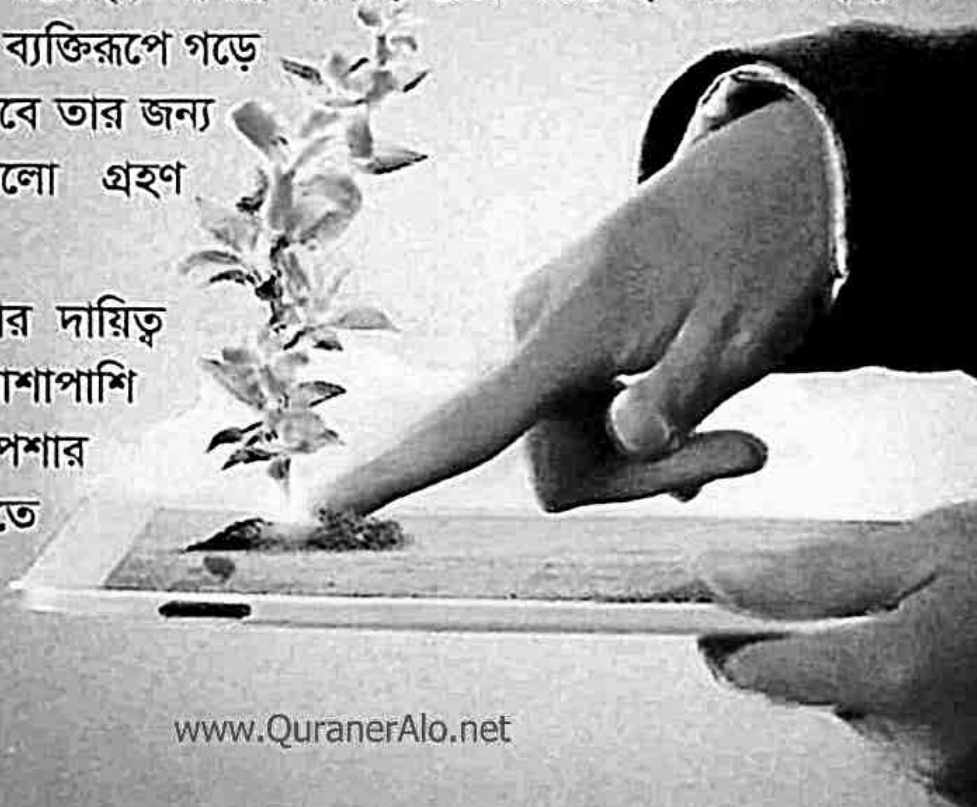
তার সমস্যা ও সমস্যার স্তর এবং ভবিষ্যত প্রত্যাশা ও আগ্রহ কী-তা বুঝতে চেষ্টা করা। (এবং সে অনুপাতে ব্যবস্থা গ্রহণ।)

দুই. পরিবার তার সন্তানের পর্যাপ্ত সেবার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং তাকে অন্যত্র দিয়ে দিবেন না।

তিন. তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাষ বাস্তবায়নের যথাব্যবস্থা গ্রহণ ও অগ্রগতি সাধন।

চার. প্রতিবন্ধীর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া।

পাঁচ. যেসব প্রতিবন্ধী জীবন সংগ্রামে সফল হয়েছেন তাদের সাথে মাঝেমধ্যে এদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া। (এতে করে তাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতায় নিজেদের মনোবল ও সংকল্প দৃঢ় হবে।)

অপরের প্রতিবন্ধিতা সৃষ্টি করবেন না

ইসলামে 'নাফয়ে খাস' তথা ব্যক্তিগত উপকার ও 'নাফয়ে মুতায়াদ্দি' তথা 'সকর্মক উপকার' (যা সর্বদা চলতে থাকে) বলে দুটি কথা আছে। তদ্রূপ ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধী ও সকর্মক প্রতিবন্ধীও আছে। সাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধী বিষণ্ন, অবসাদ, পেরেশান হয়ে বসে থাকে। এই রোগ শুধু তার নিজের আত্মায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমাজে আরেক ধরণের প্রতিবন্ধী আছে যারা নিজেরা তো হতাশা ও দুঃখবাদী। কিন্তু তাদের হতাশা অপরকে সংক্রামণ করে। এরা সকর্মক প্রতিবন্ধী।

আপনাদের একটি ঘটনা বলছি। এর ফলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। এক শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো।

পরীক্ষা চলাকালীন সে পরীক্ষা দিতে গেলে শিক্ষক তাকে বললেন, তুমি কেন এসেছো? তখন ছাত্রটি বলল, 'আমি জীবনে সফল হতে চাই। ভাল চাকরি করে ভবিষ্যত গড়তে চাই।'

শিক্ষক বলল, তোমার কাছে কেউ কি সংসারের খরচ চেয়েছে? বরং তুমি যদি বাসায় এমনি বসে থাক তাহলে তোমার পরিবার তোমার খরচ বহন করবে। (সুতরাং কেন বিদ্যালয়ে এসেছে)

তখন ছাত্রটি হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে আসল এবং বলল, 'শিক্ষক আমাকে মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছেন। তিনি আমাকে বাধা দেন। অথচ আমি পড়তে চাই। সফল হতে চাই।' তখন তার প্রতিবেশী তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুমি তোমার মতো কাজ করে যাও। (সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবে।)

এই হচ্ছে সংক্রামক প্রতিবন্ধী শিক্ষকের গল্প। তার হিম্মতের প্রতিবন্ধিতা অপরকেও আক্রান্ত করছে।

প্রিয় সুধি!

আজকের আলোচনার মূল কথা হচ্ছে, যে যেই রকম প্রতিবন্ধিতার শিকার হোক না কেন তার উচিত আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা। অন্যান্য সামর্থের যথার্থ ব্যবহার করা। পাশাপাশি সাফল্যের জন্য দুআ করবে। কেননা, তার দুআ কবুল হবে। এভাবে যতটুকু সম্ভব শিক্ষা অর্জনে মনোযোগী হবে এবং সাফল্য অর্জনে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে যাবে। কখনো হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দিবে না।

যারা সুস্থ আছেন তাদের কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যদি প্রতিবন্ধী হয় তাহলে তাকে সাহস দিবেন। তার সুপ্ত প্রতিভাকে জাগাতে সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।

আরেকটি কাহিনী বলে আলোচনার ইতি টানছি। একজন স্বনামধন্য শিক্ষিকা গাড়ি দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ববরণ করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে খুব প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। দুর্ঘটনার পর অধ্যাপনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। কেননা, প্রতিদিন কর্মক্ষেত্রে যেতে পারতেন না। কিন্তু তিনি টেলিফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন নামাজিক সেবামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলেন।

তিনি পুরনো কাপড় সংগ্রহ করে অসহায়দের মাঝে বিতরণ করতেন। একপর্যায়ে তার বাড়ি ব্যবহৃত কাপড়ে ভরে যায়। বিভিন্ন লোকদের থেকে প্রাপ্ত পোশাকের বাক্স খুলে শিশুদেরগুলো বয়স্কদের থেকে আলাদা করতেন। কোন কাপড় বেশী ময়লা হলে চাকরকে ধৌত করতে দিতেন। পরবর্তীতে দুঃস্থ ও ইয়াতিম পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে বলতেন, 'আমার কাছে এই এই বয়সের বাচ্চাদের কাপড় আছে। আপনারা এগুলো নিয়ে তাদেরকে পড়তে দিন।'

তিনি টেলি কনফারেন্স করতেন। অথচ তিনি তার পা তুলতে পারতেন না। এভাবেই তিনি সেবামূলক সামাজিক কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছিলেন।

ইমাম গাযালী রহ. তার جَدِّدْ حَيَاتَكَ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আমার জনৈক আলেম বন্ধু এক্সিডেন্টের শিকার হলে তার পা কেটে ফেলা হয়।

তখন আমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি অনেক বড় আলেম ছিলেন। আমি তাকে প্রবোধ দিয়ে বললাম, 'আমি নিশ্চিত থাকুন। কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। কেননা, উম্মাহ আপনার কাছে এটা চায় না যে, আপনি আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বরং উম্মাহ আমার জিহ্বা ও জ্ঞানের মুখাপেক্ষী।'

সর্বশেষ আমার প্রতিবন্ধী ভাইদের বলছি, আপনি প্রতিবন্ধী তাতে কি হয়েছে? আপনি তো আপনার জিহ্বা, মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগাতে পারেন। সুতরাং সামনে অগ্রসর হোন।

বোনদের কাছে আবেদন, আপনাদের কাছে কোন প্রতিবন্ধী বিবাহের প্রস্তাব দিলে যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন তা ফিরিয়ে না দিতে। কেননা, সে তো একজন মু'মিন বান্দা।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই স লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গু অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদ রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(১০)
সর্বত্র কল্যাণ ছড়িয়ে দাও

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم* فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

অনেকে আক্ষেপ করে, 'হায়, আমি যদি সৈনিক হতাম তাহলে ইরাক-আফগানে গিয়ে আমার ভাইদের সাহায্য করতে পারতাম! আমি যদি এত এত মিলিয়ন টাকার মালিক হতাম তাহলে আমার ভাইদের সাহায্য করতে পারতাম।'

না, لَيْتَ 'হায়, যদি' শব্দ বর্জন করুন। এটা কোন কাজে আসবে না। আমি এমন কিছু চিন্তা-ফিকির, মাধ্যম ও পদক্ষেপের আলোচনা করছি যেগুলো অনুসরণ করে আপনি এই উম্মতের সেবায় ব্রতী হতে পারবেন। এজন্য অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী ও মন্ত্রী-অফিসার পদধারী হওয়া শর্ত নয়। তবে উম্মাহর খেদমতের মানসিকতা থাকতে হবে।

আমি আপনাদের সাথে নবীদের জিম্মাদারী সম্পর্কে কথা বলতে চাচ্ছি। যে
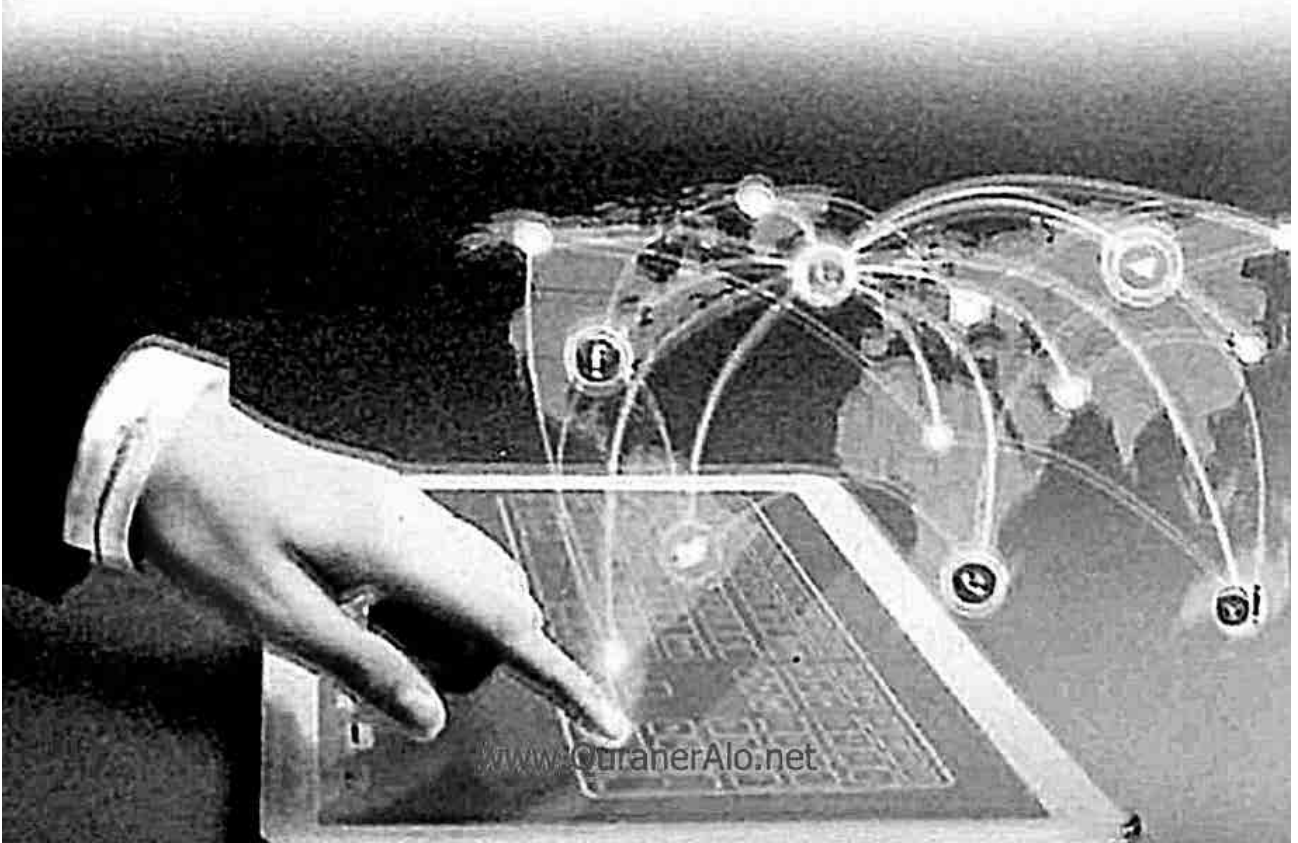
কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীদের প্রেরণ করেছেন। যে জিম্মাদারীকে তিনি ওয়ারিসে নবীদের দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

আজকে আমার আলোচ্য বিষয় এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত যদি তা উম্মতের মাঝে বিদ্যমান থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এই উম্মতের মাঝে এখনো কল্যাণ নিহিত আছে। আর যদি তার অস্থিত্ব না থাকে তাহলে বুঝতে হবে উম্মতের ধ্বংস অনিবার্য।

ইসলামের ধর্মীয় বিষয়াদি গবেষণা ও পর্যালোচনা করলে উম্মত ও উম্মতের সদস্যদের ভাল-মন্দের সার্বিক দেখ-ভাল নির্দেশনায় অনেক ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। এমন ব্যাপকতা যা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কল্যাণে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। তাদের চিন্তা চেতনা ও মানসিকতাকে সমানভাবে বিবেচনা ও সম্মান দিয়েছে। আর এটা কেনই বা হবে না? যেখানে এই ধর্মে অন্যকে দাওয়াত দেওয়া, অন্যের কল্যাণ সাধন ও এই কাজে প্রতিযোগিতা করাকে ধর্মের মূল স্তম্ভ ও উপাদান বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজে কল্যাণমূলক জনহিতকর দাওয়াতি কর্মতৎপরতা চোখে পড়ে না। সামাজিক সেবামূলক ও সৃজনশীল কাজ নেই বললেই চলে। বিশেষ করে এমন সাধারণ কাজ যা করতে বেশী শ্রম ও টাকা লাগে না, তা চোখে পড়ে না। উদাহরণত সমাজে কিতাব বিতরণ, ধর্মীয় নির্দেশনা ও বাণী সম্বলিত পেকার্ড, স্টিকার লাগানো ইত্যাদি কাজে কেউ এগিয়ে আসেন না।

অনেকে ধর্মীয় বিষয়ে স্বল্পজ্ঞানের ওজর পেশ করেন।

তারা মনে করেন এইসব কল্যাণমূলক দাওয়াতি কাজ একমাত্র আলেম ও সমাজ সংস্কারকদের দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকে আমাদের সমাজকে দেয়ালের ইটের ন্যায় গেঁথে গেঁথে বিনির্মাণ করতে পারি। সমাজের প্রত্যেকে ইট বানাতে পারেন। ইসলামের নকশা অংকন করতে পারেন। সুতরাং প্রত্যেককেই তার সাম্যর্থ অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে এবং এই গুরু দায়িত্ব শুধু আলেম-সংস্কারকের কাঁধে চাপিয়ে দিবেন না। অধিকন্তু এসব জনকল্যাণমূলক সৃজনশীল কাজের সওয়াব কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। অনেক সময় এই তুচ্ছ কাজ আপনার দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার কারণ বনে যাবে।

আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, জনসাধারণের মাঝে কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়া। হিকমতের সাথে তাদেরকে ধর্মের পথে দাওয়াত দেওয়া। তাদের সার্বিক উপকার সাধন করা। আলোচ্য বিষয়টি অনেক বিস্তৃত, বিশাল ময়দান, যা অনেক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু আমি কেবল এ কাজের কিছু মাধ্যম নিয়ে আলোকপাত করবো।

জিকির-আজকার সম্বলিত পাকার্ড স্টিকার বিতরণ

আমরা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এমন স্টিকার লাগাতে পারি যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হবে। যাতে থাকে সুন্দর সুন্দর বাণী। ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বাণী সম্বলিত স্টিকার ছড়িয়ে দ্বীন প্রচার করতে পারি। আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর পথে দাওয়াতি কার্যক্রমকে আম্বিয়াদের দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

বলুন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর পথে অন্তর্দৃষ্টি সাথেই আহ্বান করি এবং আমার সাথে

যারা আছে তারাও। *[সূরা ইউসুফ : ১০৮]*

এখানে বলা হয়নি–

قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ اَقُوْمُ اللَّيْلَ وَاَصُوْمُ النَّهَارَ

কেননা, শুধু নামাজ রোযা পালন করলে আমার থেকে উম্মত কি পাবে? তখন তো শুধু ব্যক্তিগত লাভ হবে। এজন্য প্রিয় নবী সা. বলেন–

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ

এখানে বলেন নি–

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَاصِىْ

আলেম যিনি মানুষকে শিক্ষা দেন। তাদের মাঝে খুতবা দেন। তাদেরকে সৎকথা শুনান। তাদের সমস্যা সমাধান করেন। আর যে আবেদ বার রাকাত ইশরাকের নামাজ পড়েন, জোহর ও আসর নামাযের পূর্বে সুন্নতের পাবন্দী করেন, আসরের পরে দুই বা তিন পারা কুরআন তেলাওয়াত করেন, রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং দান সাদাকা করেন তার থেকেও আলেমের মর্যাদা বেশি। কেননা, আবেদের ইবাদত তার ও আল্লাহর মাঝে সীমিত। পক্ষান্তরে আলেমের ইবাদত সমগ্র জাতিতে পরিব্যাপ্ত।

অন্য হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু বলেন–

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

আরেক হাদীসে বলেন–

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى اَدْنَاكُمْ

অর্থাৎ উম্মতের তুলনায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে পরিমাণ মর্যাদা, একজন আবেদের তুলনায় আলেমের সেই মর্যাদা। সুবহানাল্লাহ।

হাদীসে এক হত্যাকারীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। সে ৯৯ জনকে হত্যা করে। তারপর সে তওবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন লোকেদের কাছে যামানা

সবচেয়ে বড় আলেমের সন্ধান চাইল। তারা তাকে এক আবেদের কাছে যেতে বলল। আবেদের কাছে গিয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করল। আবেদ তাকে তিরস্কার করে বলেছিল, '৯৯টি হত্যা করেছ! এখন তওবা করতে এসেছ? যাও তোমার তওবা কবুল হবে না।'

হত্যাকারী রাগান্বিত হয়ে তাকেও হত্যা করে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করল। এর পর তওবার নিয়তে আবার লোকদের কাছে জ্ঞানীর সন্ধান চাইল। এবার লোকেরা তাকে একজন বিজ্ঞ আলেমের সন্ধান দিলে সে তার কাছে গিয়ে তওবার কথা ব্যক্ত করল। এই আলেম সবার সাথে মিশতে পারতেন। তিনি তাকে তওবা কবুলের আশ্বাস দিলেন। তাকে বললেন, তুমি অমুক শহরের গিয়ে দেখবে কিছু লোক ইবাদত করছে তাদের সাথে বসে আল্লাহর ইবাদত করো।

(তাকে এজন্য দূরে যেতে বলেছেন, যেহেতু এই শহরের অধিবাসীর সাথে তার আচরণ ভালো হবে না। সে ইতিঃপূর্বে ৯৯ জনকে হত্যা করেছে। তাই আবার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে।)

মূলকথা হচ্ছে, মানুষের কর্তব্য দাওয়াতি কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা। সমাজের সর্বত্র কল্যাণ ছড়িয়ে অবদান রেখেছে যাওয়া। তাওফিক হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আমরা এমন একটি ধর্ম অনুসরণ করি যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সঠিক ধর্ম। বর্তমানে যা দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমা জরিপেই এই তথ্য উঠে এসেছে।

পশ্চিমারা অভিযোগ করছে, ইদানীং অনেক খ্রিস্টান নাস্তিক হয়ে গেছে।
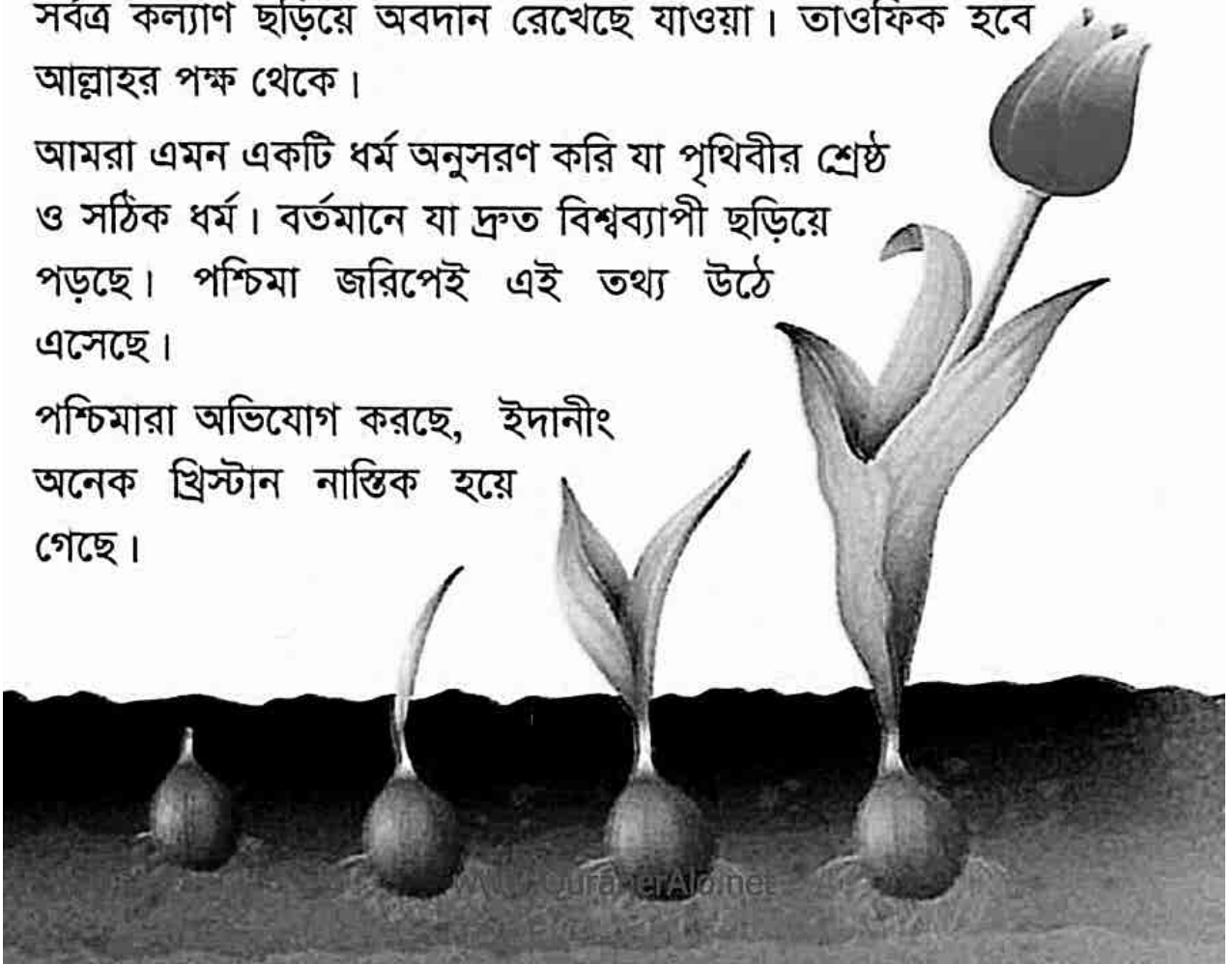
তারা আর খ্রিস্টধর্মে ফিরে আসে নি। অপরদিকে বৌদ্ধ-হিন্দুদের ধর্ম বলতে কিছু নেই। একটি জরিপ মতে, ২০২৫ সালে বেলজিয়ামে ইসলাম হবে প্রধান ধর্ম। জার্মানে ২০০৬ সালে ৪০০০ লোক তাদের ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে কী পরিমাণ ঘোষণা করছে তা তো বলাই বাহুল্য।

এসব রিপোর্ট পড়লে বুঝা যায় ইসলাম কত দ্রুত গতিতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। আমি এখানে অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার প্রসঙ্গ আনবো না। সেটা সামনে আসবে। বরং আমি মুসলিমদের মাঝে দাওয়াত প্রচার নিয়ে আলোচনা করবো।

বাজারে গমনকালীন দুআ প্রচার করা

আপনি বাজারে গমনকালীন দুআটি প্রচার করতে পারেন। সহীহ হাদীসে এসেছে, প্রিয় নবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এই দুআ পড়বে–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তার আমলনামায় হাজার হাজার নেকী লেখা হবে এবং হাজার হাজার গোনাহ ক্ষমা করা হবে।

অনেক ভাই তাদের গাড়ীতে করে বিভিন্ন ইসলামিক সিডি, ক্যাসেট নিয়ে যায়। (আল্লাহ তাদের প্রতিদান দান করুন) তারা যুবকদের সমাবেশ যেমন খেলার মাঠ বা বাগান, পার্কে যান।

তার গাড়িতে লেখা থাকে, 'গানের সিডি বিনিময়ে ইসলামি সিডি বিতরণ করি।'

ফলে তার গাড়ির সামনে যুবকরা এসে গানের সিডি দিয়ে ইসলামি সিডি নিয়ে যায়।

অনেক ভাই সেলুনে কিছু স্টিকার লাগিয়ে রাখেন যেন চুল কাটার জন্য অপেক্ষার সময় ফাঁকে ফাঁকে লোকেরা তা পড়তে পারে। ফলে তারা বসে বসে টিভি দেখবে না বা মোবাইলে গেমস খেলবে না।

এসব দাওয়াতি কার্যক্রম মানুষ হৃদয়ে ধর্মীয় তায়াল্লুক (সংযুক্তি) সৃষ্টি করে দিবে। উল্লেখ্য, অনেক ভাইকে যখন বেশী সওয়াব সম্বলিত কিছু দুআ-যিকিরের কথা বলা হয় তখন সে আশ্চর্যবোধ করতে পারে। তখন সে বলবে, দুটি কালিমা মাত্র কিন্তু এত সওয়াব হবে!! তাহলে আমি কেন রেঁস্তোরা, হোটেলে বিশেষ বিশেষ দুআগুলো লাগিয়ে দিবো না যা তারা হোটেলে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় পড়বে? আমরা তো হোটেল মালিকদের সাথে সমঝোতা করে এমন করতে পারি।

এই সব দাওয়াতি কাজের জন্য প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে আপন বাড়ি। আমাদের বাসা, অফিস, দোকান যেখানে নিকটাত্মীয়কে প্রথমে কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে পারি।

আপনি যে মহল্লায় বসবাস করেন সেখানে নিশ্চয় যুবকদের একটি মিলনায়তন আছে। প্রবীণদের মজলিস হয়। আপনি এসব পাবলিক পেসে সাধ্যমতো দাওয়াতি কর্মতৎপরতা চালাতে পারেন। তাদের সামনে ইসলামী পাকার্ড, ফেস্টুন, স্টিকার লাগিয়ে রাখতে পারেন। ফলে তারা অহেতুক গল্পগুজব করার পরিবর্তে এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

এক বৃদ্ধা মহিলার নিকট সকালে প্রতিবেশী মহিলারা একত্র হতো। তিনি তাদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করতেন। মহিলা তাদের বলতেন, আমি তোমাদের সামনে বক্তৃতা দিতে পারবো না। কিন্তু তোমাদের (কুরআন তিলাওয়াত বা ধর্মীয়) ক্যাসেট শুনাতে পারি। তখন তারা আধা ঘণ্টা সিডি শুনতো।

এরপর অতিথি প্রতিবেশী মহিলাদের নাস্তা পরিবেশন করতো। তিনি প্রত্যহ এমন করতেন।

এসব কাজের জন্য অন্যতম কার্যকরী স্থান হচ্ছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফেস্টুন-স্টীকার লাগিয়ে রাখতে পারেন।

মোটকথা, আপনি যেখানেই যান না কিছু না কিছু দাওয়াতি কাজে অবদান রাখুন। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সৃজনশীল কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। তাদের মাধ্যমে যিকির-দুআর লিফলেট বিতরণ করতে পারেন। ছাত্ররাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও নেটে ইতিবাচক চিন্তা চেতনা প্রকাশ করতে পারে।

কোন ছাত্র যদি অপর ছাত্রভাইকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে সক্ষম হোন তাহলে তিনি যেন তাকে দাওয়াত দেন। কোন ছাত্র যদি রাসুলের এই হাদীস–

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غَرَسَ اللهُ لَهُ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ

প্রচার করে তাহলে কে তাকে বাধা দিবে?

ধরুন এই হাদীসটিই কোন ছাত্র সুন্দরভাবে ডিজাইন করে লিখল। তারপর তার তিনটি কপি করে একটি প্রবেশদ্বারে আরেকটি বের হওয়ার গেটে এবং অপরটি কোন বিশেষস্থানে লাগিয়ে দিল। এই বিদ্যালয়ে পাঁচশত ছাত্র অধ্যয়ন করে। তাহলে নিঃসন্দেহে এই তিনটি লেখা অনেক ছাত্র পড়বে।

অনেকে হয়ত এটা আমল করার চেষ্টা করবে অথবা অপরের সাথে শেয়ার করবে। তখন তুমি এই সামান্য কাজে সাদাকায়ে জারিয়ার হিসাবে সওয়াব পেতে থাকবে। প্রিয় নবী সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি ভাল কাজের দিকে আহ্বান করবে সে সেই পরিমাণ প্রতিদান পাবে যে পরিমাণ ব্যক্তি তার (ভালো কাজটির) অনুসরণ করবে। আবার তাদের প্রাপ্ত সওয়াবও কমবে না। (সুবহানাল্লাহ)

আপনি যদি কাউকে নামাজ শিক্ষা দেন। সে আরেক জনকে শিক্ষা দিল। আপনি হয় মারা যাবেন। কিন্তু সওয়াব প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। আমলনামা ভরপুর হতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

নিশ্চয় আমি মৃতকে জীবিত করি এবং তারা যা প্রেরণ করে এবং যা পশ্চাতে রেখে এসেছে তা লিখে রাখি। প্রত্যেক জিনিসকেই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে রেখেছি। *[সূরা ইয়াসিন : ১২]*

মানুষের মাঝে ধর্মীয় সিডি-ক্যাসেট বিতরণ

আমি এক ব্যক্তিকে একটি ক্যাসেট হাদিয়া দিয়েছিলাম। সে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, আমি এটা ৬০ বারেরও বেশি পড়েছি। ক্যাসেটটি তার হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে এবং সে এটা অন্যকেও শুনাত। সুতরাং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ভালো কাজে নির্দেশনাকারী আমলকারীর মতোই সওয়াব পাবে।

দাওয়াতি প্রচারণা বিভিন্ন মাধ্যমে হতে পারে। এমন অনেক মাধ্যম আছে যা সহজেই করা যায়।

অনেক দ্বীনি ভাই কিছু হাদীস লিখে বাসায় ঝুলিয়ে রাখেন। তা সাধারণত এক সপ্তাহ থাকে। ফলে সন্তানরা মুখস্থ করে ফেললে তিনি তা পাল্টিয়ে ফেলেন। এভাবে বছরে পঞ্চাশ বার বিভিন্ন হাদীসের চার্ট লাগানো হয়। এগুলো আমি এজন্য আলোচনা করছি যেন সকলে এগুলো করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কাজগুলো যদিও তুচ্ছ কিন্তু তার ফলাফল ব্যাপক বিস্তৃত। আমি সামনে কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

একব্যক্তি দেখল এসএমএস (ক্ষুদে বার্তা) একটি কার্যকরী যোগাযোগ মাধ্যম। তখন সে ইংরেজীতে এই ম্যাসেজটি লিখল, 'আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান অথবা এমন কারো সন্ধান পান যে ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী অথবা অমুসলিম; তাহলে আমাদের অবহিত করুন।"

এই বার্তা অনেকের কাছে প্রেরণ করল। তাদের কাছে ফিরতি বার্তা আসলে লাগলো। তাদের টিম প্রাপ্ত বার্তার উত্তর প্রদান শুরু করে দিল। তাদের নিকট অমুসলিমদের কাছে (দাওয়াত সম্বলিত) বার্তা পাঠানোর বিভিন্ন নমুনা ছিল। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে, চার মাস পর তারা পরিসংখ্যান করে দেখল প্রতি চারঘন্টায় একজন নতুন মুসলিম হচ্ছেন।

আমি নিজে তাদের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছি। সামান্য যোগাযোগের কারণে প্রতি চারঘন্টায় একজন নওমুসলিম! সুবহানাল্লাহ! আমাদের অনেকেই এ ধরণের কাজ করতে পারেন। প্রয়োজন শুধু হিম্মত সাহসের।

বোনেরা ক্যাসেট, বইপত্র গাড়িতে করে বিতরণ করতে পারেন। এছাড়া কিছু মূল্যবান যিকির-আযকার, প্রসিদ্ধ দোয়া লিখে বিদ্যালয়ে টাঙিয়ে রাখতে পারেন। আপনার ভাইকে বলতে পারেন, তুমি এগুলো মসজিদে লাগিয়ে দাও।

জার্মানিতে এক ভাই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। তিনি একটি সাইনবোর্ডে লেখা দেখলেন, "আপনি যদি এই পণ্য সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চান তাহলে ফোন নাম্বরে যোগাযোগ করুন।"

এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনটি তার মস্তিষ্কে একটি সুন্দর চিন্তা উন্মোচন করে দিল। তিনি ভাবলেন, আরে এতো চমৎকার পদ্ধতি।
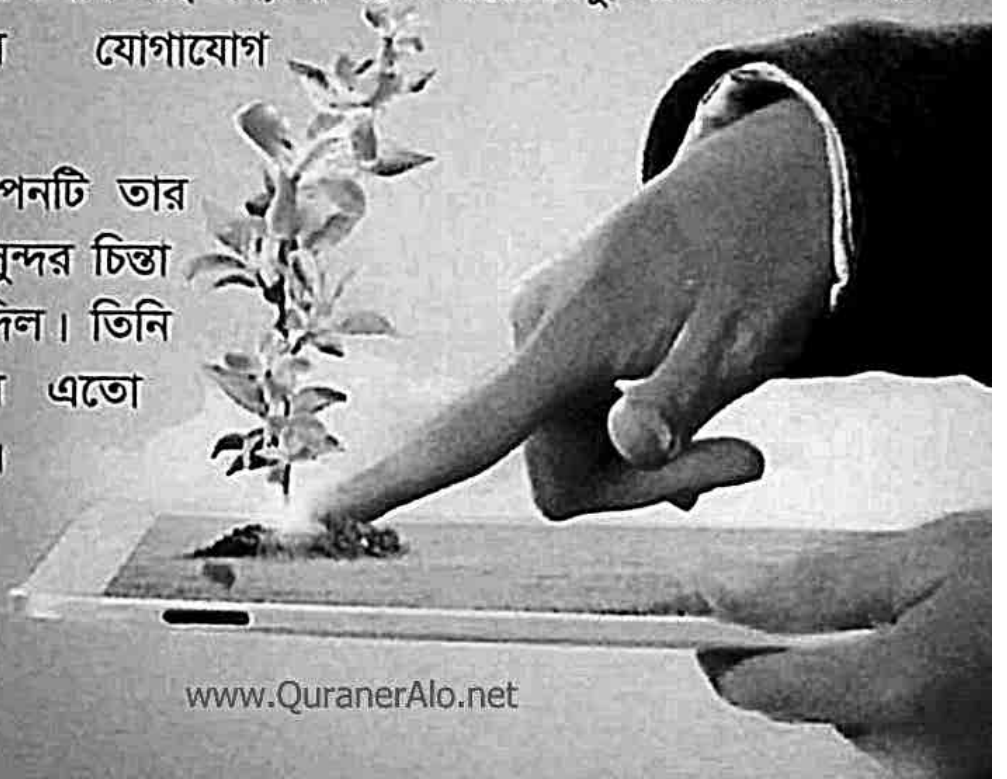
আমি কেন একথা লেখছি না, "আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান তাহলে নিম্নের নাম্বারে যোগাযোগ করুন।"

তিনি ইসলামিক সেন্টারে গেলেন। সেখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। ফলে তারা এ ধরণের বিজ্ঞাপনের সার্ভিস দেয় এমন কিছু কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করলেন। একমাসে সাত/আটশত ডলার খরচ করে সাইনবোর্ডে লিখে শহরময় ছড়িয়ে দিলেন, "আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান তাহলে এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।" সাথে সেন্টারের নাম্বার দিয়ে দিলেন।

সুবহানাল্লাহ! সেই ভাই বলেন, সেই মাসে পাঁচশত লোক ইসলাম কবুল করে। চিন্তা করুন, এদের অনেকে হয়ত গাড়িতে সফররত অবস্থায় দাওয়াহ সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করেছিল। আর দায়িত্বশীল দায়ী তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। ইসলামকে সহজ সরলভাবে বুঝিয়েছেন। সাথে সাথে সে মুসলমান হয়ে গেছে।

ইউরোপের আরেক ভাই যাত্রীবাহী বড় বাসের একটি বিশেষস্থান ভাড়া নেন। এ ধরণের বাস প্রায় ৫/৬ শত লোক বহন করে। এমনস্থান ভাড়া নিলেন যেখানে কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। তিনি সেখানে লিখে দিলেন "আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান তাহলে বাসের ভিতরে নিম্ন নাম্বারে যোগাযোগ করুন।" সে তার মোবাইল নিয়ে বসে গেল। যারা তার সাথে যোগাযোগ করছে তিনি তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝাচ্ছেন, দাওয়াত দিচ্ছেন। ফলে অনেক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

আমি বিশ্বাস করি, আমরা যদি পৃথিবীর অমুসলিম সাথে এ ধরণের ব্যবহার অব্যাহত রাখি,

তাহলে অনেককেই হেদায়েতের প্রতি উদগ্রীব ও আগ্রহী পাবো। কিন্তু তিনি এমন কাউকে পাচ্ছেন না যে তাকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিবে।

মানুষকে কুরআন-হাদীস শ্রবণের ব্যবস্থা করে দেওয়া

সেসব মাধ্যমের অন্যতম হচ্ছে, দুআ-যিকির, কুরআন-হাদীসে ননবি শ্রবণ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। বৃটেন থেকে আমার কাছে একটি পত্র আসে। তাতে জনৈক ভাই উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রথমে ধর্ম বিমুখ ছিলেন। কখনো নামাজ পড়তেন না। একদিন তিনি একটি ইসলামিক সেন্টারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার পিপাসা লাগল। ফলে তিনি সেন্টারে প্রবেশ করলেন ঠান্ডা পানি পান করার জন্য। ইতিপূর্বে কখনো এখানে আসেন নি। তিনি বলেন, আমি সেন্টারে প্রবেশ করে পায়ের নিচে একটি ক্যাসেট পড়ে থাকতে দেখলাম। পানি পান শেষে ক্যাসেটটি বাসায় নিয়ে আসলাম। রাতের বেলায় ক্যাসেটটি শুনে দেখলাম তা একটি ইসলামিক বক্তৃতা যাতে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (আসলে সেটি আমার নারীবিষয়ক একটি বক্তৃতা ছিল, যা নেটে আপলোড করা আছে)

তিনি বলেন, সেটা আমি সেই রাতেই চারবার শুনেছি। তারপর সকালে ইসলামিক সেন্টারে প্রথম মুসল্লি হয়ে গেলাম। আজ পর্যন্ত আমি নামাজের ব্যাপারে খুবই সতর্ক।

চিন্তা করুন নারীদের সম্পর্কে দেওয়া একটা বক্তৃতা তার অবস্থার

পরিবর্তন করে দিল। সুতরাং সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার বক্তৃতা এখানে রেখেছিল।

গাড়ির পিছনের গ্লাসে আমরা বিভিন্ন দুআ, বাণী সম্বলিত স্টিকার লাগিয়ে রাখতে পারি। সুন্দর ডিজাইন করা ইমেজ, ওয়ালপেপারে ইসলামিক বাণী তুলে ধরা যায়। ফলে এটা আরেকজনে আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবে। গাড়িতে সিডি বিতরণ করতে পারি।

ারীবিষয়ক আযকার, ফতোয়া মহিলামহলে বিতরণ করতে পারি। এটা তাদের জন্য খুব ফায়দাজনক হবে।

কিছু ভাই বিভিন্ন কল্যাণসংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করেন। তারা একটি গাড়ি ক্রয় করে লিখে দেন, 'এটা একটি দাওয়াতি গাড়ি যাতে ইসলামিক বই-পত্র ও ক্যাসেট বিতরণ করা হয়"। তারা যুবকদের পাশে গিয়ে তাদের মাঝে বইপত্র বিতরণ করেন। আবার অনেক ভাই দাম্মামে ভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রবাসীদের মাঝে দাওয়াতি ও কল্যাণমূলক কাজ করে যান।

আমি এক ভাইয়ের কর্মে খুবই আশ্চর্য হয়েছি। তিনি একটি গাড়ি ক্রয় করে তার ভিতরে চা-কফি পানের সুন্দর ব্যবস্থা করেন। তাতে চা-কফি ও হালকা নাস্তার সুব্যবস্থা আছে। পাশাপাশি মাদক বিরোধি সচেতনতা সৃষ্টিকারী প্রামাণ্যচিত্র কম্পিউটারে প্রচারের ব্যবস্থা রেখেছেন। রাস্তায় যুবকদের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে ডেকে গাড়িতে উঠান এবং চা পান করান। তারা গাড়িতে বসে চা-কফি পানের ফাঁকে ফাঁকে মাদকের ভয়াবহতা,

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশনা সম্বলিত ভিডিও ল্যাপটবে দেখতে থাকে। সেই গাড়ির ডিজাইন খুব সুন্দর ছিল। তবে আমার ধারণা এমন আশ্চর্য ব্যবস্থা করতে বেশি টাকা খরচ হয়নি। কিন্তু এসব কর্মের প্রভাব ব্যাপক। দুআ করি, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আরেক ভাই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে, 'এখানে গানের সিডির বিনিময়ে ইসলামিক সিডি নিতে পারবেন।' সাথে নাম্বার লিখে দিয়েছেন। তিনি তিন লক্ষ্য গানের সিডি পরিবর্তন করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ!

কাতারে 'মুয়াসসাসা ইদ আল খাইরিয়া' নামক একটি সংগঠন আছে। তাদের দেশে দেড় বছর পূর্বে যখন এশিয়ান টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় তখন তারা গাড়ি নিয়ে এমন স্থানে যেতেন যেখানে অমুসলিম পাওয়া যায়। তারা ইসলামের মর্মবাণী বিভিন্ন ভাষায় তাদেরকে উপহার দেন। তাদের গাড়িতে তারা ল্যাপটপ স্থাপন করেছে। ফলে ব্লুটুথের মাধ্যমে একশত মিটার দূরেও ফাইল প্রেরণ করতে পারে। তারা লিখে দিতেন আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এসব কর্ম অমুসলিমদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ যদি এসব লিফলেট, প্ল্যাকার্ড ছুড়ে ফেলে দেয় তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি এমন স্থানে রাখুন যেখানে অন্য কেউ পড়বে।

আমি অনেক সময় ইউরোপীয়ানদের সমাজ, জীবন সম্পর্কে কথা বলি। তাদের সেবামূলক কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বর্ণনা দেই।

আপনি বই-পত্র বিতরণ, স্টিকার লাগানো, ফেস্টুন ঝুলানো বা দরিদ্রকে দান-সাদাকা ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজের বিনিময় একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করেন। আপনি আখেরাতে এর বিনিময় পাবেন।

কিন্তু আমেরিকাতে তারা এগুলো পার্থিব সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির আশায় করে থাকে। আপনারা জানেন আমেরিকাতে মাথাপিছু মোটা অংকের কর দিতে হয়। কিন্তু কেউ যদি জনকল্যাণমূলক কিছু কাজ করে অথবা সামাজিক সেবাসংস্থার সদস্য হয় তাহলে তার কর মওকুফ করা হয়। এই নীতির ফলে প্রত্যেকেই সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে চায় যেন তার শুল্ক কমানো হয়।

আবার তাদের মাঝে নীতিহীনতাও আছে। তাদের বিশাল একটি গোষ্ঠী দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। তারা এত গরীব যে, কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা পর্যন্ত পায় না। আমি একটি রিপোর্টে পড়েছি, শতকরা একজন চিকিৎসা বিহীন মারা যায়। দরিদ্র হওয়ার কারণে হাসপাতাল তাদের চিকিৎসা করে না। কেউ তাকে দানও করে না।

এই নিষ্ঠুরতা মুসলিম দেশসমুহে কল্পনাও করা যায় না। আমাদের দেশে কেউ না কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

আমি এই উভয় চিত্র এজন্য তুলে ধরলাম যেন কেউ ভুল ধারণা করে না :সন যে, একমাত্র ইউরোপ-আমেরিকানরাই সামাজিক সেবামূলক কাজ :র। তাদের চরিত্র মানবতা কত উর্ধ্বে! আমরা মুসলিমরা কিছু করি না।' :লে সে মুসলিমদের তুচ্ছজ্ঞেয় করবে। প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম দেশসমূহে অর্থ-সম্পদ কম থাকা সত্ত্বেও যে পরিমাণ সেবামূলক কর্মকাণ্ড আমি প্রত্যক্ষ করেছি- তা আমেরিকা-ইউরোপে নেই।

সুতরাং যিনি কল্যাণ প্রচারক ও দায়ী ইলাল্লাহ হবেন তিনি নিম্ন মর্যাদার অধিকারী হবেন।

১। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে মহান প্রতিদান পাবেন।

২। তার পরিসমাপ্তি অত্যন্ত সুন্দর হবে।

৩। এসব কর্মকাণ্ডে তিনি আত্মপ্রশান্তি লাভ করবেন। ইউরোপ-আমেরিকা সেবামূলক কাজ করতে এত আগ্রহী কেন?

কেননা, এই কাজ করে তারা আনন্দ তৃপ্তি উপভোগ করে।

৪। তার দুআ কবুল হবে।

৫। তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন। বিশেষ করে বিপদের সময়। যেমন হাদীসে তিন ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যারা গুহায় আটকে গিয়েছিল।

৬। মানুষের মাঝে দাওয়াতি ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম, তৎপরতা বেশি হলে নিজের আত্মা, দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত হয়। সামাজিক বন্ধন মজবুত ও মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তিনি যেন সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সা. এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(১১)
নেয়ামতের হেফাজত করুন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না।

বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে ন পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন?

জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم * فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড়

জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

প্রিয় ভাই!

আপনি সামান্য নগণ্য জিনিস দিয়ে হলেও কর্মতৎপরতা শুরু করুন। রেখে যান সমাজে অবদান। আমাদের সামনে সেই মহিলার দৃষ্টান্ত আছে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জমানায় মসজিদ ঝাঁড়ু দিত। এই মহিলা মারা গেলে সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে না জানিয়েই দাফন করে ফেলেন। তারা তাকে সাধারণ মানুষ মনে করেছিল। পরবর্তীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলে তিনি তার কবরের পাশে যান এবং দুআ করেন।

এই মহিলার ইসলামের সেবায় বড় কিছূ পেশ করার ক্ষমতা ছিল না। তাই মসজিদ ঝাঁড়ু দিয়ে কিছু ভাল কাজের চেষ্টা করে। আমাদের দৃষ্টিতে কর্মটি নগণ্য হলেও শরীয়তে দৃষ্টিতে অতি মর্যাদাবান ছিল।

আজকের আলোচনা দরিদ্র-মিসকিনদের খালিপাত্রে খাবার বিতরণ করে অবদান রাখা প্রসঙ্গে। আজকের আলোচনা সামনের আয়াতের সাথে সম্পর্কিত–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিচিত্তে মিসকিন, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। *[সূরা ইনসান-৮]*

আজকে আলোচনা করবো খাবারের অতিরিক্ত অংশ (যা সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়) গরিব-মিসকিনকে দিয়ে নেকি হাসিল করা প্রসঙ্গে। তবে আমি যে কথা বলি তা যেন নিজেও পালন করতে পারি। আমাদের কার্যক্রমগুলো যেন শুধু লোক দেখানো না হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাজ-কর্মে ইখলাস দান করুন।

আমাদের কেউ যদি ট্র্যাফিক সিগন্যালের সামনে দাঁড়ায় এবং তার তিনটি রঙ নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে সে খাবারের নেয়ামতের সাথে মানুষের আচরণের একটি দৃষ্টান্ত, উপমা খুঁজে পাবে। অনেকের সাদৃশ্য হবে লাল রঙের সাথে যা বিপদ সংকেত। এ ধরণের লোক আহার্য দান করে না, জমিয়ে রাখে অথবা অপচয় করে। আবার অনেক সময় অতিরিক্ত খাবার ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। সুতরাং লাল বিপদসংকেত তাকে সতর্ক বার্তা দিচ্ছে।

অনেকের মিল রয়েছে হলুদ রঙের সাথে। তারা মধ্যপন্থী। কখনো অপচয় করে আবার কখনো দান করে।

আর সবুজ রঙটি সেই দলের প্রতীক যারা খাদ্য অপচয় করে না, নষ্টও করে না। বরং অতিরিক্ত অংশ গরীব-মিসকিনদের বিলিয়ে দেয়। সুতরাং চিন্তা করুন, প্রত্যেকে কোন রঙের উপমা হতে চান?

গরীব-মিসকিনদের আহার্য দানের পথ ও পদ্ধতি অনেক। আমরা রেস্তোরাঁর সাথে সমঝোতা করে এই মানবিক জনসেবামূলক কাজ করে যেতে পারি। রেস্তোরাঁগুলো বন্ধ হয়ে গেলে তাদের অবশিষ্ট খাদ্য এনে গরীবকে দিতে পারি। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন তাদের এত পরিমাণ খাবার বেশি হয় যা দিয়ে দশটি পরিবারের আহার্যের সুব্যবস্থা করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ সরকারি জরিপ মতে রিয়াদে একটি শহরের জনসংখ্যা ৩৬৯০৯৯ জন। শহরটির আয়তন ৭৯ কিলোমিটার। সেখানে কম হলেও ১৮৫টির মতো রেস্তোরাঁ আছে। হোটেলগুলো আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। এখানে অনেক পরিবার বসবাস করে। তা কোন ব্যাচেলরদের এলাকা নয়।
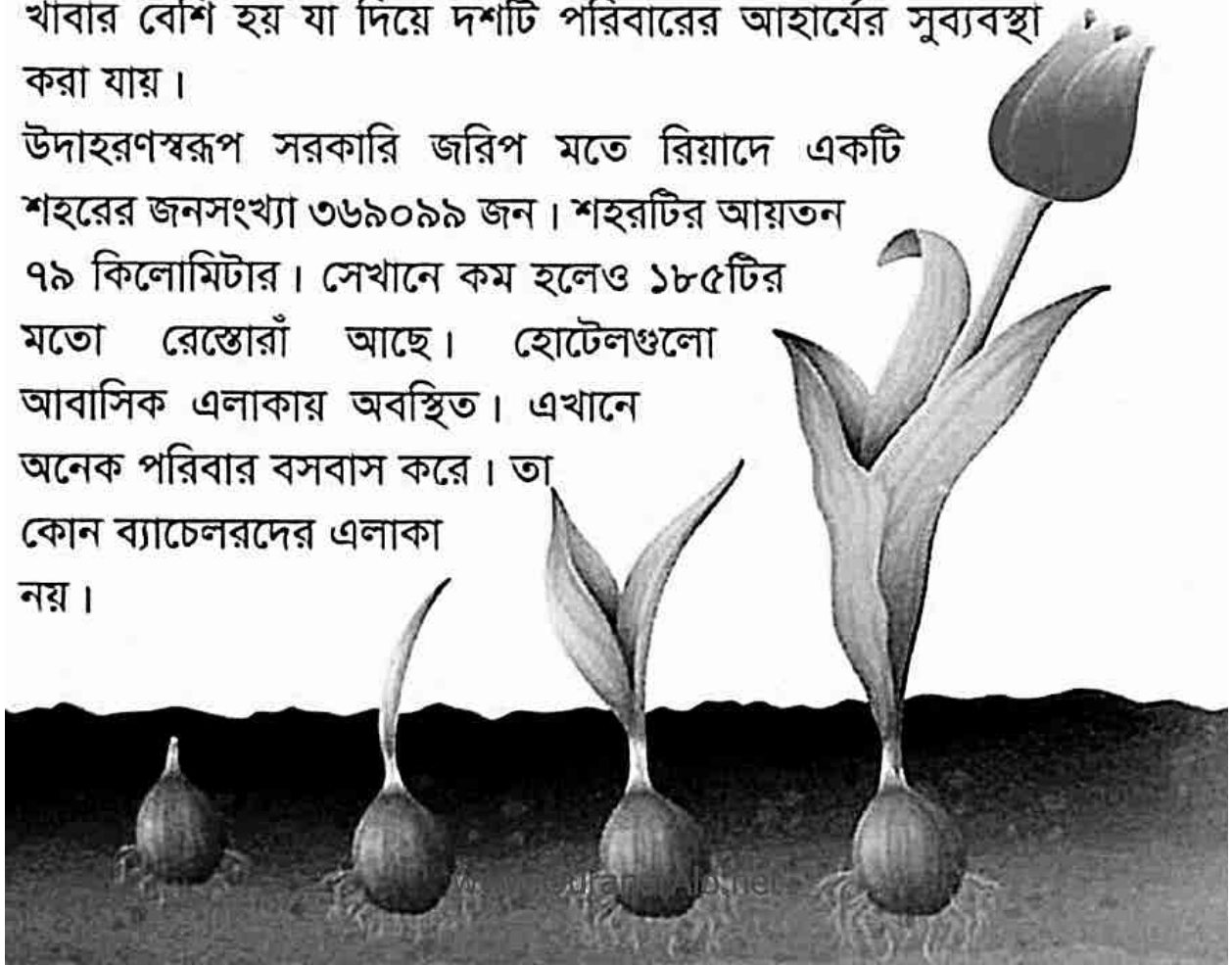
প্রত্যেকের খাবারঘর ও রেস্টুরেন্টে খাদ্য পাকানো হয়। নিজেদের পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য পাকান। কিন্তু এসব রেস্টুরেন্ট ও বাসার খাবারঘরে অনেক খাদ্য অপচয় করা হয়। কেউ যদি প্রমাণ চান তাহলে ডাস্টবিনের প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখবেন, তাতে যে পরিমাণ ভাত নিক্ষেপ করা হয়েছে তা তিনশত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণ হবে।

এসব ভাত ওলিমা বা কোন অনুষ্ঠানের পর অতিরিক্ত হয়েছে। অনেকে ধনকুবে ব্যক্তি একসাথে পাঁচটা উট যবেহ করেন। আবার অনেকে বিশটা ছাগল যবেহ করে ফেলে। (তারা আয়োজনের অতিরিক্ত অংশ ডাস্টবিনে ফেলে দেয়)

আমাদের বাসাবাড়িতেও অনেক সময় রুটি বেশি হয়। বর্তমানে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির কারণে গ্রামাঞ্চলের রাখালরা তাদের ছাগলকে খাবার দিতে পারে না। এসব রুটি তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায়।

আমরা রেস্তোরাঁগুলো থেকে এভাবে উপকৃত হতে পারি, আমাদের প্রত্যেকের অঞ্চলে যে রেস্তোরাঁ আছে তাতে রাতে যাবো এবং অবশিষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করবো। পরবর্তীতে এগুলো ফকিরদের বাসায় প্রেরণ করবো। এটা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া থেকে অনেক উত্তম। অনেক খাবারঘরে বাড়তি খাদ্য ফেলে দেওয়ার আলাদা বক্স আছে। আপনি সেটা দরিদ্র পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। (এতে অনেক সওয়াব পাবেন) আল্লাহ তায়ালা অভাবীকে খাদ্য পরিবেশনের ফযিলত প্রসঙ্গে বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (١٠)

অর্থ : তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও (আল্লাহর ভালোবাসায়) অভাবী, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (এবং তারা বলে) কেবল আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে আহার্য দান করি। বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। বরং আমরা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক ভীতিপ্রদ কঠিন ও বিপদসংকুল দিবসের আংশকা করছি।

[সূরা ইনসান : ৮-১০]

অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতিদান প্রসঙ্গে বলেন–

فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

পরিণামে আল্লাহ তাদের সেই দিবসের অনিষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে প্রফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন। তারা যে ধৈর্যধারণ করেছে তার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র পুরস্কার দিবেন।

[ইনসান : ১১-১২]

এ সবই হয়েছে কেবলমাত্র নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে খাদ্য পরিবেশনের বিনিময়ে। অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণু হয়ে বিরতিহীনভাবে গরীবদের বাসায় খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়ার বদৌলতে। কেননা, আপনি তৃপ্ত থাকা সত্ত্বেও অন্য ভাইয়ের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতে পারছেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাকে খাবার দিচ্ছেন। (এটা অত্যন্ত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আন্তরিকতার পরিচয়)

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এমন হৃদয়বান লোক খুবই কম যারা এই অতিরিক্ত খাবার সঞ্চয় করে দরিদ্রকে দেওয়ার ফিকির করেন। আমি শুধু বাসায় যে খাবার অপচয় হয়, তা নিয়ে কথা বলছি না। কেননা, তা পরিমাণে নিতান্ত কম। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, রেস্টুরেন্ট-হোটেলে অনেক পরিমাণ অপচয় করা হয়। তা আমরা (আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশায়) দরিদ্রশ্রেণির মাঝে বিতরণ করতে পারি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরিবকে খাদ্য পরিবেশনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অনেক ফজিলতের কথা বর্ণনা করেছেন।
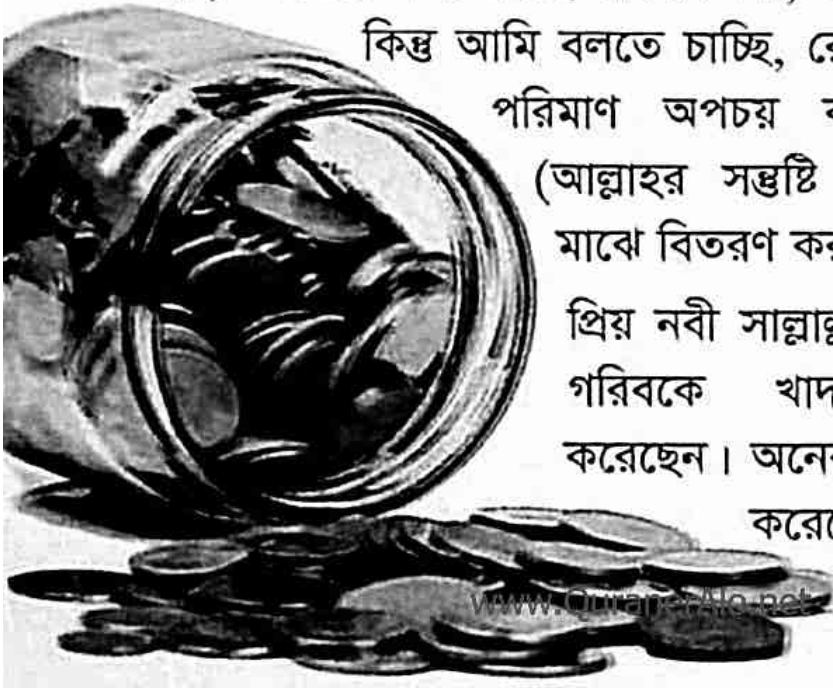
আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম মদিনায় আসলে আমি তার চেহারা দেখে বললাম, এটা কোন মিথ্যুকের চেহারা নয়। আমি তাকে একথা বলতে শুনলাম, 'হে লোকসকল! তোমরা দরিদ্রকে আহার্য দান করো, আত্মীয়ের সম্পর্ক রক্ষা করো, সালাম প্রচার করো এবং রাতের এমন গভীরে নামায পড়ো যখন অন্যরা ঘুমিয়ে থাকে। তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'

তিরমিযী শরীফে এসেছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মুসলিমকে আহার করালো আল্লাহ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে তৃষ্ণার্তকে পানি পান করালো আল্লাহ তাকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন। যে কোন মুসলমানকে কাপড় পরিধান করালো আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে কাপড় পরিধান করাবেন। (সুবহানাল্লাহ) কতই না উত্তম প্রতিদান!

সহীহ মুসলিমে নিম্ন ঘটনাটি এসেছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, একদা আমাদের বাসায় একজন দরিদ্র মহিলা দুটি কন্যাশিশু নিয়ে আসেন। আমি ঘরে খাবার সন্ধান করছিলাম। কিন্তু এই দরিদ্রকে দেওয়ার মতো কিছুই পেলাম না। অবশেষে তিনটি খেজুর পেলাম যা তাকে দিয়ে দেই। ইনসাফের বন্টনতো ছিল যে, মহিলা একটি নিবে আর দুই মেয়েকে বাকী দুটি দিবে। এই হিসাবে তিনি একটি রেখে বাকি দুটি দুই মেয়েকে ভাগ করে দিলেন।

এদিকে মহিলা (তার অংশের) খেজুর খাওয়ার পূর্বেই বাচ্চারা তাদের প্রাপ্ত খেজুর খেয়ে ফেলে। এদিকে মা যখন তার অংশটুকু মুখে দিতে হাত উপরে উঠালেন তখন বাচ্চারা মায়ের খেজুরের দিকে হাত পাতল। মা আর সহ্য করতে পারলেন না। তার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের প্রবল তরঙ্গউচ্ছ্বাস ক্ষুধার জ্বালাকে ডুবিয়ে দেয়। তিনি বাকি একটি খেজুরও দুই মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিলেন।

(আর নিজে বুভুক্ষই থাকলেন)

আয়েশা রা. এই বিরল দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসায় আসলেন তখন তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আয়েশা, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দিয়েছেন।' সামান্য একটি খেজুরের কারণে কত বড় সওয়াব। তাইতো হাদীসে এসেছে- 'খেজুর টুকরো দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর।' (বুখারী)

উপরে উল্লেখিত হাদীসে আপনি অনেক নির্দেশনা পাবেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে খাবার বিতরণে উৎসাহিত করেছেন। তিনি ফকির-মিসকিনের খোঁজ-খবর নিতে বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা সাদাকার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন–

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

তাদের সম্পদে অংশ ছিল প্রার্থনাকারী (ভিক্ষুক) ও বঞ্চিতদের।

সায়িল ঐ ব্যক্তি যে আপনার কাছে এসে কিছু চায়। পক্ষান্তরে মাহরুম ঐ ব্যক্তি যে লজ্জাবশত চাইতে পারে না। (তাকে দিতে হবে নিজ উদ্যোগে দিতে হয়)

প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য যে, নেয়ামত (খাদ্যসামগ্রী) নিয়ে খেল-তামাশা করা বৈধ নয়। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক 'সুপ প্রতিযোগিতা' (রান্নার প্রতিযোগিতা) অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এগুলো বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরণের নিরর্থক অনুষ্ঠানে

প্রচুর খাদ্য নষ্ট করা হয় যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিলাসিতাকে আযাব নাযিলের কারণ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। এরশাদ হয়েছে–

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ

তারা (পাপিষ্ঠরা) ইতিপূর্বে মত্ত ছিল ভোগবিলাসে। *[সূরা ওয়াকিয়া : ৪৫]*

অন্যত্র বলেন–

وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

আর জালিমরা সেই পথেই চলত, যাতে ভোগ বিলাসের উপকরণ পেত এবং তারা ছিল অপরাধী। *[সূরা হুদ : ১১৬]*

নিঃসন্দেহে এটা নেয়ামতের কুফরী। প্রসঙ্গত কুরআনের সেই আয়াতও আমাদের স্মরণ করা উচিত আছে যেখানে আল্লাহ বলেন–

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন- একটি জনপদ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ ছিল সেখানে সব জায়গা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে পর্যাপ্ত রিযিক (জীবনোপকরণ) আসত তারপর সে (জনপদবাসী) আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদন আস্বাদন করালেন, তারা যা করত তার বদলে। *[সূরা নাহল : ১১২]*

উপরের আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা করুন। আমরা যে নেয়ামতকে অবজ্ঞা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছি- তার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে।

রেস্টুরেন্ট, হোটেলের বর্ধিত খাদ্য সংগ্রহের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে,
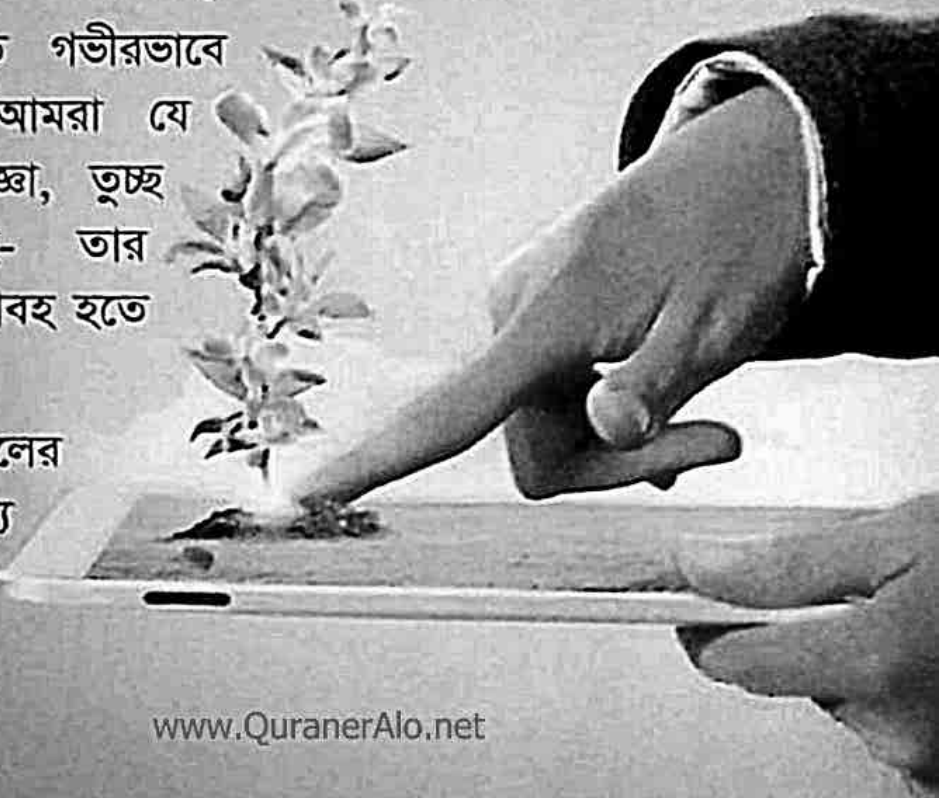
আমরা সেখানে যাবো এবং জিজ্ঞাসা করবো তাদের কি পরিমাণ খাদ্য অতিরিক্ত আছে। অধিকন্তু রেস্তোরাঁগুলোর সাথে আমরা সমঝোতা করে নিতে পারি। তাদের ফেলে দেওয়া বর্ধিত খাদ্য শহরের ফকিরদের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারি।

একবার আমরা রেস্তোরা থেকে কিছু বর্ধিত খাবার সংগ্রহ করলাম। তা কতিপয় গরীব-মিসকিনকে দিলে তারা কেঁদে দিল। বস্তুত তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি বিধবা ও মিসকিনদের সহায়তা করে সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের সমতুল্য।' সুতরাং এই খাদ্য পরিবেশনে অনেক সওয়াব নিহিত আছে। অধিকন্তু এতে অপর ভাইয়ের মুখে হাসি ফুটানো হয়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর নিকট তিনটি কাজ সবচেয়ে প্রিয়–

১। তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের মুখে হাসি ফুটাবে।

২। তার ঋণ আদায় করে দিবে।

৩। তাকে রুটি খাওয়াবে। (তার ক্ষুধা দূর করবে)

সুতরাং যে ভাই এ মর্ম উপলব্ধি করে কাজে এগিয়ে আসবেন, মানুষকে আনন্দ দিবেন, রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাবার সংগ্রহ করে অপরকে বিলিয়ে দিবেন, তিনি অনেক নেকি অর্জন করতে পারবেন।
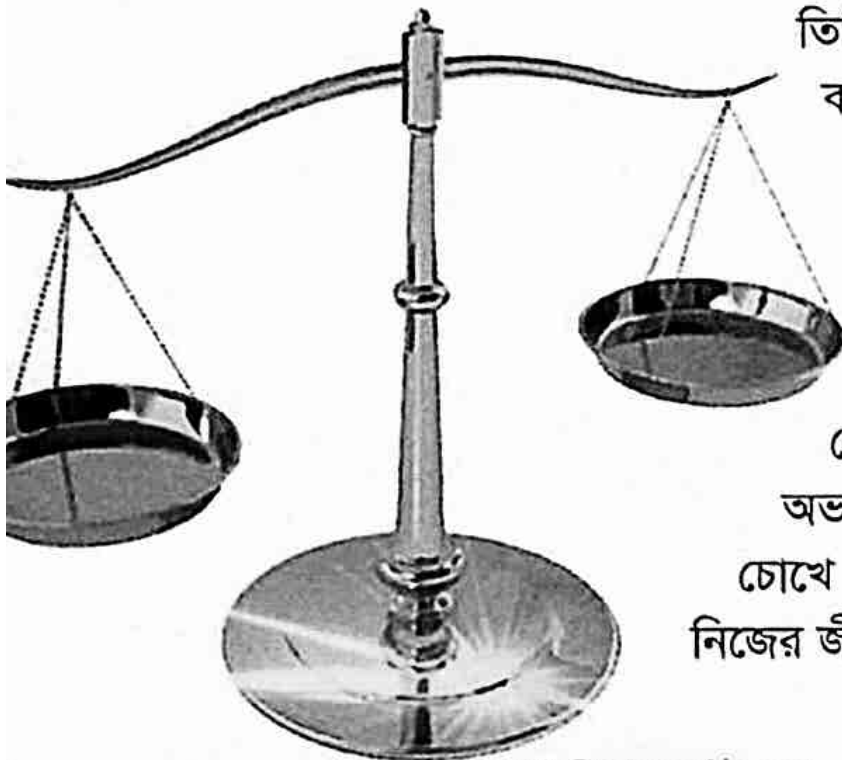
এসব জনহিতকর কর্মতৎপরতা মানুষের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি করে দেয়। যখন আপনি অভাবী-দরিদ্রদের হালত নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করবেন তখন নিজের জীবন ও পরিবারে

আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারবেন। যখন বুভুক্ষু দরিদ্রদের দুঃখ-দুর্দশা অবলোকন করবেন তখন নিজের কাজে ইখলাস-আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি অপচয় পরিহার করে প্রাপ্ত নেয়ামতের হেফাজত করতে সচেষ্ট হবেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর শপথ, সে ঈমানদার নয়, সে ঈমানদার নয়, সে ঈমানদার নয় যে পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রি যাপন করে কিন্তু তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।' সে পরিপূর্ণ ইমানদার নয়। আপনি যখন খাবার সংগ্রহ করে নিজে বহন করে ফকিরদের মাঝে বিলিয়ে দিবেন, তখন নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট অধিক সওয়াব পাবেন। কেননা, আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের সাথে লেনদেন করছেন। অল্পকাজে তিনি আপনাকে অনেক বড় লাভ দিবেন। অধিকন্তু এই কাজে যে আত্মতৃপ্তি ও আনন্দ পাবেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে-ই একমাত্র বুঝতে পারে।

এই কাজ কয়েকজন মিলে যৌথভাবেও করতে পারেন। তারা নিজেদের মাঝে পালা করে নিতে পারেন। একজন হয়ত আজকে কাজ করবে আরেকজন আগামীকাল। উদ্যোগীদের সমন্বয়ে সংগঠন হতে পারে। অনেক সংগঠন আছে যারা এই কাজের আঞ্জাম দেয়। তারা গরীবদের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত টিনজাত করে বিতরণ করে।
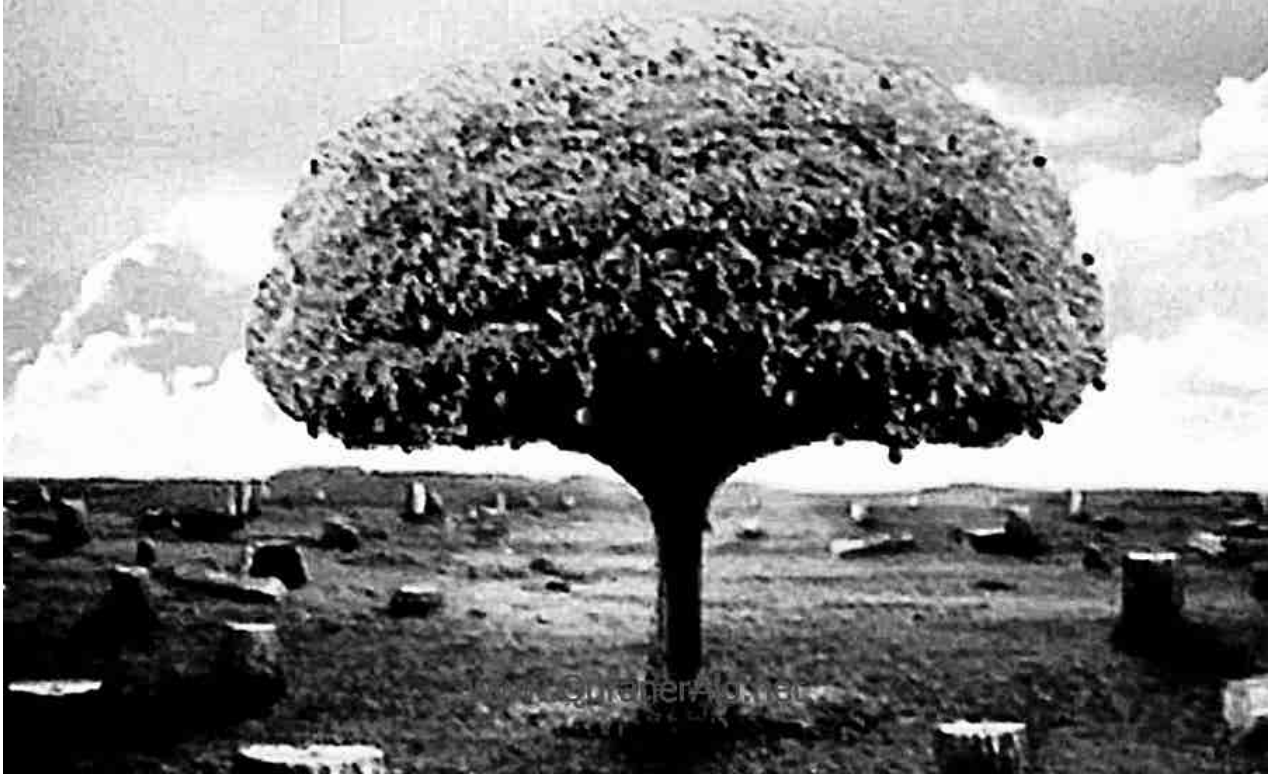
শায়খ আলী তানতাবি রহ. এর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। তিনি বলেন, একবার আমার পাঁচ বছরের মেয়েকে দেখলাম সে খাবারের পাত্র নিয়ে বাড়ির পাশে রাস্তায় বসা ভিক্ষুককে দেওয়ার জন্য যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই খাবারগুলো ফকিরকে দিবো। আমি তাকে বললাম, না তুমি এই সাধারণ থালা নিয়ে যেতে পারবে না। বরং একটি নতুন দামী পেটে খাবার নাও এবং সাথে লবণ এবং গাসে করে পানিও নিয়ে যাবে। তাকে এমনভাবে খাবার পরিবেশন করবে যেন সে আমাদের মেহমান।

এমনই হতে হবে আমাদের আচরণ। যেন সে নিজেকে ভিক্ষুক মনে না করে। বরং সে যেন আমাদের গৃহে আগন্তুক মেহমান। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا

তারা এমতাবস্থায় গরীবকে আহার্য দান করেন যে, তাকে ভালোবাসে।

[সূরা ইনসান : ৮]

অনেক ভাই হোটেল, রেস্তোরা থেকে খাবার সংগ্রহ করে এই কাজে ভূমিকা রাখতে লজ্জাবোধ করেন অথবা তার হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকে না। সেসব ভাইগণ ভিন্নভাবে এ কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। তারা তাদের বাসায় কোন অনুষ্ঠানের পর বিশেষ করে ওলীমার [বিবাহের অনুষ্ঠানের] পর যে খাদ্য অতিরিক্ত হয় তা গরীবদের দিয়ে দিতে পারেন।

কাজের অনেক পদ্ধতি আছে। আপনি একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জরিপ চালাতে পারেন। তারপর সেখানে দরিদ্র পরিবারগুলোর খবর নিন। হয়ত এমন পরিবার পাবেন যার কর্তা মৃত্যুবরণ করেছে বা প্রতিবন্ধী। আপনি সেই পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারেন। তাদেরকে খুশী করে সওয়াব অর্জন করতে পারেন।

অতিরিক্ত খাদ্যসংগ্রহ করে ক্ষুধার্তদের মাঝে বিতরণ করেন- এমন এক ভাই তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আমি গরিবদের মাঝে এসব কাজ প্রায় দশ বছর ধরে করে আসছি। শুরুতে একটি অত্যন্ত বিরান ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির খোঁজ পাই। আমি ধারণাও করতে পারিনি যে, সে বাড়িতে কোন পরিবার বসবাস করে। কিন্তু বন্ধুদের মাধ্যমে জানতে পারলাম তাতে একটি দরিদ্র পরিবার বসবাস করে আসছে। আমি তাদের খোঁজ-খবর নিতে গেলে দেখলাম তারা মাটিকে বিছানা বানিয়ে শুয়ে থাকে এবং ক্ষুধায় জ্বালায় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

একটি এমন বিরান পরিবার যারা খাদ্যসামগ্রী পায় না। তাদের ভালে বাসস্থান নেই। পরিবারের পিতা আর্তনাদ করে বলছেন, আমি খাবার চাই, আমি সান্তানের বাসস্থান চাই।

তিনি আরো বলেন, জনৈক মহিলার কয়েকজন ইয়াতিম শিশু ছিল। অত্যন্ত দারিদ্র সীমার নিচে তাদের বসবাস ছিল। সেই মহিলা সামান্য দুধের কৌটা এবং ঘি দোকানের ফেলে দেওয়া পাউরুটির অতিরিক্ত অংশ দিয়ে কোনরকম দিনাতিপাত করতেন। তিনি বাচ্চাদের অনুরোধ করতেন, 'তোমরা দুধের ভিতর পুরো রুটি ডুবিয়ে দিও না বরং উপর থেকে একটু ভিজিয়ে খাও।' এটা এজন্য বলতেন যেন সারাদিন আহার্য ব্যবস্থা থাকে।

আমি সেই ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা কি কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাদের অবশিষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করার জন?

তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, শায়খ। আমি কিছু বেকারী মালিকের সাথে কথা বলে সমঝোতা করেছি যে, তাদের বিক্রয় ও বিতরণ শেষ হয়ে গেলে আমরা যাবো এবং যেসব রুটি ও মাখন অতিরিক্ত হয়েছে তা গরিব পরিবারকে দিয়ে দিবো।'

কত উত্তম পরিকল্পনা! আল্লাহ তায়ালা তাদের যথার্থ প্রতিদান দান করুন।

এই পদ্ধতিটি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা বেকারী কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করতে পারি। তাদের অতিরিক্ত পরিত্যাক্ত রুটিগুলো সংগ্রহ করে দরিদ্রদের দিয়ে দিতে পারি। তদ্রূপ শহরে খাদ্য পরিবেশন করে এমন ব্যবসায়িক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। যেমন, দুধ-মাখন ও মিষ্টিদ্রব্য বিপণীসমূহ।

এসব অতিতুচ্ছ কর্মতৎপরতা গরিবশ্রেণির হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। সুতরাং কতই না উত্তম! আপনি তার হৃদয় উৎসারিত দুআর পাশাপাশি অফুরন্ত নেকী অর্জন করবেন।

হজরত আবু মাসউদ বদরী রা. বলেন, যখন সাদাকার নিদের্শ সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা গরিব ছিলাম। আমাদের কাছে এমন সম্পদ ছিল না যা দ্বারা সাদাকা করতে পারি। অতঃপর বাধ্য হয়ে বাজারে কুলিগিরি করতাম।'

চিন্তা করুন, সাহাবায়ে কেরাম রা. বাজারে গিয়ে কুলিগিরি করছেন। কেন? কোন জমি ক্রয়, বিবাহ বা ঘোড়া ক্রয় করার জন্য নয়। বরং অপর ভাইকে দান করার জন্য। সাদাকার সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশায়।

দান-সদকার আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রচুর পরিমাণে দান সাদাকা করতে লাগলেন।

উল্লেখ্য, সমাজে এমন কিছু লোক আছে তাদের চাকরি হচ্ছে শুধু মানুষের দোষ খুঁজে বের করা। অপরের সৃজনশীল মহৎ কাজে খূঁত ধরা। এদের সাধারণ কর্মের যোগ্যতা, সাহস ও ইচ্ছা না থাকলেও অপরকে বাধা দেয় ঠিকই। মুনাফিকরা সাহাবীদের অকাতরে দান প্রত্যক্ষ করছিল। মুনাফিকদের সামনে জনৈক সাহাবী এক সা' দান করলেন। তা দেখে মুনাফিকরা পরস্পর বলতে লাগলো, সে লোক দেখানো ও নাম ফুটানোর জন্য আমাদের আমাদের সামনে দান করেছে।

ঘটনাক্রমে আরেক দরিদ্র সাহাবী সামান্য কিছু দান করলে তারা বলে উঠল, 'আল্লাহ তোমার এই তুচ্ছ দানের মুখাপেক্ষী নয়।' (মোটকথা, অল্প দানকারী ও বেশী দানকারী কেউই তাদের জিভের বিষ থেকে নিস্তার পেত না।) তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের নেফাকী বর্ণনা করে বলেন–

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যারা নিন্দা করে সেই মুমিনদেরকে যারা অন্তর খুলে দান-খয়রাত করে এবং যারা নিজেদের শ্রম ছাড়া আর কিছুর অধিকারী নয়। তারা (মুনাফিকরা) তাদের (সাহাবীদের) বিদ্রূপ করে। কিন্তু আল্লাহও তাদের বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *[সূরা তওবা : ৭৯]*

সুতরাং কিছুলোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ছাড়া কোন কাজ নেই। তারা আবার আপনাকে ভয়ও দেখাবে। আপনি যদি রাতে খাদ্য সংগ্রহ করতে হোটেলে যান তাহলে তারা ভয় দেখিয়ে বলবে, 'আগামীকাল তোমাকে গোয়েন্দা পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। তখন বুঝবে ঠেলা। জেলভাত দুই সপ্তাহ খেতে হবে।'

আপনি এদের কথায় কান দিবেন না। আপনার কাজ আপনি করে যান। মূলত তাদের অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শনের মানসিকতা নেই। অধিকন্তু আল্লাহর বর্ষিত রহমতেও তাদের হৃদয় খুশী হয় না।

আমরা হোটেল কর্তপক্ষের সাথে সমঝোতা, চুক্তি করতে পারি। তাদেরকে বলতে পারি, আপনারা এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট লোক নিয়োগ করুন। (তাকে বেতন দিন) আমাদের সমাজে অনেকেই সেবামূলক কাজ আগ্রহী। কিন্তু অপেক্ষায় থাকে, দেখি কেউ এগিয়ে আসে কি না। যদি কেউ এগিয়ে আসে তাহলে তিনিও এগিয়ে যান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তার সাথে কোন কিছুর শরীক স্থাপন করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। নিকটাত্মীয় এতিম ও মিসকিনদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো। *[সূরা নিসা : ৩৬]*

আল্লাহ তায়ালা এখানে এতিম, দরিদ্র-মিসকিনদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

একদা হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হজ্বে যাচ্ছিলেন। তার সাথে সফরের খাদ্য-পানীয় ও গোলাম ছিল। তিনি এক মহিলাকে দেখলেন, ময়লা আবর্জনায় কী যেন তালাশ করছে। অতঃপর সে একটি মৃত মুরগীর বাচ্চা বের করে আনে। মহিলাটি মুরগির চামড়া ছিলে বাসায় নিয়ে যাচ্ছিল।
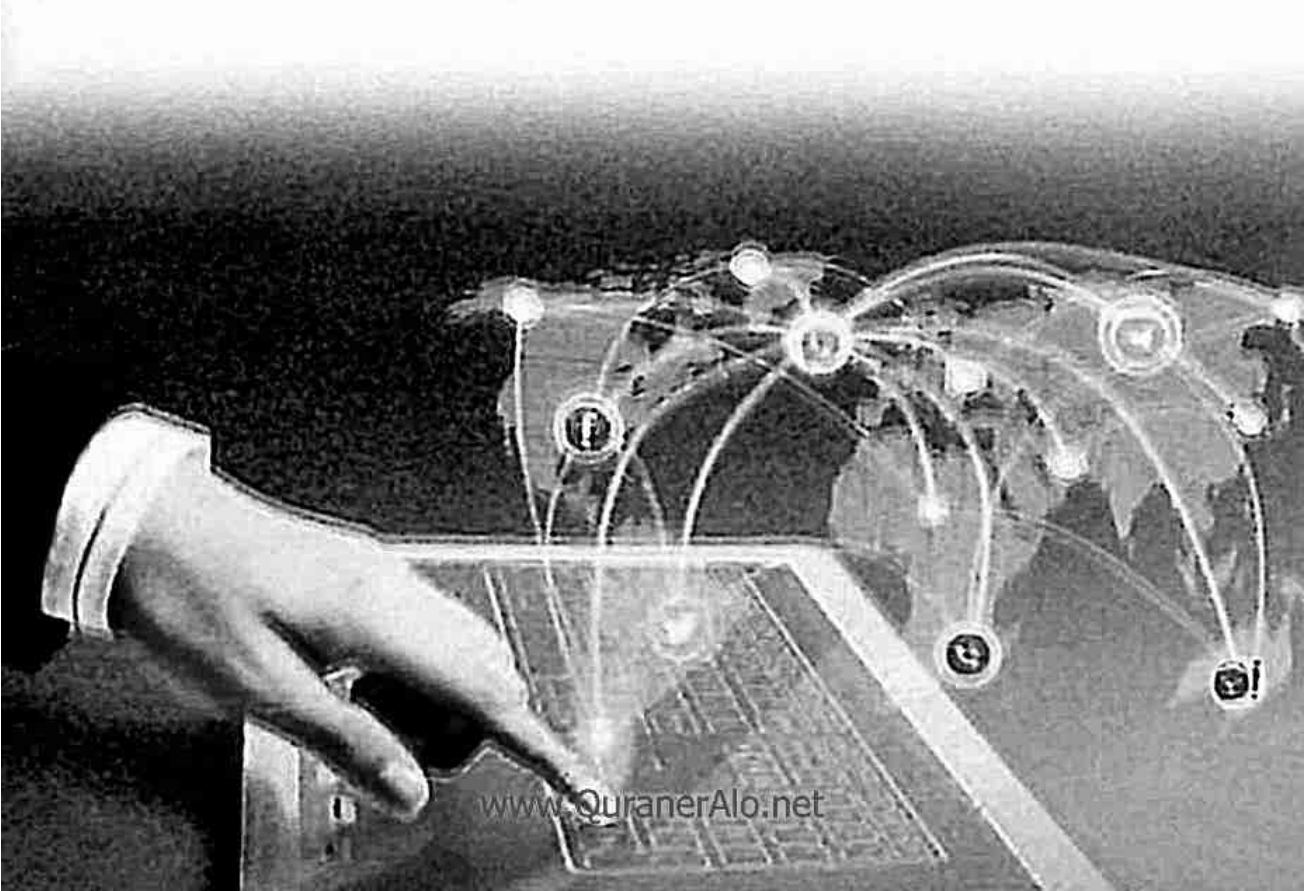
তখন ইবনে মুবারক রহ. তার কাছে গিয়ে বললেন, তুমি এটা কিভাবে আহার করবে? অথচ তা মৃত। শরীয়তে মৃত খাওয়া বৈধ নয়।

মহিলা উত্তর দিল, এই মৃত ভক্ষণ আল্লাহ আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলে, তা কিভাবে?

মহিলা বলল, আল্লাহর শপথ, আমাদের এত ক্ষুধা লেগেছে যা এই মৃত মুরগী বাচ্চা খাওয়া হালাল করে দিয়েছে।

তখন ইবনে মুবারক রহ. বললেন, আল্লাহর নিকট হজ্বের তুলনায় এই মহিলাকে দান করা অতিপ্রিয়। এরা মৃত জানোয়ার খাচ্ছে আর আমি হজ্বে যাবো! এই বলে তিনি তাকে হজের সমস্ত পাথেয়, অর্থকড়ি দিয়ে দিলেন।

সর্বশেষ আমার মুসলিম ভাইদের নিকট আবেদন, তারা যেন এই কাজটিকে তাদের মৌলিক দায়িত্ব মনে করেন এবং সর্বত্র পালন করতে সচেষ্ট থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে তিনি যেন সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(১২)
এতিমের মাথায় হাত বুলাও

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٌ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়।

আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন? জনৈক কবি বলেন–

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم * فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।

২. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

৩. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য।

৩. তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৪. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৫. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন–

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى

'তিনি কি তোমাকে এতিম পাননি অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন।'

[সূরা দুহা : ৬]

ইসলাম দয়া ও ভালোবাসার ধর্ম। এই ধর্ম হৃদয়ে আশার প্রদীপ প্রজ্বলিত করে। অসহায়ের দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম। এই ধর্মের মহান শিক্ষা হচ্ছে, আপনি আল্লাহপ্রদত্ত ধন-সম্পদ, প্রাচুর্য ও নেয়ামত অধিকারী হলে আপনার কাঁধে অর্পিত দায়িত্বও সঠিকভাবে পালন করতে হবে। হে বনী আদম, তুমি অপরের প্রতি দয়াপরবশ হও তাহলে আল্লাহও তোমার প্রতি দয়ালু হবেন। তোমার মুচকি হাসি, দান-খয়রাত, হৃদয়ের সহানুভূতি
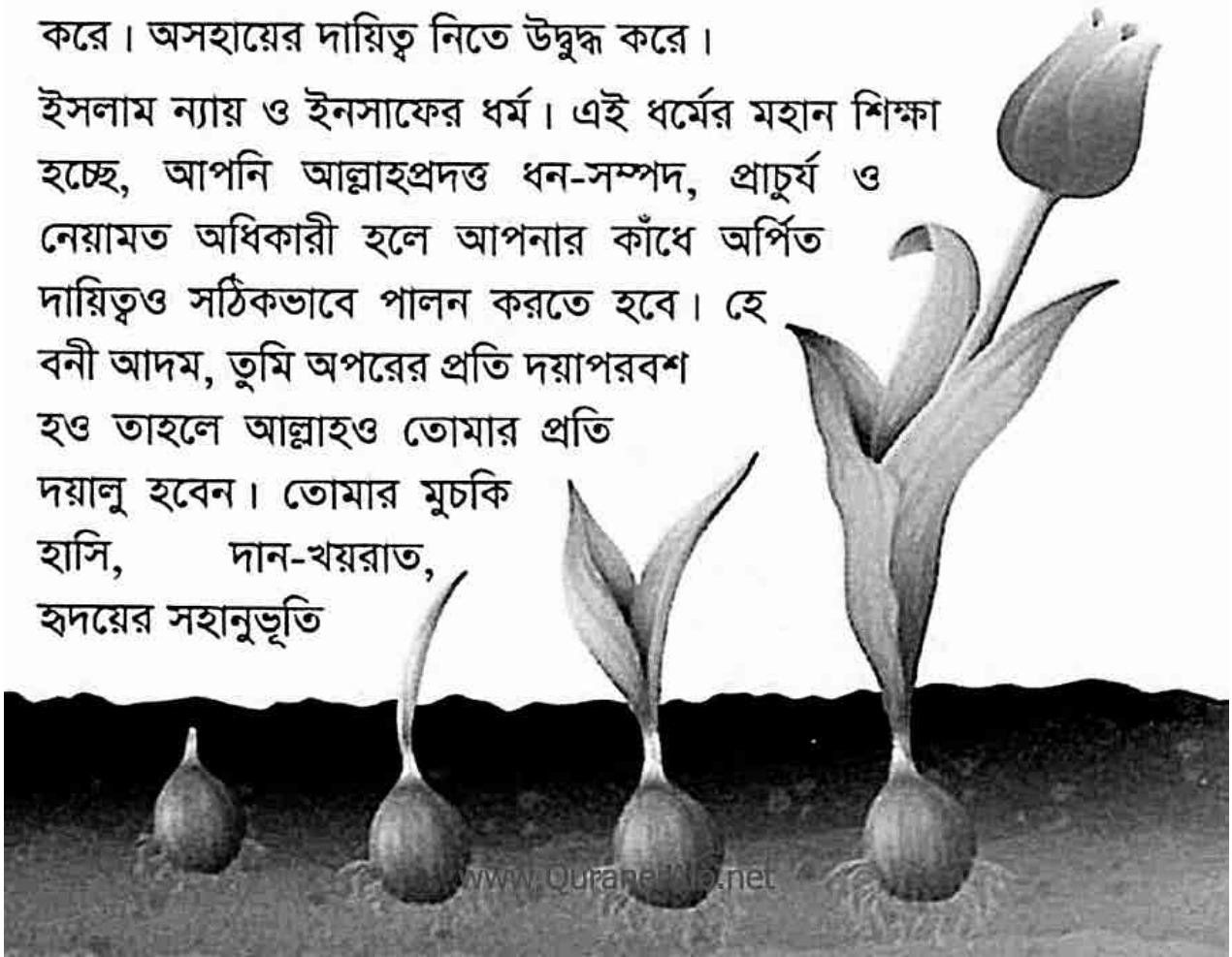
দিয়ে অপরকে খুশী করো। তাহলে তোমাকেও খুশী করা হবে।

আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এই গুরুদায়িত্ব পালন করে আমাদের প্রত্যেকে মুসলিম উম্মাহর সেবা করতে পারেন। রেখে যেতে পারেন অবদান। সেই মহৎ কাজটি হচ্ছে ইয়াতিমের দায়িত্বভার গ্রহণ। আসুন ইয়াতিমের মাথায় হাত রেখে জান্নাতে রাসূলের সাহচর্য লাভে ধন্য হই।

এক তথ্য মতে, ইসলামী বিশ্বে পাঁচ মিলিয়ন এতিম শিশু আছে যারা কাফালতের মুখাপেক্ষী। আজকে আমি এতিমদের দায়িত্বগ্রহণ করে এমন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় নিয়ে কথা বলবো না। তার মানে এই নয়, আমি তাদের অবদানকে খাটো করে দেখছি। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকে যেন এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে সাধ্যমতো ভূমিকা রেখে যেতে পারেন।

আমি একটি আরব রাষ্ট্র সফর করেছিলাম। সেখানে চার লক্ষ এতিম শিশু আছে। যাদের মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ হাজারের দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। আর অবশিষ্টরা কাফালতের মুখাপেক্ষী। এরা রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি করছে।

অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান দাতব্যসংস্থার সকল এতিমের দায়িত্ব নেওয়ার সামর্থ থাকে না। তাদের এই পরিমাণ অর্থ নেই যা দিয়ে সবার দেখাশুনা করা যায়। কিন্তু সেসব এতিমের প্রতিবেশীরা কোথায়? তাদের শিক্ষকবৃন্দ কোথায়? যারা রাস্তায় তাদের ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখে তারা কোথায়? তারা কেন তাদের দায়িত্বগ্রহণে এগিয়ে আসছে না?

আজকে আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করবো। পাশাপাশি এ নিয়েও আলোচনা করবো যে, সহায়তা

বলতে শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তাই মুখ্য নয়।

বরং মানসিক সহায়তাও প্রয়োজন। আসুন প্রথমে আমরা কুরআন-হাদীসে দেখি কী নির্দেশনা এসেছে।

পবিত্র কুরআনে এতিমের মর্যাদা

এতিমের দায়িত্বগ্রহণে মর্যাদা ও নির্দেশনা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পবিত্র কুরআনে অনেক। যেমন–

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ

তারা আপনাকে এতিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের 'ইসলাহ' তথা সুব্যবস্থা (পুনর্বাসন) করা উত্তম। *[সূরা বাকারা : ২২০]*

অর্থাৎ আপনি যদি তাদের উন্নয়নে কল্যাণমূলক কিছু করতে চান, তাহলে তাদের ইসলাহ তথা সার্বিক দেখ-ভালের সুব্যবস্থা করুন। তাদের 'ইসলাহ' বলতে ইনফাক তথা আর্থিক সহায়তা বুঝায় না। বরং সার্বিক খোঁজখবর, ভাল-মন্দ দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান উদ্দেশ্য।

হে ভাই, আপনি হয়তো পথের ধারে কোন এতিমকে খেলাধূলা করতে দেখলেন। সে খেলার ছলে মাটি থেকে সিগারেট তুলে মুখে দিচ্ছে। তখন তাকে বাধা দিয়ে বলবেন, দেখ, এটা তোমাকে ক্ষতি করবে। এভাবে তাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে বলবেন, তুমি অমুক অমুকের সাথে চলবে না। (এইসব কর্মও আয়াতে বর্ণিত ইসলাহের অন্তর্ভুক্ত।)

এতিমদের অধিকার প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

(আর তোমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে) এতিমদের প্রতি যেন সুবিচারে কায়েম থাক। যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর না কেন, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

[সূরা নিসা : ১২৭]
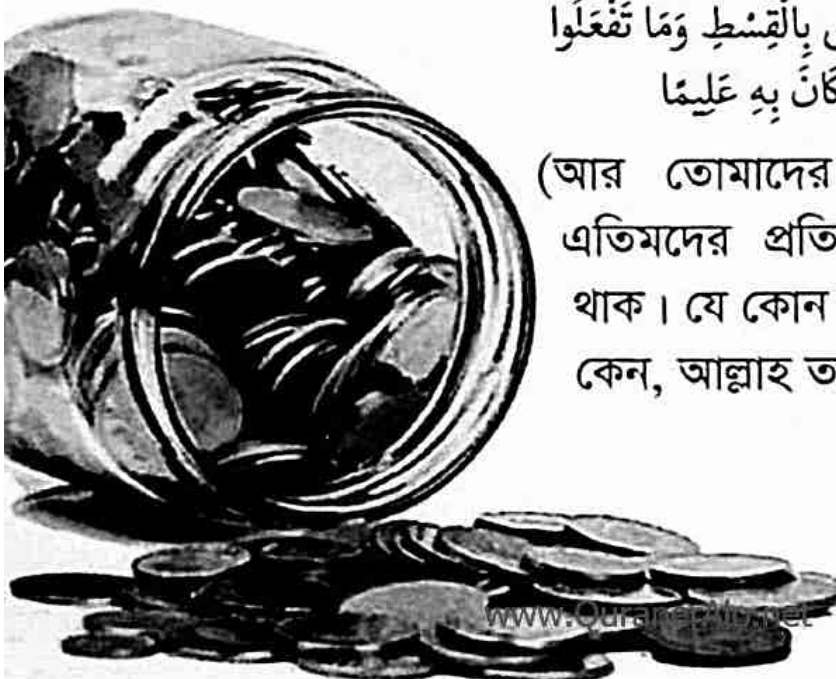
অর্থাৎ আমাকে তার সাথে ইনসাফপূণ আচরণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কোন এতিম বালক আপনার কাছে সবজি ক্রয় করতে আসল। আপনি জানেন সে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অধিকন্তু এও জানেন যে, এই বালক ওয়ারিশ হিসাবে অনেক সম্পদের অধিকারী। তাই দাম বাড়িয়ে যা বলবো তাই সে দিয়ে দিবে। এমন পরিস্থিতি আপনাকে আদালত রক্ষা করতে হবে। তার কাছে সঠিক ও ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করতে হবে।

যারা এতিমের প্রতি অন্যায় অবিচার করে আল্লাহ তায়ালা তাদের ভর্ৎসনা করে বলেন–

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

অসম্ভব, (কখনো নয়) বরং তোমরা এতিমের সম্মান রক্ষা করো না।

[সূরা ফজর : ১৭]

কুরাইশরা এতিমদের উপর জুলুম নির্যাতন করত। পিতা মারা গেলে চাচা এসে ভাতিজার সমুদয় সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজ উদরে হজম করে ফেলত। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই মন্দ কর্ম নিষিদ্ধ করেন।

ইয়াতিমের অধিকার সম্পর্কিত আরেকটি আয়াতটি হচ্ছে–

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

অর্থ : আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না। *[সূরা দুহা : ৯]*

এতিমকে ধমক দিবেন না। অতিরিক্ত প্রশ্নবানে জর্জরিত করে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিবেন না। বরং তার প্রতি দয়া ও কোমলতা প্রদর্শন করুন।

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)

তারা আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও (আল্লাহর ভালোবাসায়) অভাবী, এতিম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। (এবং তারা বলে) কেবল আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে আহার্য দান করি। বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। *[সূরা ইনসান : ৮-৯]*

হাদীসে এতিমের মর্যাদা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

'আমি ও এতিমের জিম্মাদার জান্নাতে এত কাছাকাছি থাকবো।' এই বলে তিনি তার শাহাদাত ও মধ্য অঙ্গুলি মিলান। এর দ্বারা অতি নিকটত্ব বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা, আঙুলদ্বয় পরস্পর অতি নিকটে অবস্থিত।

প্রশ্ন : কেন এতিমের জিম্মাদার জান্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এতো কাছে থাকবেন?

উত্তর : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের কাছে এমন এক মুহূর্তে হিদায়াতের আলোকপ্রদীপ নিয়ে এসেছেন যখন সে মুর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর তিনি উম্মতের দায়িত্ব নিলেন এবং তাকে সত্য ও কল্যাণের পথে পথ দেখালেন। তারা দিশা পেল। তদ্রূপ এতিমের জিম্মাদার এমন এক মুহূর্তে তার দায়িত্ব নিয়েছে যখন সে পথহারা। সে দুনিয়ার কাজ-কারবারে অনভিজ্ঞ। তার খোঁজখবর নেওয়ার মতো কেই নেই। কাফিল জিম্মাদার তার সার্বিক বিষয়াদির সুব্যবস্থা করেছে। তাকে সঠিক পথে নির্দেশনা দিয়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন পথহারা উম্মতের দায়িত্ব নিয়েছেন তদ্রূপ এই জিম্মাদারও অনভিজ্ঞ এতিমের দায়িত্ব

নিয়েছেন তদ্রূপ এই জিম্মাদারও অনভিজ্ঞ এতিমের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের কর্মে সাদৃশ্য আছে। তাই সে জান্নাতে নবীজীর সাহচর্য লাভে ধন্য হবে।

এতিমের মর্যাদা সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

বিধবা-এতিম ও গরিবের সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে মুজাহিদের সমতুল্য। অথবা তার মর্যাদা সেই (নামাজের জন্য) রাত্রি জাগরণকারীর ন্যায় যে কখনো ক্লান্ত হয়। অথবা তার মর্যাদা সেই রোজাদারের ন্যায় যে কখনো ইফতার (রোজাভঙ্গ) করে না। *[মুসলিম : ৫২৯৫]*

এ সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস এটি। জিহাদের ফযিলত স্পষ্ট। তদ্রূপ যে আবেদ নিরলসভাবে রাতের নির্জনে নামাজ পড়ে এবং ধারাবাহিক রোযা রেখে যায় তার মর্যাদাও অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু তাদের সমতুল্য সওয়াব পাবে বিধবা-ইয়াতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী। আপনি বিধবাকে আর্থিক সহায়তা, তাকে সৎ উপদেশ ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান, সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার সুব্যবস্থা করে এই সওয়াব অর্জন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, শুধু পুরুষরা এই কাজ করলে সওয়াব পাবে বিষয়টি এমন নয়, বরং মহিলারাও তাদের প্রতিবেশী বিধবাদের খোঁজখবর নিয়ে আলোচ্য হাদীসের মর্যাদা লাভ করতে পারেন।

আরেকটি হাদীসে এসেছে–

مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ
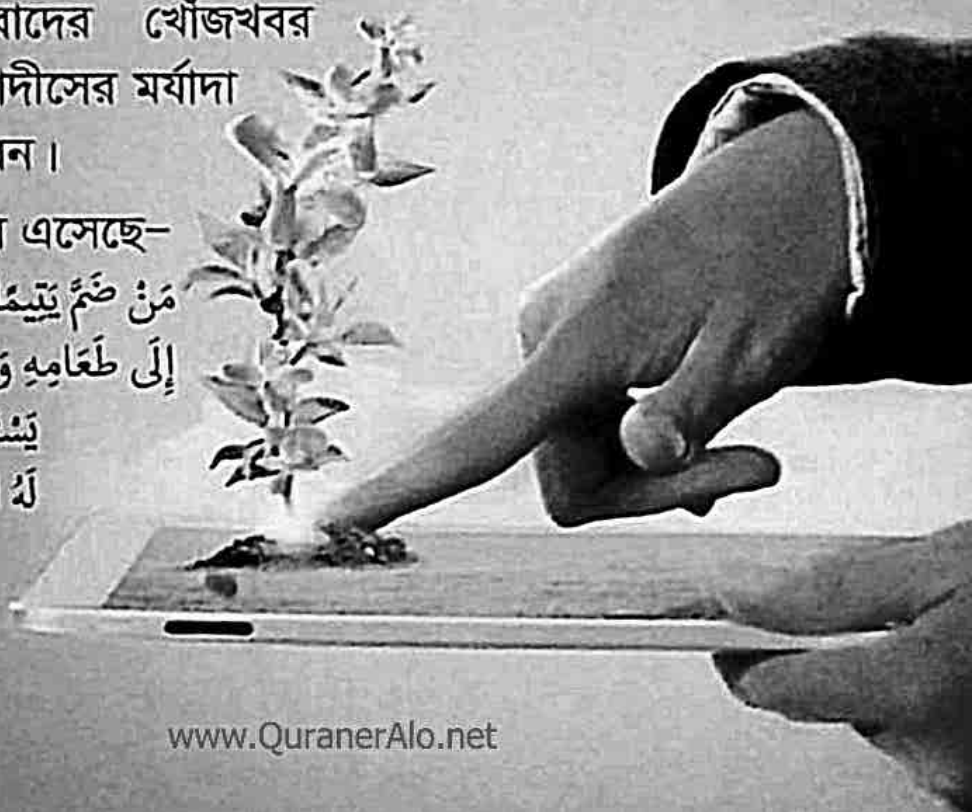
যে ব্যক্তি কোন এতিমকে আপন পিতামাতার সাথে নিজেরদের (পারিবারিক) খাবারের আয়োজনে বসায় এবং (তাকে এই পরিমাণ আহার্য দান করে যে,) সে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। *[মুসনাদে আহমদ : ১৮২৫২]*

আরেকটি হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তুমি কি চাও তোমার হৃদয় নম্র হোক, তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করা হোক? তাহলে তুমি এতিমের প্রতি দয়ার্দ্র হও, তার মাথায় হাত বুলাও এবং তোমার খাবার থেকে তাকে খাবার দাও। *[তিবরানী]*

হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ

যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় হাত বুলাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে সেই চুল পরিমাণ নেকি দান করবেন যার উপর দিয়ে হাত ছুঁয়ে গেছে।

[মুসনাদে আহমদ : ২১১৩২]

চিন্তা করুন, এতিমের মাথায় হাত বুলালে কত ফজিলত! শুধু তাই নয় এতে আপনার হৃদয় কোমল হবে। আপনার দৈনন্দিন চাহিদা পূর্ণ হবে।

ইসলাম আমাদের এ ধরণের সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের শিক্ষা দেয়। এ ধরণের আচরণ সর্বত্র প্রয়োগ করতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তাকিদ দিয়েছেন।

ইসলাম সহানুভূতি ও কোমলতা বিবর্জিত রুঢ় আচার-ব্যবহারে বিশ্বাস করে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জনৈক যুবক এসে আবদার করল,

ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে যিনা (অবৈধ যৌনমিলন) করার অনুমতি দিন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধমক দেন নি। বরং নম্রতার সাথে তাকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কী অন্য কেউ এই কর্ম তোমার আপন মা-বোনের সাথে করতে রাজী হবে? আপন খালার সাথে করতে অনুমতি দিবে?' (যুবক এতটুকু কথায় লজ্জিত হয়ে গেল) তখন যুবক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করুন তিনি যেন আমার হৃদয় পবিত্র করে দেন।

তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কাছে এসো। যুবক কাছে আসলে তিনি তার হাত মুবারক যুবকের বুকের উপর রেখে বললেন, 'হে আল্লাহ! এই যুবকের কলব আপনি পবিত্র করে দিন। তার গোনাহ ক্ষমা করে দিন। তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করুন।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত তার বুকের উপর রেখেছেন। এই হচ্ছে অপরের সাথে উত্তম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত। এরই নাম কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যখন আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেন।' তখন নবীজীর হস্তমুবারক আমার হস্তদ্বয়ের মাঝে রাখলেন। অতঃপর নবীজীর অপর হাত আমার হাতের উপর রেখে এবার বললেন, হে আব্দুল্লাহ, যখন তুমি তাশাহহুদের জন্য বসবে তখন এই দুআ পড়বে।

(এই বলে তিনি তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেন।)

এ ধরণের মমতাপূর্ণ কোমল ব্যবহার এতিমদের সাথে করতে হবে। কাজেই কোন এতিমের সাথে দেখা হলে মমতার সাথে জিজ্ঞাসা করবো, তোমার নাম কি? তুমি কি পড়? তাকে উৎসাহ দিয়ে বলবো, মাশাআল্লাহ! তুমি তো অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন। অমুক অমুক সূরা মুখস্থ কর। তুমি অন্যদের থেকে ভিন্ন। সুতরাং অমুকের সাথে চলাফেরা করবে না।

আপনার হাতের শীতল স্পর্শ তাকে প্রশান্তি দান করবে। তার বিশ্বাস আস্থা বৃদ্ধি করবে। আপনার ও তার মাঝে অন্যরকম এক সহানুভূতির বন্ধন সৃষ্টি হবে। আপনার হৃদয় রুক্ষতা, রুঢ়তা পরিবর্তে কোমলতায় ভরে যাবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এসব ধন-সম্পদ সবুজ ও মিষ্ট। তবে ঐ মুসলমানের মাল সবচেয়ে উত্তম যে তা থেকে এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরদের দান করে। *[আহমদ]*

অন্যত্র বলেন, ধন-সম্পদ মুসলমানের জীবনে উৎকৃষ্ট বস্তু। তবে শর্ত হচ্ছে যদি তা এতিম-মিসকিন ও মুসাফিরদের কল্যাণে খরচ করা হয়।' আল্লাহর রাসুল এখানে প্রথমে এতিমদের কথা বলে উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরোও বলেন, সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিমগৃহ সেটাই যে গৃহে এতিম আছে এবং তার সাথে উত্তম ও কোমল আচরণ করা হয়। আর সর্বনিকৃষ্ট গৃহ সেটা যেখানে এতিম আছে কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।'

তাই আপনি যদি আমার গৃহকে বরকতময় করতে চান তাহলে এতিম প্রতিপালনে আগ্রহী হোন।

স্মর্তব্য যে, এতিম ও পরিত্যক্ত শিশুর মাঝে সামান্য পার্থক্য আছে। এতিমের পিতৃপরিচয় আছে। কিন্তু পরিত্যক্ত শিশুর মাতৃ-পিতৃ পরিচয় নেই। তাকে রাস্তায় পতিত পাওয়া গেছে। কিন্তু উভয়ের দায়িত্বগ্রহণে একই ফজিলত ও মর্যাদা পাওয়া যাবে।

তাই আমার আহ্বান, যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে এতিমের জিম্মাদারী গ্রহণ করুন। চাই সে সৌদির অধিবাসী হোক বা উপসাগরীয় দেশে অথবা অন্য কোন দেশের এতিম হোক না কেন।

আপনি যদি বুঝতে পারেন আপনার স্ত্রী গর্ভবর্তী। দুই তিন মাস পর সন্তান জন্ম দিবে। তখন থেকে আপনি কোন এতিম বা পরিত্যক্ত শিশুর সন্ধান করতে থাকুন। পরবর্তীতে বাসায় এনে আপনার নতুন ভূমিষ্ট শিশুর সাথে তাকেও লালন পালন করুন। তাকে আপনার স্ত্রী দুগ্ধ পান করাবে। (এতে বড় হলে পর্দার জটিলতা থাকবে না। সে তখন দুগ্ধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে।) হাদীসের ভাষ্যমতে এই গৃহ হবে সবচেয়ে বরকতময় গৃহ।

এক রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৯ সালে জার্মানিতে প্রায় ২৩ হাজার পরিবার মুসলিম দেশসমূহ থেকে এতিম শিশু নিয়ে লালন-পালন করে।

সুতরাং আমরা এসব এতিমদের দায়িত্বগ্রহণ করে, তাদের জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা করে সমাজে অবদান রেখে যেতে পারি। এই কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য বড় সংস্থা-সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই।

আমরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে পারি। বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। তাদের মধ্যে যারা মেধাবী, যাদের সৃজনশীল ক্ষমতা আছে, তাদের জন্য আলাদা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের এসব কর্মতৎপরতা তাদের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করবে। তবে লক্ষণীয় যে, এসব কাজ এমন আন্তরিকতার সাথে করতে হবে যেন আমাদের হৃদয়ে তার পিতৃহীনতার বিষয়টি অনুভূত না হয়।

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি ইহসান (অনুগ্রহ) করবে আল্লাহ তার প্রতি ইহসান করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَحْسِنُوْا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

তোমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।
[সূরা বাকারা : ১৯৫]

অনেকে এতিমের সাথে আচরণে অতিসাধুতার ভান করেন। লৌকিকতার আশ্রয় নেন। এগুলো বর্জন করতে হবে। এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কোলে একজন এতিম শিশু আছে। তার সাথে আমার কীরূপ ব্যবহার হারাম আর কীরূপ ব্যবহার হালাল? অর্থাৎ আমি কিভাবে তার সাথে ব্যবহার করবো? তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার আপন ছেলেকে যেভাবে ভদ্রতা শিক্ষা দিতে তাকে সেভাবে শিক্ষা দাও। যেভাবে তোমার ছেলেকে প্রহার করতে তাকেও তদ্রূপ (পিতৃস্নেহপূর্ণ) প্রহার করো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্য এই শিক্ষা দিয়েছেন যেন তার হৃদয়ে এই অনুভূতি সৃষ্টি না হয় যে, সে একজন এতিম বলে তুমি তার সাথে এমন আচরণ করছো।

আমাদের দায়িত্ব তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। তাদের মাঝেও এমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে পারে যারা সমাজ পাল্টে দিবে। ইসলামী ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।

ইমাম আহমদ রহ. পিতৃহীন শৈশবকাল অতিবাহিত করেছেন। ৩ বছর বয়সে তার পিতা মারা যায়।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এতিম ছিলেন। সুফিয়ান সাওরি রহ. এতিম ছিলেন। ইমাম আওযায়ী রহ. যিনি ফিকহের মস্তবড় ইমাম ছিলেন তিনিও একজন এতিম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, মানবতার মুক্তির দূত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগত ভাবেই এতিম ছিলেন। তাঁর সম্মানিত পিতা জন্মের পূর্বেই মারা যান। অথচ তিনি অন্ধকার পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন।

উপরের উদাহরণ ছাড়াও এমন অনেকে এতিম হয়ে শৈশব কাটিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আপনাদের সামনে একটি আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করছি। শায়েখ মুহাম্মদ (হাফিজাহুল্লাহ) একদা একটি পতিত এতিম শিশু আপন ঘরে এনে অন্যান্য সন্তানদের সাথে প্রতিপালন করতে লাগলেন। স্ত্রীর সাথে তিনি এই বলে সমঝোতা করেছেন যে, আমরা মানুষকে জানাবো, এটা আমার আরেক স্ত্রীর সন্তান যাকে আমি গোপনে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু সে এখন মারা গেছে। তাই বাচ্চাটি নিয়ে এসেছি যেন সে এই স্ত্রীর কোলে পালিত হতে পারে।

স্ত্রী খুশী মনে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি বাস্তবিক আরেকটি বিয়ে করার তুলনায় এই সিদ্ধান্ত আমার প্রতি অনেক দয়াতুল্য।' পরবর্তীতে লোকেরা প্রশ্ন করলে এই উত্তর দিত। শিশুটি তাদের পরিবারে বড় হতে লাগল। লোকেরা এমনকি তার আপন সন্তানরাও জানে না যে, সে তাদের ভাই নয়।

শায়খ মুহাম্মদ বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমার বেতন খুব সামান্য এবং আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল না। কিন্তু এই এতিম শিশুটি আমাদের এখানে আসার পর পুরো দুনিয়া যেন আমার ঘরে এসে যায়। প্রত্যেক জিনিস সহজ হয়ে গেল। জীবিকা বৃদ্ধি পেল। আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসল।

পাশাপাশি মানুষের আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেল। স্ত্রীর সাথে আন্তরিক ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হলো। আমাদের সংসার সুখে শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠে।

তিনি বিপদে পড়লে অনেক সময় (হাদীসে বর্ণিত) গুহাবাসীদের ন্যায় 'আমলে সালেহ' তুলে ধরে আল্লাহর দরবারে দুয়া করতেন। তিনি বলেন, যখন কোন মসীবতে পড়তাম, তখন আল্লাহকে স্মরণ করতাম আর এভাবে দুআ করতাম, 'হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এই এতিম শিশুর ভরণ-পোষণ করছি, তাহলে আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।'

আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের সমাজে তো অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে যা মানুষকে এ ধরণের কাজ করতে বাধা দেয়। তাই কিভাবে আপনার স্ত্রী এতো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হলেন? কিভাবে তিনি একটি পরিচয়হীন শিশুকে নিজের আপন সন্তানদের সাথে বড় হতে দিলেন?

তখন তিনি উত্তর দিলেন, প্রথমে আমার স্ত্রী রাজি ছিল না। এখানে বলে রাখি যে, এতিম প্রতিপালনের চিন্তাটি আমার মাথায় জনৈকা আত্মীয়ার সংসারের হালত দেখে আসে। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'তিনি একজন এতিমের জিম্মাদারী নেওয়ার পর সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।
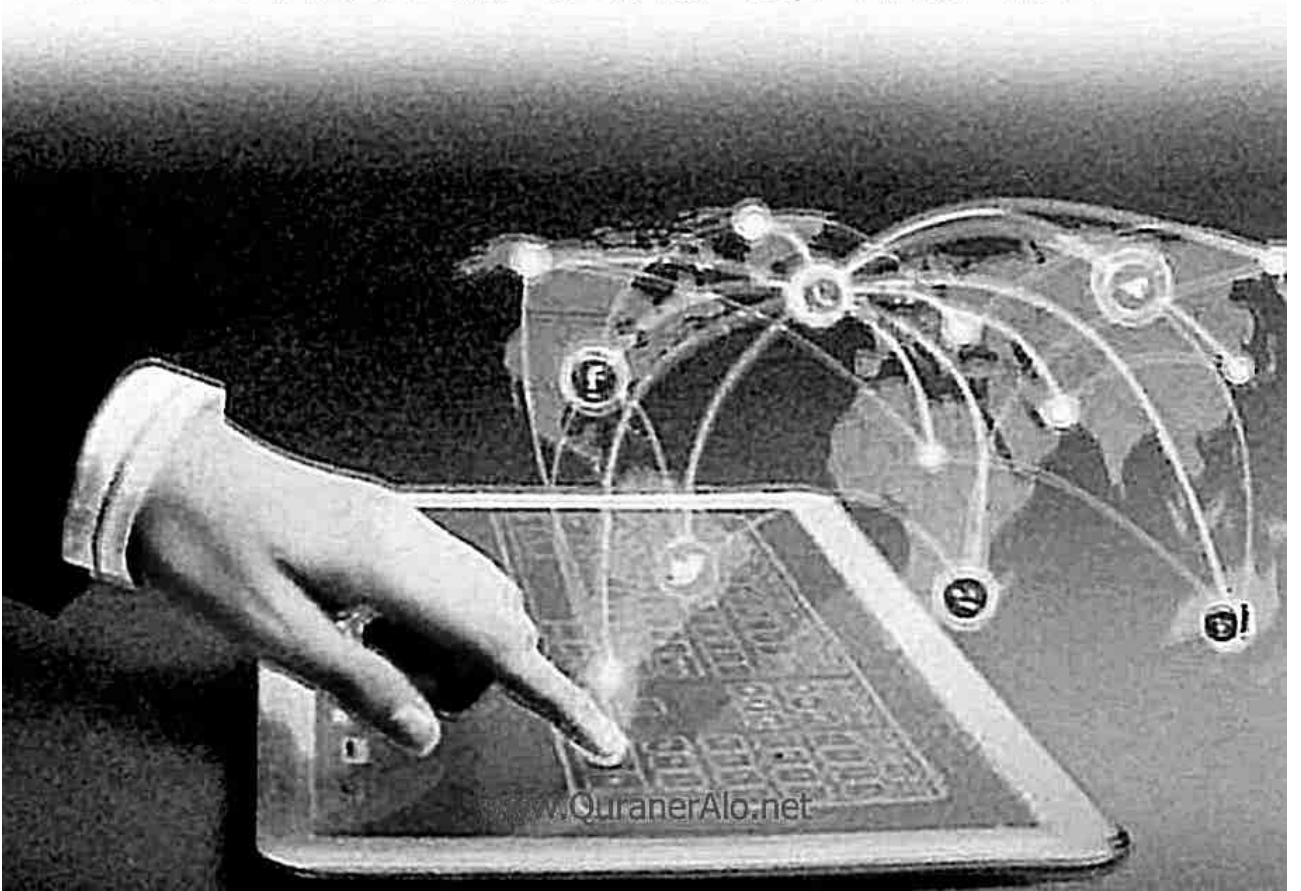
রিযিকে প্রশস্ততা আসে।' সেদিন থেকে চিন্তা করতে থাকি যে, আমিও একজন এতিম পালন করবো।

স্ত্রীর কাছে এই প্রস্তাব পেশ করলাম। প্রথমে সে রাজি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে রাজি হয়। আল্লাহর রহমতে একটি এতিম শিশু নিয়ে আসলাম। শিশুটি সংসারে আনার পর আমার এবং তার নিকটাত্মীয়রা কানাঘুষা করতে লাগল। তারা তীর্যক ভাষায় আমাদের আঘাত করল। প্রথম কিছুদিন কষ্ট অনুভব হলেও পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যায়।'

ইমাম ইবনে বাযের ফতোয়ায় লেখা আছে, যে ব্যক্তি এতিমের জিম্মাদার হবে সে অগণিত সওয়াব পাবে। বন্ধুবর মুহাম্মাদ সেই এতিম শিশুর সাথে এমন সুন্দর ব্যবহার করতেন যা তার ঔরসজাত সন্তানের বেলায়ও হতো না। উল্লেখিত ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তা আমাদের প্রত্যেকের জন্য উপদেশ ও উৎসাহের কারণ হয়। আমরা যেন এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

অনেক এতিমখানায় এমন দুধের শিশু পাওয়া যায় যাদের বয়স মাত্র একমাস। আপনি কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা করে তাকে বাসায় নিয়ে আসতে পারেন। আপনার স্ত্রী যদি স্তন্যদানকারিণী হয়ে থাকে তাহলে দুধ পান করাবে। এতে শিশুটি নিজের সন্তানের ন্যায় হয়ে যাবে। আর যদি স্তন্যদানকারিণী না হয় বরং তার বোন স্তন্যদানকারিনী হয় তাহলে বোনের দুধ পান করবে। ফলে হুরমত (দুগ্ধ সম্পর্ক) সাব্যস্ত হবে। বড় হলে পর্দার জটিলতা থাকবে না। মোটকথা, এসব শিশু এতিমখানায় প্রতিপালিত হওয়ার চেয়ে বাসায় বড় হওয়া অনেক ভাল।

কেউ যদি এতিমখানা থেকে শিশু আনতে লজ্জাবোধ করেন তাহলে আপনার প্রতিবেশী বা কোন আত্মীয়ের এতিম শিশু নিয়ে আসুন।

স্ত্রী যদি এতিম পালনে রাজি না হয় তাকে বুঝাবেন। কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সওয়াবের কথা শুনাবেন। তাকে এই বলে আশ্বস্ত করবেন, দেখ, এই শিশুকে আমরা দু'মাস লালন করবো অতঃপর তাকে আবার এতিমখানায় ফিরিয়ে দিয়ে আসবো। (দুই মাসে হয়তো স্ত্রীর মন নরম হবে।)

এতিম শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেন, এতিমদের সাথে উঠাবসা করে আমার অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। একবার একটি এতিমখানা পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে প্রাথমিক স্তরের একজন এতিম ছাত্র আমাকে জানালো শিক্ষক তাকে রচনা লিখে নিয়ে আসতে বলেছেন। সে আমার কাছে সাহায্য চাইল যেন তার জন্য একটি সুন্দর বিষয়বস্তু ঠিক করে দেই। তখন আমি তাকে বললাম, সবচেয়ে ভালো বিষয়বস্তু হচ্ছে তুমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতৃহীন হয়েও কিভাবে সংগ্রামী হয়েছেন, কিভাবে বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁর জীবন সাফল্যে ভরপুর ছিল- ইত্যাদি বিষয়ে রচনা লিখ।

এ কথা শুনে শিশুটি আমাদের দিকে আশ্চর্যভাবে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি আমাকে সহপাঠীদের সামনে লজ্জিত করতে চান। তারা তো হাসি ঠাট্টা করবে।' অর্থাৎ সে মনে করেছে পিতৃহীনতা একটি দোষণীয় বিষয় যা শুনে সহপাঠীরা বিদ্রূপ করবে।

আরেকবার আমি কিছু এতিমদের নিয়ে পার্কে গেলাম। পার্কে রাস্তার পাশে অনেক বানর খেলাধুলা করছিল। কিছু শিশু বানরের কাছে গিয়ে খেলতে চাইল।

ঘটনাক্রমে আমরা যখন পার্কে ছিলাম তখন একজন পিতা তার সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে এসেছিলেন। তিনি তার সন্তানদের বানর দেখাচ্ছিলেন। সেখানে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকিত হয়। একটি শিশুবানরকে তার মা বানর কোলে করে লুকিয়ে রেখেছে যেন পার্কের ছেলেদের নিক্ষেপিত বস্তু বাচ্চার গায়ে না লাগে।

এই বিরল দৃশ্য দেখিয়ে আগন্তুক পিতা উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিলেন। মায়ের মমতা ও ভালোবাসা নিয়ে অনেক কথা বললেন। এতিমরাও সে আলোচনা শুনছিল। তিনি বললেন, 'দেখ, এই মা কিভাবে তার সন্তানকে হেফাজত করছে।'

আমার সাথে থাকা সবাই নিশ্চুপ ছিল। হঠাৎ একজন এতিম বলে উঠল, 'আমার হৃদয়ে আশা সে যদি আমার মা হতো! যদিও সে বানর।' (চিন্তা করুন, কত আবেগপূর্ণ কথা। এতিমটি মাতৃস্নেহের প্রত্যাশায় বানরকে মা হিসাবে কামনা করছে।)

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা এদের হৃদয়ের ভাষা বুঝতে চাই না। আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন প্রত্যেক এতিমের জন্য একজন দয়াবান জিম্মাদার তৈরি করে দেন।

এই ভাই আমাকে জানিয়েছেন, সঠিক তত্ত্বাবধানের ফলে অনেক এতিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষিত হয়ে জাতির সেবা করে যাচ্ছে।

পশ্চিমাদের ধোঁকাবাজি

আমি অনেক খ্রিস্টান মিশনারিদের নিয়ে গবেষণা করেছি। আমি দেখেছি যুদ্ধ বিধ্বস্ত, দুর্যোগ কবলিত মুসলিম দেশ থেকে কিভাবে এতিম সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কিভাবে ছলেবলে তাদেরকে পরবর্তীতে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলে।

আপনারা জানেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক-আফগানে কী পরিমাণ নির্যাতন করা হয়েছে। এক ইরাকেই কয়েক মিলিয়ন শিশু এতিম। আফগানিস্তান, সোমালিয়াতেও তাই।

পরিতাপের বিষয় যে, অনেক অত্যাচারী রাষ্ট্র শুধু মুসলিম দেশসমূহে নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। যুদ্ধ লাগিয়ে রাখে। তারপর সামান্য সেবার দোহাই দিয়ে দাতব্য সংস্থার নামে মিশনারিদের পাঠায়। ইরাকে কথিত সাহায্যের নামে একশত খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা প্রেরণ করা হয়েছে।

২০০৪ সালে সুনামি আঘাতের পর প্রকাশ্যে অনেক খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠন বিপর্যস্ত এলাকায় প্রবেশ করে। তারা সেবার নামে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকে। এতিমদের জন্য প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রথম বিদ্যালয়েই প্রায় তিনশত এতিম ভর্তি হয়। এরপর এসব শিশুদের কৌশলে নিজ দেশে নিয়ে যেত। পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার সরকার তাদের চক্রান্ত বুঝতে পেরে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি শুরু করে। সরকার ১৬ বছরের নিচের কোন শিশুকে নিয়ে যেতে বাধা দেয়।

জনৈক মিশনারি লিখেন, আমরা প্রথমেই তাদেরকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলি না। বরং তাদের সামনে এমন সেবা পেশ করি যে, এক পর্যায়ে এসব শিশুরা কৌতুহল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন আপনারা এতো দয়ালু? কেন আমরা গরিব? কেন আপনারা আমাদের সাহায্য করছেন? তখন আমরা (চতুরতার সাথে) উত্তর দেই, 'যিশুখ্রিস্ট আমাদেরকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।' (তখন বাচ্চারা যিশুখ্রিস্টের প্রতি আকৃষ্ট হয়। খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানতে চায়। পরবর্তীতে খ্রিস্টান
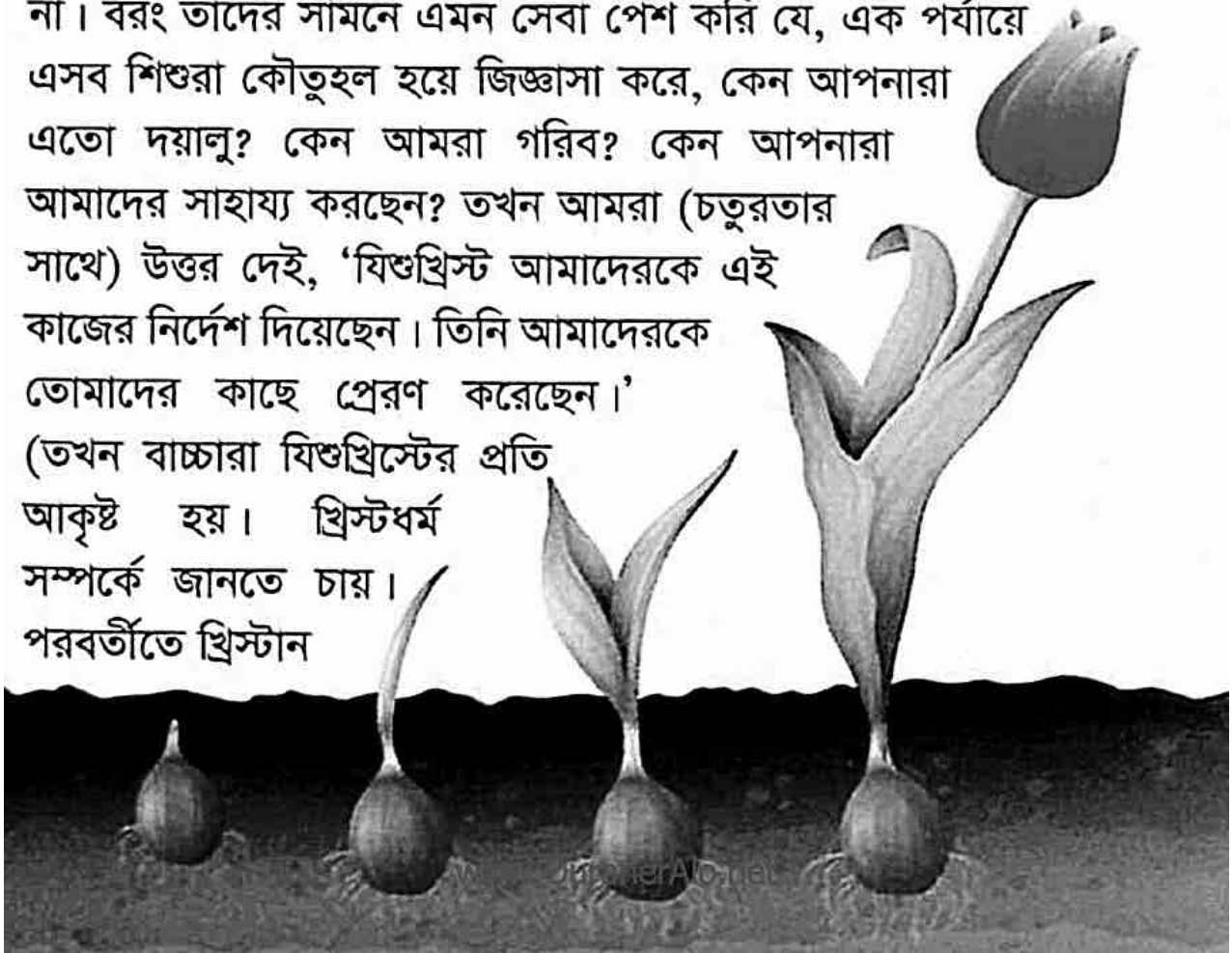
হয়ে যায়)

World Help (বিশ্বসাহায্য) নামক আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা সুনামিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সাহায্যের নামে আসে। খ্রিস্টবাদ প্রচারে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। তারা বড় বিমানে করে চার/পাঁচজন মিশনারি নিয়ে আসত। বিমানগুলো প্রায় ৪০০/৫০০ যাত্রী বহন করতে সক্ষম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা বিমানগুলো খালি আনত। কিন্তু যাওয়ার সময় পাঁচ/ছয়শত অসহায়, এতিম (ছলেবলে ও লোভ দেখিয়ে) নিয়ে যেত।

তাদেরকে কি করত জানেন? তাদেরকে বিক্রি করে দিত। কথিত মানবাধিকার সংস্থা পরবর্তীতে এসব মেয়েদের দেহব্যবসায় ব্যবহার করে। ১৪/১৫ বছরের মেয়েদের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। অনেক শিশুকে কঠিন কাজে ব্যবহার করে। তাদেরকে জিম্মী করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। সুতরাং তাদের হৃদয়ে প্রকৃত দয়া নেই। তারা আমাদের দেখিয়ে যা করে তা শুধুই ধোঁকাবাজি।

আমাদেরকে কুরআনের এই চিরন্তন বাণী স্মরণ রাখতে হবে–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(তারা) কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজের ব্যাপারে দয়ালু। *[সূরা ফাতহ : ৩৯]*

সুতরাং আমাদের এতিমদের দেখ-ভালের দায়িত্ব আমাদের কাঁধেই। আমরা মুসলিমরাই তাদের প্রতি আন্তরিক ও প্রকৃত দয়ালু। আমরা যদি তাদের দায়িত্বগ্রহণে এগিয়ে আসি, কুরআনের নির্দেশনা পালন করি তাহলে পশ্চিমাদের ধোঁকাবাজি থেকে তাদের রক্ষা করতে পারব।

আমার কাছে জনৈকা ভদ্রমহিলার চিঠি আসে। তিনি বন্ধ্যত্বের ফলে নিঃসন্তান। তিনি দু'টি মেয়ে পালক হিসাবে লালন করছেন যাদের একজনের বয়স দুই এবং আরেকজনের বয়স চার। এখন তিনি আরেকটি ছেলে সন্তান পালন করতে আগ্রহী যেন সেই ছেলেটি বড় হয়ে দুই বোনের সহায়ক হয়। তিনি আমার কাছে এব্যাপারে শরয়ী মাসআলা জানতে চেয়েছেন।

আমি বললাম, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আপনার নিকট এমন স্তন্যদানকারিনী কেউ থাকতে হবে যিনি তাকে দুধ পান করাবে। তাহলে সে মাহরাম হয়ে যায়। যদি একই মহিলা (যেমন বোন) কর্তৃক তিনটি শিশুকেই কমপক্ষে পাঁচ ফোঁটা স্তন্যপান করানো যায় তাহলে আরো বেশি ভাল। কেননা, তখন এরা সবাই দুগ্ধ ভাই-বোন হয়ে যাবে।

আরেক জনৈক অবিবাহিত যুবতী বোন অভিযোগ করেন, তিনি এতিম শিশু পালন করতে আগ্রহী। কিন্তু সামাজিক ভয় করছেন। পাছে সমাজ যদি তাকে অপবাদ দিয়ে বসে। (হয়ত তুমি ব্যভিচার করেছ। না হলে তোমার সন্তান কোত্থেকে?)

আমি বললাম, যদি তোমার বাসায় বৃদ্ধা মাতা থাকেন তাহলে এই এতিম প্রতিপালনে কোন সমস্যা নেই। তুমি শিশুটির বোন বলে পরিচিত হবে। কিন্তু যদি তোমার পিতা-মাতা দুনিয়ায় না থাকেন বরং ভাইয়ের সাথে থাকো, তাহলে এই ঝুঁকি নেওয়া সমীচীন হবে না। (কেননা আমাদের সমাজ সন্দেহপ্রবণ। তারা এই যুবতীকে সন্দেহ করবে। তখন সে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। তারচেয়ে ভাল এখন এতিমের জিম্মাদারী না নিয়ে ভবিষ্যতে যখন বিবাহ করবে তখন এই মহান দায়িত্ব পালন করবে। তখন আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।)

প্রশ্ন হতে পারে, এতিমকে যে অর্থ-সম্পদ দেওয়া হয় তা কি যাকাত হিসাবে গণ্য করা যাবে না কি সাধারণ সাদাকা হিসাবে গণ্য করতে হবে?
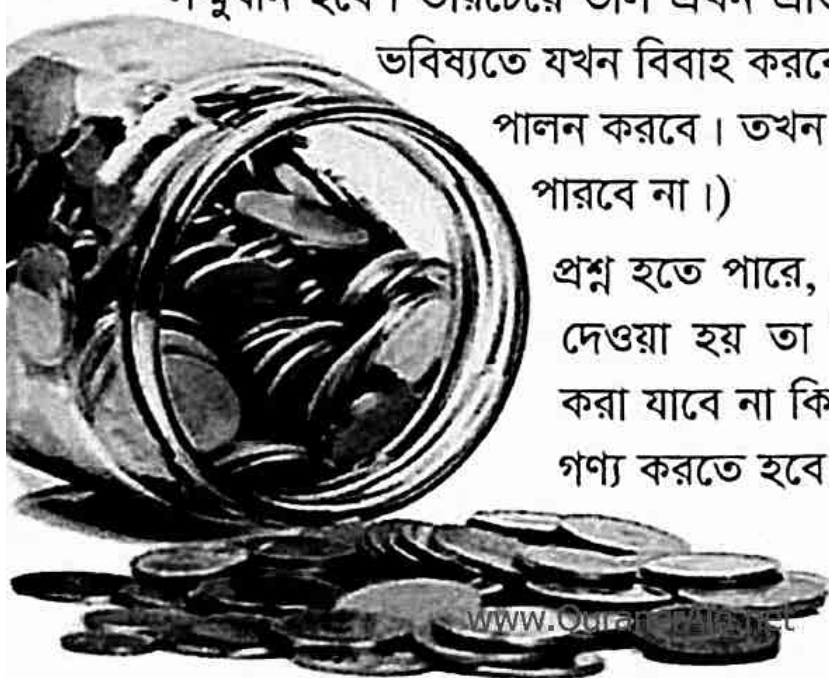
উত্তর : এতিম যদি গরীব নিঃস্ব হয় তাহলে যাকাত হিসাবে গণ্য করা যাবে আর যদি সে দরিদ্র না হয় তাহলে প্রদত্ত অর্থ সাধারণ দান ও হাদিয়া বলে গণ্য হবে। (কেননা, যাকাত গরীবের বেলায় প্রযোজ্য)

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

(১৩)
পাগলকে অবজ্ঞা করো না

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. [آل عمران : ١٠٢]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.[النساء :١]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. [الأحزاب : ٧٠-٧١]

أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِيْ النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর, আমি কোন নির্দিষ্ট দেশ, নির্দিষ্ট কোন জাতিকে সম্বোধন করছি না। অনারব ব্যতিত শুধু আরবদের সম্বোধন করছি না। বরং আমাকে শোনছে, দেখছে এমন সবাইকে সম্বোধন করছি। চাই সে ব্রাজিলে হোক, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় থাকুক। এদের সবাইকেই আমি সম্বোধন করছি যেন তারা জীবনে কোন না কোন অবদান রেখে যেতে পারেন।

আপনারা যদি মুসলিম জীবনে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, মুসলিমরা

অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাফল্যে আনন্দিত হয়। আমরা যখন আমেরিকা-জাপানে তৈরী গাড়িতে আরোহণ করি তখন ব্যথিত হই। এটা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্পৃক্ততার কারণে।

আলোচ্য অনুষ্ঠানে আমি এমন কিছু সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যা সবাই চাইলেই করতে পারেন। আপন ঘরে করতে পারেন। যে মহল্লায় বসবাস করছেন সেখানে করতে পারেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও আশেপাশের মানুষের মাঝে করতে পারেন।

জনৈক ডক্টর থেকে শুনেছি তিনি বলেন, 'যদি তুমি পৃথিবীকে কিছু দিতে না পারো তাহলে তুমি পৃথিবীর জন্য বোঝাতুল্য। পৃথিবীতে যদি তোমার কোন কর্মতৎপরতা, অবদান না থাকে তাহলে তোমার পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই।' আজকের বিশ্বে মুসলিমদের সংখ্যা আপনি অনেক পাবেন। কিন্তু তাদের মধ্যে ক'জন ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে? ক'জ ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন? জনৈক কবি বলেন

فحسبك خمسة يبكى عليهم * وباقى الناس تخفيف ورحمة
اذا ما مات ذوعلم وفضل * فقد ثلمت من الاسلام ثلمة
وموت الحاكم العدل المولى * يحكم الأرض منقصة ونقمة
وموت الفارس الضرغام هدم* فكم شهدت له بالنصر عزمة
وموت فتى كثير الجو * محل فإن بقاءه خصب ونعمة
وموت العابد القوام ليلا * يناجى ربه فى كل ظلمة

তুমি পাঁচ শ্রেণির লোকের মৃত্যুতে কন্দন করতে পার। আর অন্যদের মৃত্যুতে শুধু দোয়া করলেই যথেষ্ট।

১. যখন কোন জ্ঞানী আলেম ইন্তেকাল করেন। তখন ইসলামে একটি গর্ত সৃষ্টি হয়।
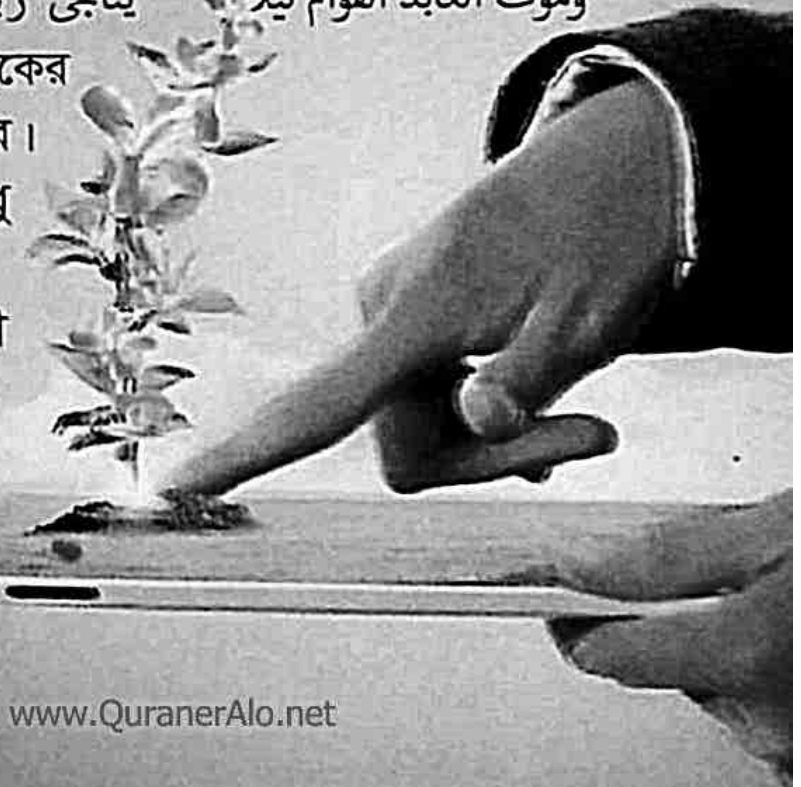
১. ন্যায় পরায়ণ হাকিমের মৃত্যু জাতির জন্য লোকসান ও দুর্ভাগ্য।

২. দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধার মৃত্যু (সাম্রাজ্যের) ধ্বংসতুল্য। তার দৃঢ়সংকল্প ও দুঃসাহস কতই না সাহায্য করেছে।

৩. দানশীল যুবকের মৃত্যু জমিনের অনুর্বরতা স্বরূপ। কেননা, তার স্থায়িত্ব উর্বরতা ও নেয়ামততুল্য।

৪. রাতের অন্ধকারে নির্জনে প্রভুর সাথে একান্ত আলাপকারী আবিদের মৃত্যু। (এই পাঁচ শ্রেণির মৃত্যুতে তুমি বিলাপ করা উচিত। কেননা তাদের মৃত্যুর ফলে জাতি অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে।)

যে সব লোক শুধু খাওয়া দাওয়া করে অলস জীবন কাটায় তাদের সম্পর্কে ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, এরা মশা মাছির ন্যায় আমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যানজট সৃষ্টি করে, বাজারে গিয়ে ভিড় জমায়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং আমাদের সময় নষ্ট করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাদের ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, শারীরিক শক্তিমত্তা, ও জীবিকানির্বাহের স্তরে তারতম্য রেখেছেন। তিনি বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমি তাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি এবং তাদের একের মর্যাদা অপরের উপর উন্নীত করেছি।

[সূরা যুখরুফ : ৩২]

অন্যত্র রিযিকের তারতম্য সম্পর্কে বলেন–

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

আল্লাহ রিযিকের ক্ষেত্রে তোমাদের
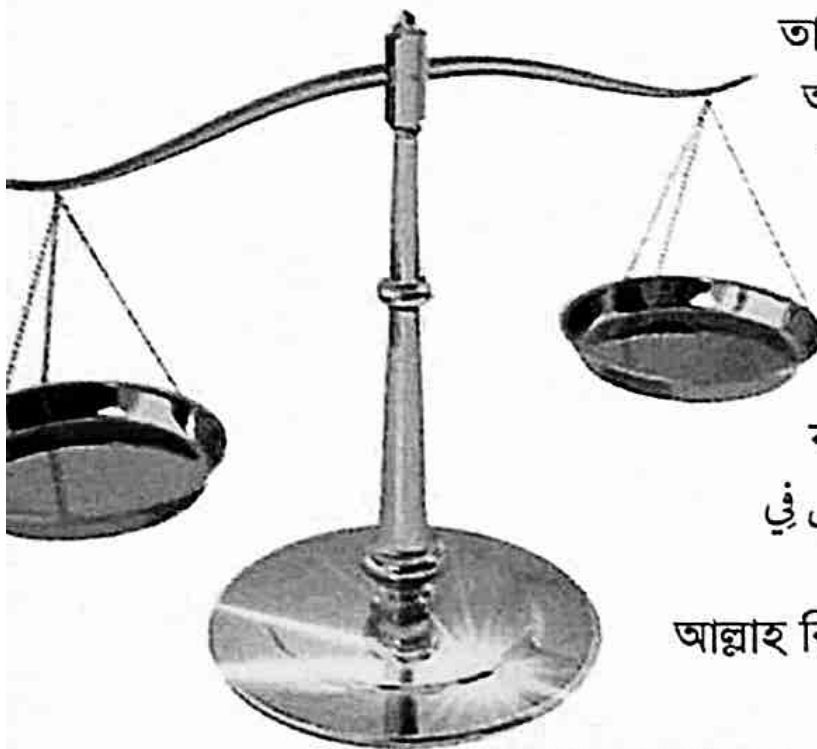
কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। *[সূরা নাহল : ৭১]*

আল্লাহ তায়ালা কাউকে বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তার ধন-সম্পদ কম দিয়েছেন। আবার অনেককে শরীরে শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি দেন নি। কাউকে প্রখর মেধা দিয়েছেন কিন্তু হাঁটার ক্ষমতা দেন নি।

আমাদের সমাজে এমন একটি জাতি আছে, যাদেরকে অনেকেই অবজ্ঞা করে। তাদের অধিকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফিল। অনেক সংস্থা-প্রতিষ্ঠান নারী ও শিশুদের অধিকার নিয়ে কথা বলে। এমনকি পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো পশু অধিকার নিয়েও আন্দোলন করে। অনেক রিপোর্ট, পরিসংখ্যানে তাদের আলোচনা ব্যাপকভাবে উঠে আসে। কিন্তু আমার আজকের আলোচ্য বিষয়ে কারো কোন তৎপরতা নজরে পড়ে না। সমাজের অবহেলিত এই শ্রেণি নিয়ে কেউ কলম ধরে না। অথচ তাদের সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩%।

আজকে যাদের নিয়ে আলোচনা করবো তাদেরকে আমরা রাস্তায় অদ্ভু ভঙ্গিতে হাঁটতে দেখি। তাদের দেখা মিলে হাসপাতালে। কখনো তাদে পরিবারের লোকজন ঘরের কোণে বা বারিন্দায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে।

আজকে আমি মানসিক স্মৃতি প্রতিবন্ধী পাগলদের প্রসঙ্গে কথা বলবো। আপনি যদি বিশ্বব্যাপী মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা জরিপ করেন তাহলে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এই রোগে আক্রান্ত পাবেন।

প্রথমে আমি স্মৃতিবিকৃতি কেন হয়-তা নিয়ে আলোচনা করবো। এক রিপোর্ট বলছে, ৮১% স্মৃতিভ্রম সৃষ্টি হয় পরিবেশগত কারণে। স্ত্রীর সাথে স্বামীর, পিতার সাথে পুত্রের এবং মালিকের সাথে শ্রমিকের অসঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণ এর জন্য দায়ী। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্খিত ঘটনাপ্রবাহ স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে দেয়। ফলে একসময় সে পাগল হিসাবে পরিচিতি পায়। ৬% সৃষ্ট হয় জন্মগত কারণে। যেমন পিতামাতার ক্রোমোজম বা জীনগত সমস্যা পাওয়া যায়।

এছাড়াও গর্ভকালীন মায়ের দেহে আঘাত লাগা, রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়া, মায়ের নেশা গ্রহণ ও ক্ষতিকর ঔষধ সেবনের কারণে গর্ভের শিশুর ক্ষতি হয়। ফলে সে মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।

অনেক সময় আলো-বায়ু দুষণজনিত কারণেও হয়ে থাকে। আবার গর্ভবতী মায়ের মানসিক টেনশনের কারণেও হয়ে থাকে। গর্ভকালীন মায়ের পুষ্টিহীনতা, দূষিত খাদ্যগ্রহণ আরেকটি অন্যতম কারণ। শিশু জন্মকালীন অক্সিজেনের কম হলে শিশু মস্তি[illegible] আঘাত পায়। ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। অনেক সময় বাচ্চা মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শারীরিক আঘাত পায়।

জন্মের পরেও কিছু কারণ [illegible]। যেমন পু[illegible]হীনতা, নোংরা পরিবেশ, বিভিন্ন দুর্ঘটনা, রোগ-ব্যাধি, খাদ্যে বিষক্রিয়া ইত্যাদির কারণেও শিশু পাগল হয়ে যায়। অনেক সময় মাথায় আঘাত ও মস্তিষ্কজনিত রোগের কারণেও

উন্মাদতা সৃষ্টি হতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে শতকরা তিনজন মানসিক রোগী যাদেরকে আমরা পাগল বলতে পারি। আমাদেরকে তাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কী? কেমন হবে তাদের সাথে আমাদের আচরণ? এসব নিয়ে কথা বলতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা কী আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে, তুমি তখন কী করেছিলে যখন সে নির্যাতিত হচ্ছিল? ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করছিল? (অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন) সুতরাং যখন আমার প্রতিবেশী তার পাগল ছেলের সঠিক দেখ-ভাল করে না, কখনো তাকে দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেঁধে রাখে, খাবার পানীয় দেয় না-তখন আমার কী করণীয়? এব্যাপারে আলোচনা করবো।

তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, কিছু আরব দেশে প্রায় মিলিয়ন লোক মানসিক রোগে আক্রান্ত। তবে স্মৃতিবিকৃতি মাত্রার তারতম্য আছে। কারো বেশি কারে কম। সামনে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আমাদের কাঁধে তাদের অধিকার অর্পিত আছে। তাদের সাথে সুন্দ আচরণ অপরিহার্য। আমি কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে একটি মানসিক রোগীর হাসপাতাল পরিদর্শন করেছিলাম। একটি কক্ষের পাশদিয়ে অতিক্রমকালে দেখলাম তার দেয়াল ইটের রঙে রাঙায়িত। ডাক্তারকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এখানে একজন ব্যক্তি মৃগীরোগী আছে। সে হাত-পা দিয়ে দেয়ালে প্রচুর আঘাত করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাই আমরা তাকে এই কক্ষে আটকিয়ে রেখেছি। এর চারপাশের দেয়ালে স্পঞ্জ লাগিয়ে দিয়েছি। (ফলে শারীরিক জখম হবে না)

অনেক পাগলকে দেখলাম কাপড় পড়তে চায় না। কেউ তাকে কাপড় পড়াতে চাইলে সে খুলে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য ব্যাপার!

আজকে আমি এ ধরণের মানসিক রোগীর সাথে আচার-ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজ মনে করে এদের অনুভূতি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই আমরা তাদের সাথে ভাল-খারাপ যাই ব্যবহার করি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা, তার তো অনুভব শক্তি নেই। এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অনেকেই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এমনকি তার নিকটাত্মীয় ও সন্তানরা নির্যাতন-নিপীড়নের পাশাপাশি তার ধন-সম্পদ খেয়ে ফেলে।

আমি ডাক্তারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, 'অনেক মানসিক রোগীর অনুভূতি শক্তি আছে। তারা অনেক কিছুই বুঝতে পারে।'

সুতরাং সেই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। মানুষের কর্ম দক্ষতা বিভিন্ন প্রকারের। যেমন খাবার ও পানীয় গ্রহণে পারদর্শিতা। সামাজিক কাজ-কর্মের দক্ষতা। এসব রোগীদের একটি দক্ষতা নষ্ট হয়ে গেলেও অন্যান্য দক্ষতা ঠিকই থাকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তার পরিবার সেই দক্ষতাকেও নষ্ট করে ফেলে এবং তাকে পুরোপুরি পাগল উপাধি দিয়ে দুর্ব্যবহার করতে থাকে। (অথচ সে হয়তো কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা আমাদের মতোই ছিল। কিন্তু সবার থেকে অবজ্ঞা অবহেলার কারণে বাকী ক্ষমতাও বিকৃত হয়ে গেছে।)

তার কিছু যোগ্যতার কমতি থাকলেও তা কিন্তু উন্নতি করা সম্ভব। আমি সেই হাসপাতালে প্রায় ৫০০ জন রোগী দেখেছি। (ডাক্তারদের ভাষ্যমতে) তাদের মধ্যে ৩০০ রোগী আপন পরিবারের সাথে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সক্ষম। কিন্তু পরিবারের লোকজন উদাসীন ও কোন ভ্রূক্ষেপ করছে না।

হাসপাতাল প্রধান জানিয়েছেন, দেখুন শায়খ, আমি জোড় দিয়ে পরিবারকে বলতে ইচ্ছুক আপনারা আসুন এবং তাকে নিয়ে যান। কেননা, এই পরিবেশ তার মস্তিষ্ককে আরো নষ্ট করে দিচ্ছে। হাসপাতালে অবস্থান মানসিকতার সমস্যা আরো বৃদ্ধি করছে।'

আরেকজন ডাক্তার জানান, পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্কে অনুপস্থিতি তাকে আরো একপেশে করে দিয়েছে। তাই পরিবারকে এ ব্যাপারে সচেতন ও উৎসাহিত হতে আহ্বান করছি।

অনেক পরিবার সামান্য যোগাযোগ রাখে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই হাদীস স্মরণ রাখতে হবে যেখানে তিনি বলেছেন, 'জেনে রাখো, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব ও জিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' একজন হাসপাতালে এগার বছর ধরে আছে। কিন্তু কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করেনি। অথচ তার ও পরিবারের মাঝে দূরত্ব মাত্র ৮০ কিলোমিটার যা মাত্র আধা ৩০ মিনিটে অতিক্রম করা যায়। আরেক জনকে পেলাম যাকে ১৭ বছর ধরে তার পরিবার দেখতে আসে না।

একজন মানসিক রোগীর সাথে আমার কথা হয়। তার কথা শান্ত শিষ্ট ছিল। সে কেঁদে কেঁদে বলল, শায়খ, আমি পাগল নই। আমাকে এখান থেকে বের করে নিন।'

আরেকজনকে দেখলাম, সে কাসিদায়ে আসমা থেকে বিশটি শ্লোক মুখস্থ বলেছে। আশ্চর্য যে, প্রত্যেকটি শ্লোকই প্রেমের ছিল।

আমি ডাক্তারকে বললাম, এরা তো পাগল নয়।

ডাক্তার উত্তর দিলেন, 'তাদের সামান্য মানসিক রোগ আছে। আমরা তাদেরকে দৈনিক ঔষধ সেবন করতে দেই যেন মানসিক ভারসাম্য ঠিক থাকে। আবার অনেকের স্মৃতিশক্তি নেই বললেই চলে। কিন্তু অনেকেই পরিবারের সাথে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সক্ষম।'

তাদের প্রতি ইসলাম নির্দেশিত হুকুক সম্পর্কে আলোচনা করলে অনেক লম্বা সময় লাগবে। ইসলাম কাফের মুসলিম সবার অধিকার সংরক্ষণ করেছে। এমন কি বাকহীন চতুষ্পদ প্রাণীর অধিকারও কমায় নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুষ্পদ প্রাণীর পিঠকে চেয়ার বানাতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং কারো জন্য সফরের প্রয়োজন ছাড়া তার পিঠে উঠে বসা বৈধ নয়।

তদ্রূপ তিনি পশুর চেহারায় দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। জাহেলি যুগে লোহা গরম করে প্রাণীর মুখে ছ্যাঁক দেওয়া হতো যেন সবাই বুঝতে পারে এটা অমুকের পশু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর প্রতি এই বর্বরতা রহিত করেন।

সুতরাং ইসলাম যদি নগণ্য প্রাণীসহ সবার অধিকার নিশ্চিত করে থাকে তাহলে এইসব মস্তিষ্করোগীদের তো আরো আগে অধিকার সংরক্ষণ করেছে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে তারতম্য হয়। আমি স্মৃতিশক্তি এবং বিভিন্ন জাতির মাঝে তারতম্যের কারণ সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের একটি গবেষণা পড়েছি। সেখানে দেখেছি, জন্মগতভাবে স্মৃতিশক্তির আধিক্যতা শতকরা তিন জন পায়। কিন্তু জন্মপরবর্তী যে
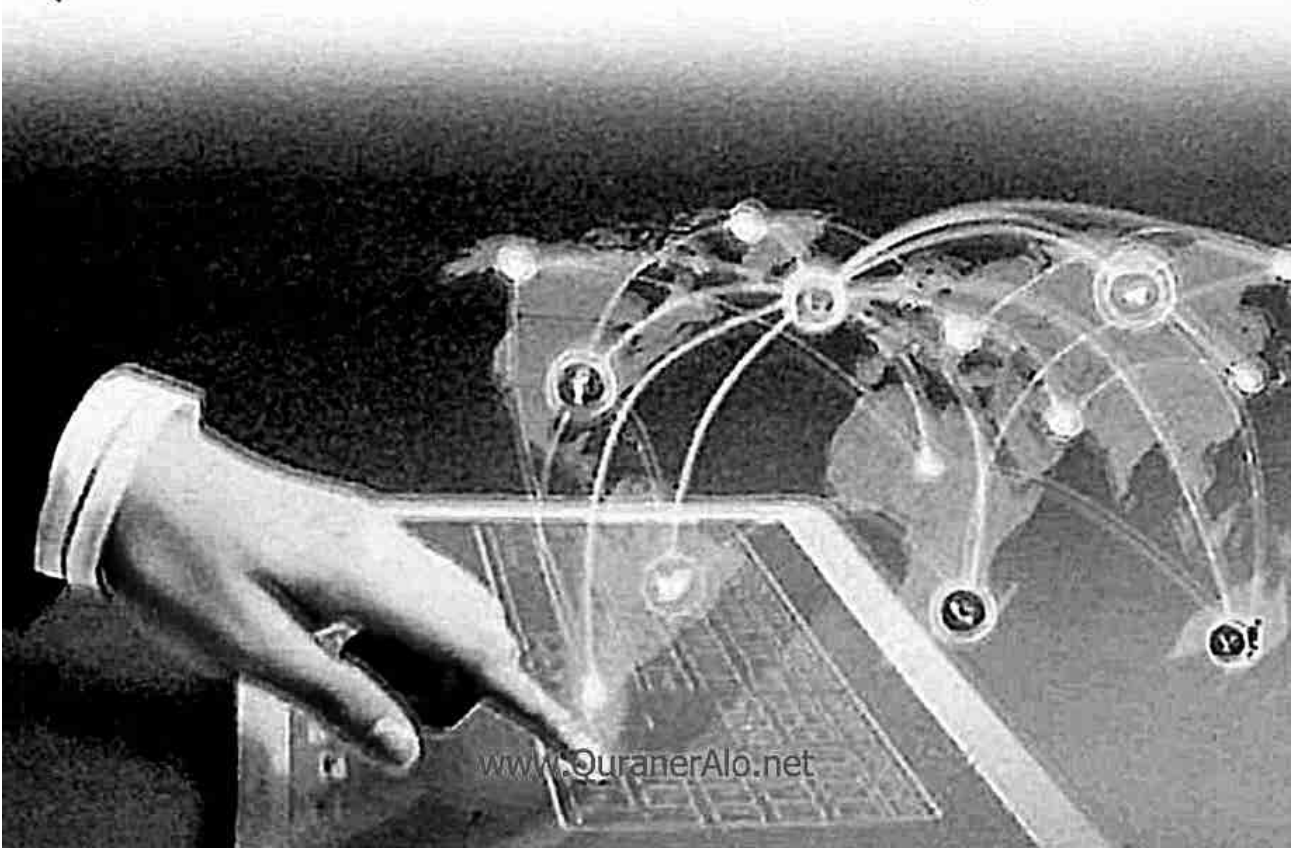
পরিবেশে সে গড়ে উঠে সে পরিবেশের কারণে ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি কম বেশি হয়। এমনকি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে বাচ্চা মেধাহীনতার শিকার হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সুস্থ-সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশের ফলে শিশুর মেধাশক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, কোন শিশু যদি জন্মগতভাবে মেধাহীন হয় বা তার বোধশক্তি কম থাকে তখন পরিবার তাকে অবজ্ঞা করে। কিন্তু তার মেধা বিকাশের সৃজনশীল পদক্ষেপ নেয় না। ফলে সে সারাজীবন নির্বোধই থেকে যায়। পড়াশুনায় সবার থেকে পিছিয়ে পড়ে।

আমাদের সমাজ ও পরিবেশ ইচ্ছা করলে স্মৃতিপ্রতিবন্দীদের উন্নতি করতে পারে। মানসিক বিকাশ সাধন করা সম্ভব। কিন্তু তাকে হাসপাতালে ফেলে আসলে বিষয়টি সেই অপরাধীর মতো হলো যে কিনা (সামান্য) কলম চুড়ি করেছে। আর এমনি শাস্তিপ্রদান নিমিত্ত জেলে বন্ধী করে রাখা হয়েছে। ফলে সে জেলের ভিতর খুনী, গাড়ি চোর, ব্যাংক ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের সাথে জীবন কাটাতে লাগল। (এক্ষেত্রে সে তো বড় অপরাধীর সাহচর্য পেে আরো বড় বড় অন্যায় অপরাধ করতে উৎসাহিত হবে। তার প্রকৃ সংশোধন হবে না।)

সুতরাং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমরা তাদেরকে কাছে টেনে নিবো। তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। সবচেয়ে বড় কথা, সেসব পরিবারে এ ধরণের রোগী আছে, সেই পরিবারের উচিত এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সওয়াব প্রত্যাশা করা।

আমরা জানি, এই রোগীকে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করছেন। হতে পারে এই বিপদ তার জান্নাত প্রাপ্তির কারণ হবে। এক মহিলা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি মৃগীরোগী। তাই অনেক সময় বেহুঁশ হয়ে যাই এবং আমার কাপড় খুলে যায়। আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন। (আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থ করে দেন)

তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে দুআ করতে পারি, ফলে সুস্থ হয়ে যাবে। আর যদি চাও তাহলে ধৈর্যধারণ করতে পারো কিন্তু বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

মহিলা উভয় প্রস্তাবে অনেক বিবেচনা করে ধৈর্যকে প্রাধান্য দিলেন। বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি বরং ধৈর্য ধরবো। কিন্তু আপনি দুআ করুন যেন আমার কাপড় খুলে না হয়ে যায়।'

চিন্তা করুন, মহিলাটি তার হিজাবের ব্যাপাকে কত সতর্ক ও মনোযোগী। সে বলতে চাচ্ছে, আমি রোগী থাকি এতে কোন আপত্তি নেই। আমি বেহুঁশ হয়ে যাই তাতেও কোন আফসোস নেই। কিন্তু যেন আমার কাপড় খুলে না যায়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন। পরবর্তীতে সে বেহুঁশ হলেও কাপড় দেহ থেকে সরে যেত না।

মূলকথা, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে এ ধরণের বিপদে ফেলেন তখন সে সওয়াব পায়। বরং অনেক সময় এ কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমনিভাবে আল্লাহপ্রদত্ত মেধাকে খারাপ কাজে লিপ্ত করার কারণে অনেকে জাহান্নামে জ্বলবে। অনেকে তার স্মৃতিশক্তিকে অন্যায় কাজে ব্যয় করে।

এমন জিনিস আবিষ্কার করে যা গোনাহর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেয়। স্মৃতিশক্তি দিয়ে চুরি ডাকাতি করে। এই স্মৃতিশক্তি তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

একবার আমি জেলে লেকচার দেওয়ার জন্য গিয়েছিলাম। একজনকে পেলাম সে অনেক অপরাধে জেলে এসেছে। সে চুরি-ডাকাতি সবই করত। সাতটি ভাষায় পারদর্শী। খুবই মেধাবী। কিন্তু এই মেধাকে সৎকাজ ও আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে নি। সে ২৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

মোটকথা, আল্লাহ অনেককে স্মৃতিহ্রাস করে পরীক্ষায় নিপতিত করেন। কেন করেছেন? তা তিনিই ভাল জানেন। হতে পারে তাদেরকে যদি স্মৃতিশক্তি দিতেন তাহলে তারা তা খারাপ কাজে ব্যয় করত। যেভাবে অনেকে তাদের স্মৃতিশক্তি খারাপ কাজে ব্যয় করছে। (তাই তাদেরকে এভাবে হেফাজত করেছেন।)

তবে লক্ষণীয়, মানসিক রোগী এই ধারণা করতে পারবে না যে, আল্লাহ তা প্রতি অবিচার করেছেন। কেননা, তিনি কারো উপর জুলুম করেন না. ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার প্রভু কারো প্রতি জুলুম করেন না। *[সূরা কাহাফ : ৪৯]*

অন্য হাদীসে এসেছে–

(إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَصَابَ مِنْهُ) ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ)

যখন আল্লাহ কাউকে ভালোবাসেন তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। তাই অনেককে সন্তানের মৃত্যু দিয়ে পরীক্ষা করেন। অনেকের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও দুর্ঘটনার মাধ্যমে তাকে পরীক্ষা করেন।

আমরা কিভাবে ঝুঝবো শিশুটি মানসিক রোগী?

শিশুর কিছু কিছু বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্য করে মানসিক রোগ চিহ্নিত করা যায়। জীবনে শুরুতেই জানতে পারি সে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কিনা। তখন দ্রুত সঠিক চিকিৎসা করলে শতভাগ ফল পাওয়া সম্ভব। যেমন—

এক. তার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরিবার যদি তার ভিতরে স্মৃতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন তাহলে সাথে সাথে তাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাবেন।

দুই. কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই হতে পারে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

তোমরা এতিমদের পর্যবেক্ষণ (পরীক্ষা) করতে থাক, যাবৎ না তারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়। অতঃপর তাদের মধ্যে যদি বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য কর, তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ন্যস্ত করে দাও। *[সূরা নিসা : ৬]*

আলোচ্য আয়াতে 'ইবতিলা' (পরখ) করার অর্থ হচ্ছে এতিমশিশুর বুদ্ধিমত্তা আছে কিনা যাচাই করে দেখা। উদাহরণত কেউ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান রেখে মারা গেল। আর আমি সন্তানের ওলী তথা অভিভাবক। ওয়ারিসসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের দেখাশোনা করি। হঠাৎ একদিন সে আমার কাছে বলল, 'আমাকে পিতার সম্পদ থেকে এক লক্ষ টাকা দিন।' তার বয়স আনুমানিক পনের বা ষোল। তখন এই মুহূর্তে আমাকে পরখ করতে হবে। তাকে যাচাই করে দেখতে হবে সে বুদ্ধিমত্তার সাথে এই সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবে কিনা? নাকি সে মানসিক
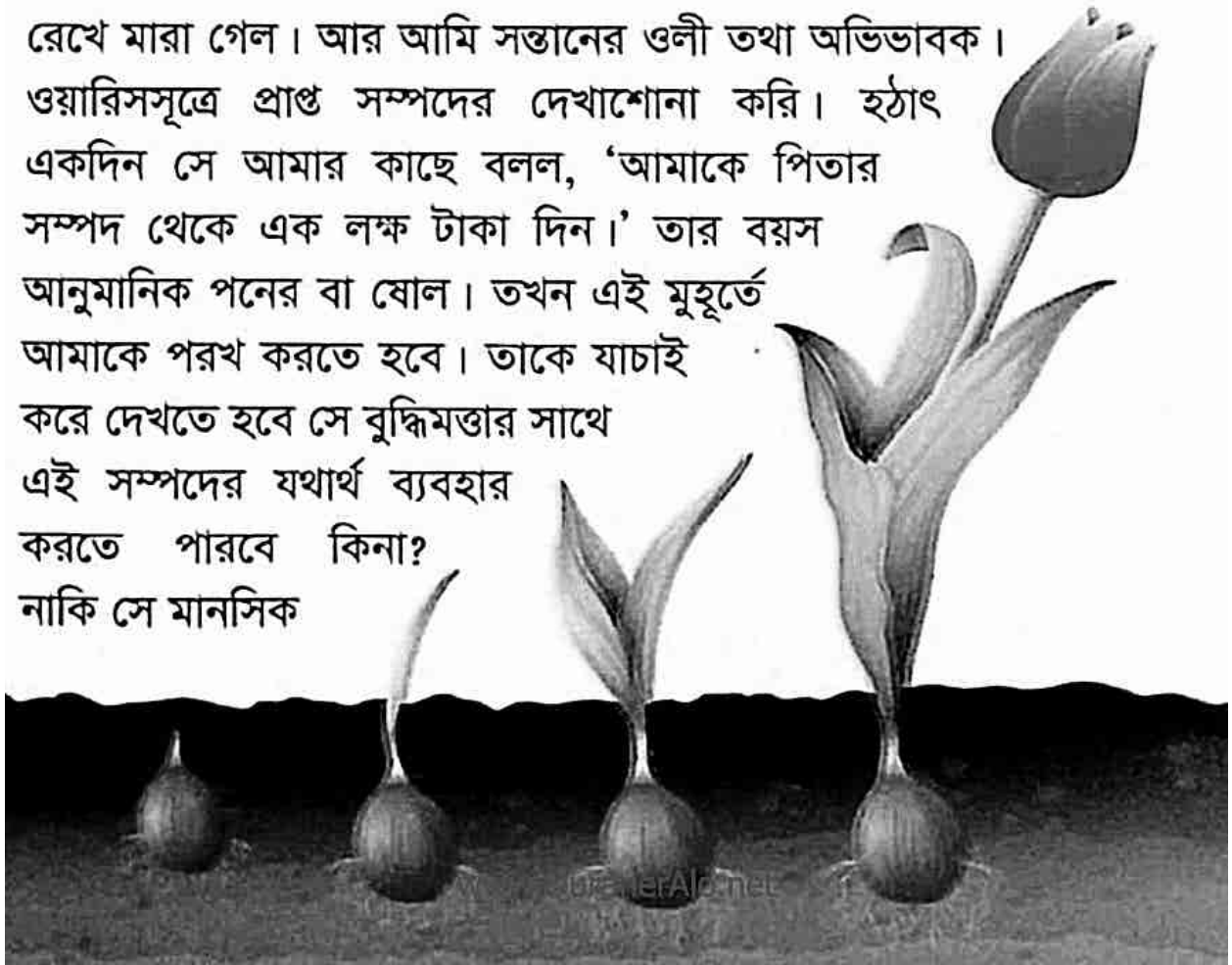
প্রতিবন্ধিতার শিকার। (এমন পরিস্থিতিতে তার বুদ্ধিমত্তা ও স্মৃতিশক্তি যাচাই করা যাবে)

সেই মানসিক হাসপাতালে অনেক রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমার নানা অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে। সমাজের নিগৃহীত এই শ্রেণির ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তুমি তোমার অত্যাচারী ও নিগৃহীত উভয় ভাইকে সাহায্য কর।' এখানে জালিমকে সাহায্যের অর্থ হচ্ছে তাকে জুলম থেকে বিরত রাখা। আর মাজলুমকে সাহায্য করার অর্থ হচ্ছে, সমাজের এইসব নিগৃহীত ও নিপীড়িত ভাইদের সাহায্য করা।

অনেক মানসিক রোগীর মা আরেকজনের সাথে বিবাহ করে চলে যায়। পিতা আরেক মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। তারা সন্তানকে এমনভাবে ভুলে গেছে যেন সে মরে গেছে। এসব অসহায় ভাইদের করুণ দৃশ্য দেখে কোন বিবেকবান মানুষ অশ্রু সংবরণ করতে পারবেন না। অথচ তাদেরও আছে অন্য দশজনের মতো বাঁচার অধিকার। তাদের অনেকে বিবাহের উপযুক্ত। সে বিবাহ করে ঘরসংসার করতে সক্ষম। মানুষের সাথে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে সমস্যা নেই। কিন্তু দয়া করে তাকে হাসপাতালের এই বদ্ধ পরিবেশে রাখবেন না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাদেরকে আমি হাসপাতালে দেখেছি তারা পরিবারে অবজ্ঞা-অবহেলার পাত্র হয়েছে। তাদের উপর অন্যরা জুলুম করেছে। আল্লাহ তায়ালা এ জুলুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার কাছে তোমাদের আগে দুর্বলদের নিয়ে আসো। কেননা, তোমরা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হও।'

অর্থাৎ তাঁর কাছে কোন প্রতিনিধি দল আসলে তিনি শুরুতে দুর্বলদের সাথে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। কেননা, শক্তিশালীরা সবখানে যেতে পারে। তাদেকে সবাই সম্মান করে। (কিন্তু দুর্বলদের অনেকেই অবজ্ঞা করে।) তাই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের দুর্বল ভাইদের বরকতেই তোমরা যুদ্ধে সাহায্য এবং আকাশ থেকে রিযিক পেয়ে থাকো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরভাইকে তুচ্ছ জ্ঞেয় করার ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, 'কোন ব্যক্তি গোনাহগার হওয়ার জন্য অপর মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা করাই যথেষ্ট।'

সুতরাং মস্তিষ্করোগী পাগলদেরও এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আমাদের থেকে সুন্দর ব্যবহারের দাবি রাখে।

পূর্বকালে পাগলের সাথে লোকজনের আচার-ব্যবহার

ইমাম ইবনে জাওযি 'সিফাতুত সাফওয়া' নামক কিতাবে 'নির্বাচিত জ্ঞানী পাগলবৃন্দ' নামক অধ্যায়ে তদানীন্তনকালের অনেক প্রসিদ্ধ পাগলদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সেসব কাহিনীর আলোকে বুঝা যায় তদানীন্তনকালে তাদের মর্যাদা ও সম্মান ছিল। তারা সমাজ থেকে মার্জিত কোমল আচরণ লাভ করেছে। সমাজ তাদের অনেক চিন্তা-চেতনার সাথে একাত্মতা পোষণ করত। এমনকি খলীফাগণ তাদের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। বর্ণিত আছে, একবার বাহলুল নামক পাগলের পাশ দিয়ে খলীফা হারুনুর রশীদ অতিক্রম করেন। তখন বাহলুল খলীফার শানে কিছু কবিতা আবৃতি করে। এতে খলীফা খুশী হয়ে তাকে পুরষ্কার দিতে চাইলে সে প্রত্যাখ্যান করে।
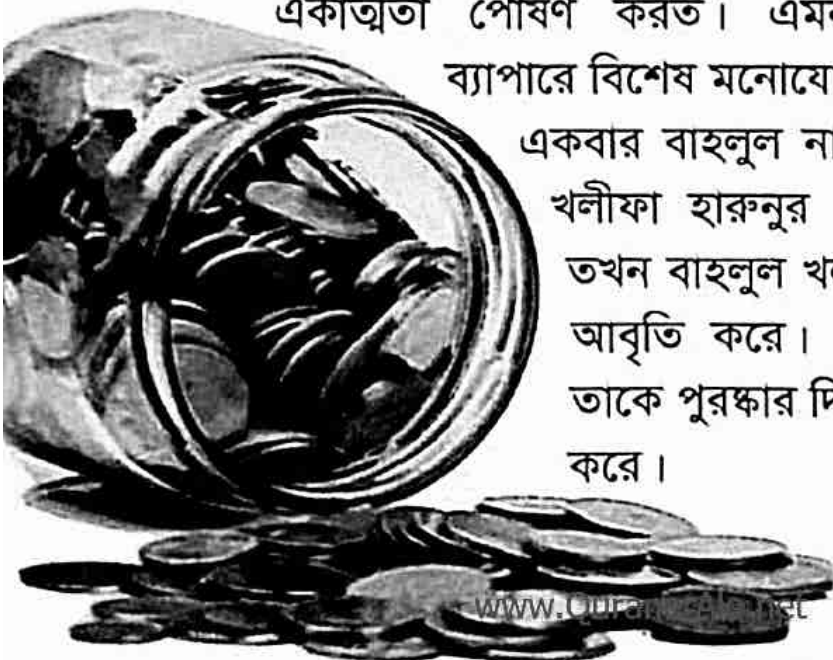
এই হচ্ছে ইসলামের মহত্ত্ব যা পাগলদের সাথেও সৌজন্যমূলক রীতিনীতির শিক্ষা দেয়।

আরেকবার বাহলুলের পাশ দিয়ে খলীফা হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন খলীফা বললেন, হে বাহলুল, আমাকে নসীহত করো।

বাহলুল বলল, হে খলীফা! আপনার কতজন পিতৃপুরুষ রাজ্য শাসন করেছে?

খলীফা : অনেক।

বাহলুল : তাদের প্রাসাদ কোথায়?

খলীফা : ঐ তাদের প্রসাদ।

বাহলুল : তাদের কবর কোথায়?

খলীফা : এই তো তাদের কবর। (তখন খলীফা কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন)

বাহলুল : হে খলীফা! ঐ হচ্ছে তাদের প্রাসাদ। আর এই তাদের কবর। এসব দেখেও কী আপনি উপদেশ গ্রহণ করবেন না? আপনি আজকে প্রাসাদের হেরেমে আয়েশী জীবন কাটাচ্ছেন। অথচ আগামীকাল কবরে যাবেন। তাসত্ত্বেও কেন কবরের জীবন সুখময় হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন না?

আমরা পাগলদের দান-খয়রাত করতে পারি। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. পাগলদের উত্তম আহার্য দান করতেন। একবার তার কাছে একজন পাগল আসল। তিনি উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিবেশন করালেন।

লোকেরা প্রশ্ন তুলল, হে ইবনে ওমর, সে তো পাগল। সে ভালো খাবারের মর্ম বুঝবে না। সুতরাং কেন তাকে এত দামী খাবার দিচ্ছেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানি সে বুঝবে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো জানবেন যে, আমি সর্বোৎকৃষ্ট খাবার দিয়ে তাকে আহার্য দান করেছি। (সুবহানাল্লাহ!) এই ছিল মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাথে পূর্বসূরীদের আচার-ব্যবহার।

মানসিক রোগের শ্রেণিবিন্যাস

স্মর্তব্য যে, মানসিক রোগীর স্মৃতিশক্তির তারতম্যের বিভিন্ন স্তর আছে। কারো স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। কারো বা স্বল্প স্মৃতিভ্রম হয়। কিছু মানসিক রোগী এমন যাদের শতকরা ৫৫ থেকে ৬৯ শতাংশ স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ঠিক আছে। এরা একেবারেই স্বল্পমাত্রার ও প্রাথমিক পর্যায়ের রোগী। এদের পরের স্তরের রোগীর শতকরা ৩৫% থেকে ৫৪% পর্যন্ত স্মৃতিশক্তি ঠিক থাকে। এরা মধ্যম প্রকারের রোগী।

এই মধ্যমস্তরের পরের স্তরে মাত্রা সামান্য একটু বেশী। এদের ২০% থেকে ৩৪% পর্যন্ত স্মৃতিশক্তি বহাল থাকে। কিন্তু সর্বশেষ শ্রেণি মারাত্মক স্মৃতিশক্তিহীন। তাদের স্মৃতিশক্তি শতকরা ১৯%-এরও নিচে। এরাই চূড়ান্ত পর্যায়ের পাগল বলে বিবেচিত।

পাগলের প্রতি আমাদের করণীয়

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী এক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। আছে বর্জনীয় কর্ম। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হলো।

এক. পাগলদের সাথে আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট সওয়াবের প্রত্যাশা করতে হবে।
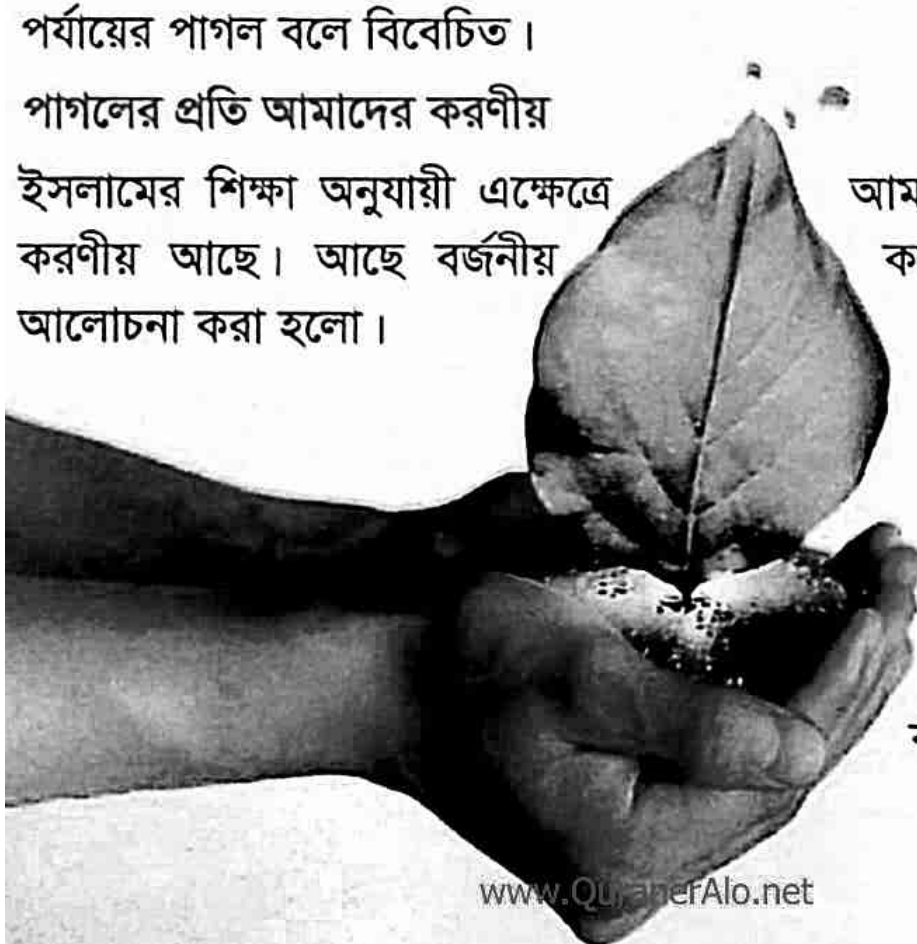
যেসব পিতা-মাতা এই বিপদে পড়েছেন তাদের উচিত রাগান্বিত না হয়ে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তোমার যে ফায়সালা করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। তাহলেই মুমিন হতে পারবে।'

উপরের হাদীসে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকাকে ঈমানের আলামত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

কোন মুমিনের দেহে সামান্য কাঁটা বিধলেও বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তার গোনাহ মাফ করে দেন। সুতরাং কারো সংসারে যদি এমন মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু থাকে যাকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে পরিচর্যা ও দেখাশোনা করতে হয়, যার কারণে বাসা থেকে বের হওয়া যায় না, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে এই কষ্টের বিনিময়ে মহা পুরষ্কারে ভূষিত করবেন।

দুই. পাগলের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করতে হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নম্রতা ও কোমলতা প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে নম্রতার অনুপস্থিতি সেই জিনিসকে কলুষিত করে।' সুতরাং তার প্রতি কর্কশভাষী হওয়া যাবে না। তাকে অন্যদের মতো প্রশ্নবানে জর্জরিত করা যাবে না। বাক-বিতণ্ডা এড়িয়ে যেতে হবে।

তিন. তাদের সুস্থতার দুআ করা। আল্লাহ চাহে তো তাদের জন্য আমাদের দুআ কাজে আসবে।

চার. মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে শারীরিক চর্চা যেমন খেলাধুলার সুযোগ দিতে হবে। খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ তার স্মৃতিশক্তির উন্নয়নে সহায়তা করবে।
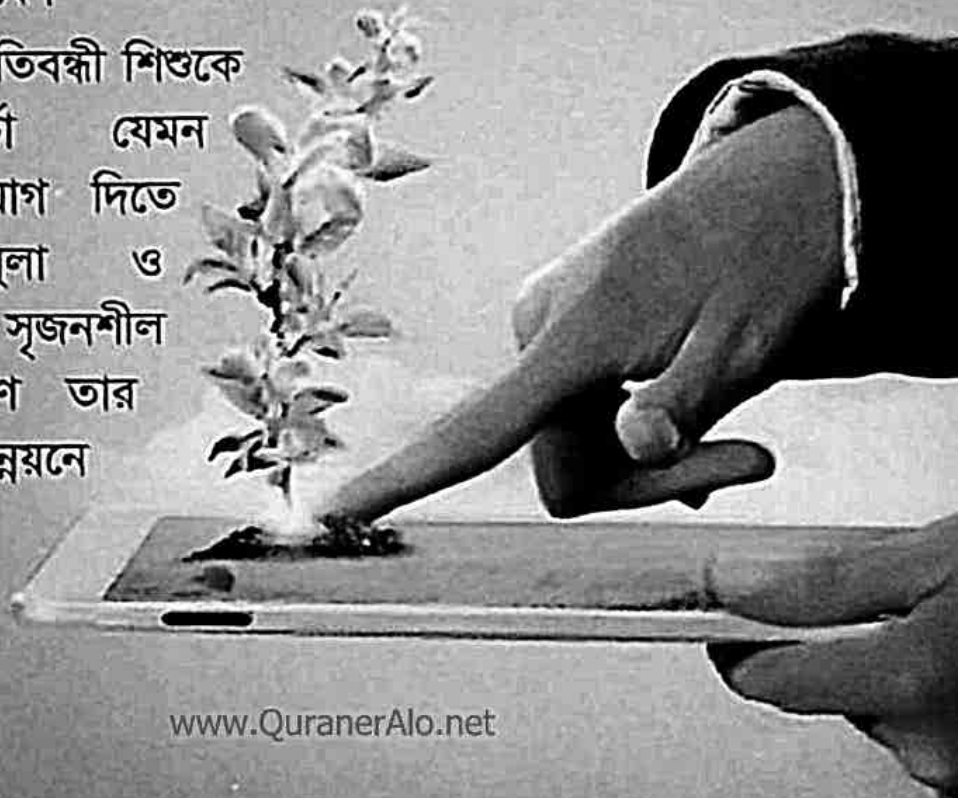
মায়ের নৈতিক দায়িত্ব তার সার্বিক খোঁজখবর নেওয়া। উলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়েছেন যে, কোন মাতা যদি তার শিশুসন্তানের দেখাশুনায় অবহেলা করেন। সে কোথায় গেল, কি করে-এসব খোঁজ খবর না রাখেন। ফলে ঘটনাক্রমে বাচ্চাটি বিদ্যুতের উন্মুক্ত তারে বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তাহলে এই মৃত্যুবরণ মা কর্তৃক 'কতলে খতা' (অনিচ্ছাকৃত হত্যা) বলে গণ্য হবে। শাস্তি হিসাবে মাকে দুই মাস লাগাতার রোযা রাখতে হবে। (কেননা, অবুঝ শিশুর দেখ-ভালের দায়িত্ব মায়ের কাঁধে ছিল। তিনি তা সঠিক ভাবে আদায় করেন নি।)

চিন্তা করুন, ফুকাহায়ে কেরাম আপন সন্তানের ক্ষেত্রেও দিয়াতের আবশ্যকতার বিধান রেখেছেন। কেননা, মানুষের আত্মা-রক্ত সম্মানিত। কাজেই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তদ্রূপ এই স্মৃতিবিকৃত শিশুও সেই বিদ্যুৎতাড়িত হয়ে মৃত অবুঝ শিশুর হুকুমে। সুতরাং তার সার্বিক দেখাশুনা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে খোঁজখবর রাখতে হবে। হাদীসে এসেছে– 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, জিম্মাদার। সেই দায়িত্বসম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।'

পাঁচ : তাদেরকে উৎসাহস্বরূপ কিছু পুরষ্কার-ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। ফলে তাদের মানসিক অগ্রগতি হবে। জার্মানিতে মানসিক রোগীদের ছোট খাট কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, যেন তারা সমস্যার কথা ভুলে যায়।
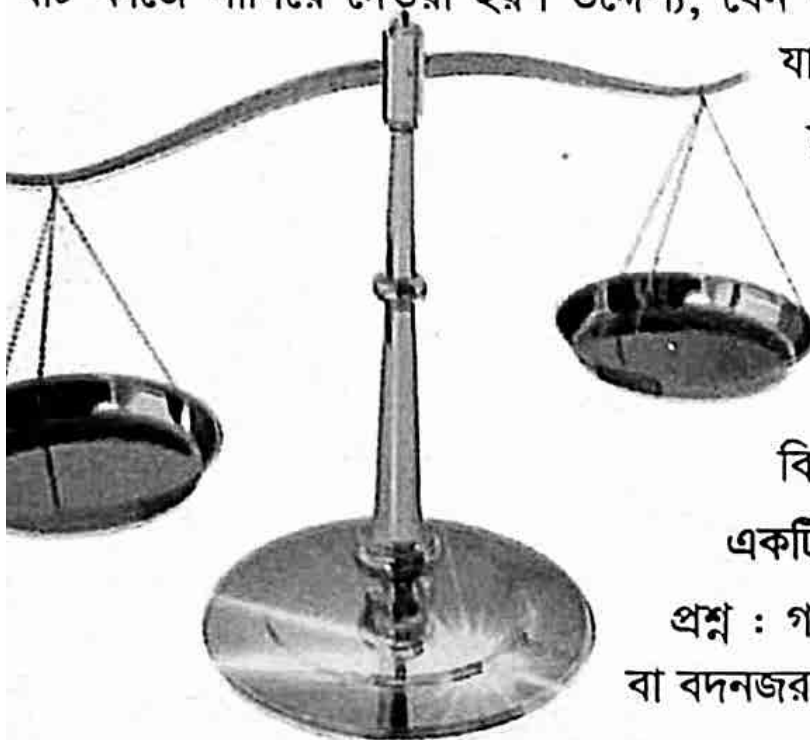
ছয় : যে পরিবেশে তারা বসবাস করে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। তারাও খোলামেলা সুন্দর পরিবেশ ও সুস্থ বিনোদনের অধিকার রাখে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : গর্ভবর্তী মায়ের জাদুগ্রস্ততা বা বদনজর লাগার কারণে কি

সন্তানের মানসিক প্রতিবন্ধিতা হতে পারে?

উত্তর : জাদু ও বদনজরের বিষয়টি নিশ্চিত নয়। আক্রান্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে জাদুর শিকার কিনা তা নির্ণয়ের সঠিক মানদণ্ড নেই। তা শুধুই অনুমাননির্ভর। হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। পক্ষান্তরের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নীতিমালার আলোকে হয়ে থাকে।

উদাহরণত কোন গর্ভবতী মা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন ফলে তার রক্ত দূষিত হয়ে আছে। অথবা ধরুন, এই সিরিঞ্জে (সবার অজান্তেই) কোন ভাইরাস মিশে আছে। পরবর্তীতে এই অন্যের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ মায়ের দেহে ব্যবহার করা হলো। ফলে মায়ের রক্তে ভাইরাস মিশে যায়। পরবর্তীতে তা গর্ভের শিশুকেও আক্রান্ত করবে। কেননা, শিশু মায়ের দেহ থেকেই খাদ্য গ্রহণ করে। কাজেই এমন মা পরবর্তীতে গর্ভবতী হলে নিঃসন্দেহে তার সন্তান প্রতিবন্ধী হয়েই পৃথিবীতে আসবে। এই বিষয়টি চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোকে সর্বজনবিদিত, পরীক্ষিত ও প্রমাণিত। পক্ষান্তরে জাদুর ব্যাপা এমন কোন স্বীকৃত প্রমাণ নেই। আমরা জোর দিয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, সে জাদুগ্রস্ত।

তবে আমি জাদুর কার্যকারিতা অস্বীকার করছি না। বরং স্বীকার করি, কখনো হয়তো কারো দেহে জাদুর আছর পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল।' *[সূরা নিসা : ৭৬)]*

(জিকির আজকারের মাধ্যমে জাদুটোনা নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে জাদুটোনা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন বর্জনীয়। আমাদের সমাজের অনেকে সব কিছুকেই জাদুর দিকে সম্পৃক্ত করেন- যা ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়।)

বান্দার দায়িত্ব সাধ্যমত চেষ্টা করে যাওয়া

জনৈক ব্যক্তি আমাকে জানান, আমার একজন প্রতিবন্ধী শিশু আছে। সে ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত। সে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানসিক নয়। তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে, তারা আধুনিক মেশিনের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণের ব্যবস্থা করে এবং জীবনীশক্তি বর্ধক ঔষধ পরিবেশন করে। ফলে বাচ্চা সুস্থতা অনুভব করে।

তার প্রশ্ন ছিল, শায়খ, এখন আমি কি ডাক্তারকে এসব মেশিন ও ঔষধ ব্যবহারে বাধা দিয়ে বলতে পারবো যে, 'তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। যদি আল্লাহ্ তার জীবন রেখে থাকেন তাহলে সে বাঁচবে আর যদি মৃত্যু অবধারিত করে রাখেন তাহলে পরকালে তাকে ক্ষমা করে দিবেন।'

আমি তাকে উত্তর দিলাম, না ভাই। এটা আপনার জন্য জায়েয হবে না। আপনার দায়িত্ব তার জীবনরক্ষার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কেননা, হাদীসে এসেছে- 'আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক রোগের সাথে সাথে তার প্রতিষেধক ঔষধও দিয়েছেন। যে জানার সে জেনেছে আর যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেছে।'

তবে একথাও সত্য যে, যদি জাদু হয়ে থাকে তাহলে শরয়ী ঝাঁড়ফুঁক কাজে আসবে। রিয়াদে দশ বছর পূর্বে একজন জাদুকরকে হত্যা করা হয়। তার বাসায় তল্লাশি চালিয়ে জাদুর প্রচুর সরঞ্জামাদি পাওয়া গেছে। তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। তখন আল্লাহর রহমতে চারজন লোক সুস্থ হয়ে যায় যারা তার জাদুর শিকার হয়েছিল। উল্লেখ্য, হাদীসে জাদুকরের শাস্তি তলোয়ার দিয়ে হত্যা করার বিধান রাখা হয়েছে।

জনৈকা ভদ্রমহিলা অভিযোগ করেন, আমার একজন মানসিক রোগী বাচ্চা আছে। সে একাকিত্ব পছন্দ করে। আবার উচ্ছৃঙ্খল ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড চালায়। এমনকি (অন্যান্য বাচ্চা ও আশেপাশে যারা আছে তাদের) হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু মেধাবী ও সব কাজ নিজে নিজে করতে পারে।'

ভদ্রমহিলা লন্ডনে বোনের সাথে থাকেন। সরকার তাদের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো তারা মাকে অনুরোধ জানিয়েছে ছেলেকে কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে। আমার কাছে তার প্রশ্ন ছিল, আমি কী এখন বাচ্চার কষ্ট সহ্য করবো নাকি বিকল্প কোন ব্যবস্থা নিবো?

আমি তাকে উত্তর দিলাম, যতটুকু সম্ভব আপনি তার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। তার অবস্থার উন্নতির জন্য তাকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন। তাকে নামাজ-রোজায় অভ্যস্থ করুন। ইনশাআল্লাহ হয়ত ভাল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, অনেক মহিলা অজ্ঞতাবশত তাদের প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধীদের গালে চুমু খায়, কোলে তুলে নেয়। তাদের উদ্দেশ্য যদিও অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করা কিন্তু শরীয়তে এটা বৈধ নয়। ইসলামী শরীয়তে ভালো নিয়তে হারাম কাজ করা যায় না।। তাই এসব থেকে বিরত থাকতে হবে।

অনেকে কল্পনাপ্রসূত রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক কিছু তার কল্পনায় দৃশ্যমান হয়। তখন অন্যরা তাকে পাগল মনে করে। আসলে এটি উন্মাদনা নয়। বরং সে কল্পনাপ্রসূত জাদুর শিকার হয়েছে। এর নাম 'সিহরে তাখায়য়ুল' তথা কল্পনাজাদু। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ফিরআউনের জাদুকরদের কর্মপ্রসঙ্গে বলেছেন–

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ

জাদুকরদের জাদুর প্রভাবে মুসার কাছে মনে হলো যেন তা (রশিগুলো সাপের ন্যায়) ধাবমান হয়ে দৌড়াচ্ছে। *[সূরা তহা : ৬৬]*

মুসা আ. ফেরআউনের জাদুকরদের নিক্ষেপিত রশিগুলোকে দেখলেন তা সাপে রুপান্তরিত হয়ে গেছে। পরক্ষণেই সেগুলো যেন তার দিকে দংশন করার জন্য দৌড়িয়ে আসছে। ফলে তিনি ভয় পেয়ে যান। *[সূরা তহা : ৬৭]*

আসলে তখন জাদুকরগণ উপস্থিত জনতা ও মুসার চোখে ভেলকি লাগিয়ে দেয়। তারা ইন্দ্রজালে আটকে যায়। সুতরাং কেউ এ ধরণের জাদুর শিকার হলে দুআ পড়ে নিবে। শরয়ী দুআ ও ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে সহজেই দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সাত. সামাজিক কর্মদক্ষতায় যথাসম্ভব তাদের অভ্যস্থ করা। যেমন মানুষের সাথে যোগাযোগ দক্ষতা সৃষ্টির চেষ্টা করা।

আট. যথাসম্ভব শিক্ষাগ্রহণে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। শিক্ষাগ্রহণের সার্বিক ব্যবস্থা করা। এমনকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেন এই কর্মপদ্ধতি হাতে নেয়। কেননা, সবার শিক্ষাগ্রহণের অধিকার আছে। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। কাজেই শিক্ষা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না।

উপরে যেসব আলোচনা করলাম তার সবগুলোই অন্যের প্রতি ইহসান অনুগ্রহের উত্তম দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইহসানের নির্দেশ দিয়ে বলেন–

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

তোমরা (মানুষের প্রতি) অনুগ্রহ করো। নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন। *[সূরা বাকারা : ১৯৫]*

যেসব ভাই মানসিক প্রতিবন্ধীদের সেবায় নিয়োজিত আছেন তাদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা আল্লাহ তায়ালা দরবারে এই কর্মের প্রতিদান প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ চাহেন তো এই কাজের বদৌলতে জান্নাতে যেতে পারবেন। কেননা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, বনি ইসরাইলের এক পতিতা তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর বিনিময়ে জান্নাত পেয়েছে।

একদা সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এইসব চতুষ্পদ জানোয়ারেও কী কোন সওয়াব আছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক তাজা জীবন্ত কলিজাতেই নেকী আছে। *[মুসলিম : ৪১৬২]* 'তাজা কলিজা' বলে জীবিত প্রাণী উদ্দেশ্য)

বাকহীন চতুষ্পদ জানোয়ার থেকে মানসিক প্রতিবন্ধীরা নিঃসন্দেহে মর্যাদায় অনেক উর্ধ্বে এবং আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়। অধিকন্তু তারা মুসলিম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে (পরীক্ষাস্বরূপ) এই বিপদে ফেলেছেন। এই মর্মে তিনি বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমি তাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি এবং তাদের একের মর্যাদা অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অন্যকে সেবকরূপে গ্রহণ করতে পারে। *[সূরা যুখরুফ : ৩২]*

চিকিৎসালয়ে কর্তব্যরত ভাইদের প্রতি এটাই আমার আহ্বান। আল্লাহ তাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন।

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা হচ্ছে, এসব রোগীকে কী ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে না? তাদেরকে নামাজ-রোজা, ওজু-গোসলের শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য নয়?

আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার সাথে একজন বোবা ও বধির যুবকের দেখা হয়। সে কথাও বলতে পারে আবার কানেও শুনে না। সে কেঁদে কেঁদে ইশারায় বলল, শায়খ, আমার বয়স বিশ বছর অতিক্রম করেছে। অথচ আমার পরিবার এখনো আমাকে নামাজ-রোজা শিক্ষা দেয় নি।'

তারা তাকে এমনি ছেড়ে দিয়েছে। অথচ সে সবকিছু বুঝে। তার স্মৃতিশক্তি সবই আছে। হাদীসে মাত্র সাত বছরের শিশুকে (যাকে অবুঝ বললেই চলে) নামাজের নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। দশ বছর বয়সীকে মৃদু প্রহারের নির্দেশ এসেছে। এখন যে ব্যক্তি তার থেকেও বয়সে অনেক অনেক বড়- এমনক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুমের ব্যাপারে আপনার কী ধারণা? অবশ্যই নামাজের হুকুম দেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং যে সব প্রতিবন্ধীর নূন্যতম স্মৃতিশক্তি আছে তাকে নামাজের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া পরিবারের জন্য ওয়াজিব।

স যদি বিবেকসম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে রোজা রাখতে হুকুম করবে। মন্যথা রোজা রাখবে না। কেননা, রোজা ফরয হওয়ার শর্ত হচ্ছে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।
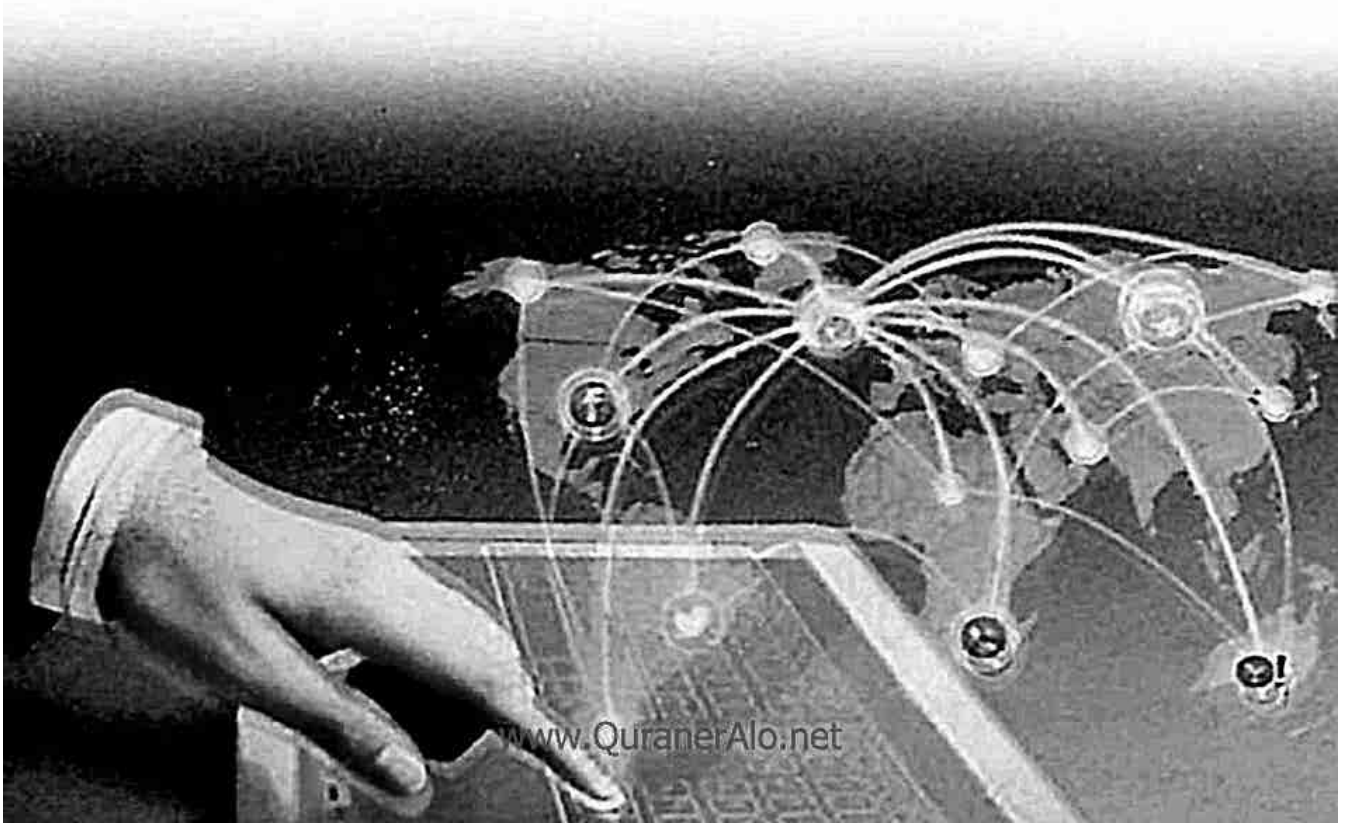
তদ্রূপ সম্পূর্ণ মস্তিষ্কবিকৃতি রোগী জীবনে হজ্বও ফরজ নয়। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার ছেলে মানসিক প্রতিবন্ধী। তাই তার পক্ষ থেকে হজ্বের ওকীল নিযুক্ত করে হজ আদায়ের ব্যবস্থা করবো কিনা? এর উত্তর হচ্ছে, এমন ছেলের জিম্মায় হজ্বই ফরজ নয়। তাই ওকীল নিযুক্ত করার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু সে যদি শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে থাকে যেমন নড়াচড়া করতে পারে না, হাঁটতে পারে না (কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধী নয়) তাহলে অবশ্যই ওকীল দিয়ে হজ্ব করাতে পারবেন। (উল্লেখ্য, মানসিক প্রতিবন্ধী আর শারী-রিক প্রতিবন্ধী এক নয়। শারীরিক প্রতিবন্ধী বিবেকসম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই তার বেলায় শরয়ী হুকুম সাধ্যমত প্রযোজ্য হয়। পক্ষান্তরে মানসিক প্রতিবন্ধী তথা সম্পূর্ণ মস্তিষ্কবিকৃতির রোগী শরীয়তের মুকাল্লাফ নয়। তবে মানসিক স্মৃতিভ্রমের তারতম্য আছে। সে অনুপাতে তার বেলায় হুকুম বর্তাবে। কেউ যদি পরিপূর্ণ মস্তিষ্কবিকৃতি ও উন্মাদনার শিকার হয় তাহলেই শরীয়তে বিধান থেকে অব্যাহতি পাবে। অন্যথায় নয়। বিষয়টি বেশ আলোচনা সাপেক্ষ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার ও আপনাদের জন্য তাওফিক ও কাজ-কর্মে সঠিকতা প্রার্থনা করছি। আমাদেরকে যেন তিনি সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা কথা শোনে এবং তার উত্তম বিষয়গুলো অনুসরণ করে। আমাদেরকে তিনি ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখে যাওয়ার তাওফিক দান করুক। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। আমাদের সর্বশেষ প্রার্থনা হচ্ছে, জগতের প্রতিপালকের জন্যই সকল প্রশংসা।

অন্যের উপকারে
দ্রুত এগিয়ে যান

সহযোগিতার কাজে
বিনাপ্রার্থনায় এগিয়ে যান

দ্রুত খোঁজ নিন,
যোগাযোগ রক্ষা করুন!

দ্রুত সদয় হোন

দ্রুত ক্ষমা করুন

নবী করীম সা. বলেন

[সুনানে তিরমিযী : ২৬৮৫]

নিত্যদিনের সহজসাধ্য কাজ

শুভাকাঙ্ক্ষা প্রচার

হে আল্লাহ, আমাদের জন্য আপনার কল্যাণের দরজাগুলো খুলে দি

দুনিয়ায় আমরা
জীবনযাপন করি,
আয়ু যতই দীর্ঘ
হোক...
পরিশেষে
একই
দরজা
দিয়ে
আমরা
বের হয়ে
যাই

নবী করীম সা. বলেন–
তোমাদের কেউ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন
কেয়ামত পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা তাকে তার
পরিণামস্থল দেখানো হয়

বলা হয়, এই হল তোমার আশ্রয়স্থল।

[বুখারী : ৬১৫০]